এসলাম শুধু নাম থাকবে

এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

এসলাম শুধু নাম থাকবে

বৃহত্তর কোর'আন মাজিদ, অক্ষরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ কোথাও প্রতিষ্ঠিত নেই।

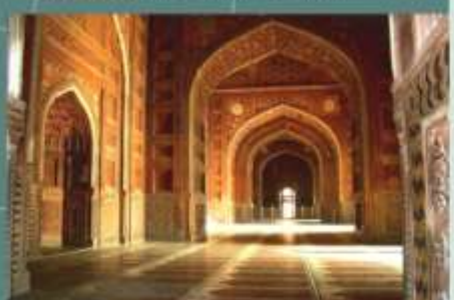

জাঁকজমকপূর্ণ মসজিদ, যেন রাজপ্রাসাদকেও হার মানায়।

শান্তির জন্য চোলছে হাজার প্রার্থনা।

মসজিদগুলি লোকে লোকারণ্য।

তবুও অশান্তির আগুন দাউ দাউ কোরে জ্বোলছে, আজ এসলাম শুধু নামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

সম্পাদনা : মোহাম্মদ রাকীব আল হাসান

প্রচ্ছদ : মোহাম্মদ মনিরুল এসলাম

প্রকাশনা ও পরিবেশনা

তওহীদ প্রকাশন

(বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের একমাত্র পরিবেশক)

৩১/৩২ পি.কে.রায় রোড, পুস্তক ভবন, বাংলাবাজার, ঢাকা।

ফোন: ০১৬৭০১৭৪৬৪৩, ০১৬৭০১৭৪৬৫১

www.hezbuttawheed.com

ISBN: 978-984-8912-25-6

১ম প্রকাশ : ০১ অক্টোবর ২০১৩ ঈসায়ী

মূল্য : ১৩৫.০০ টাকা মাত্র

উৎসর্গ

আল্লাহর মনোনীত এ যামানার এমামের প্রতি

প্রাককথন

মানুষ শুধু দেহসর্বস্ব প্রাণী নয়, তার একটি আত্মাও আছে। সেই আত্মা হোল আল্লাহর রূহ। অর্থাৎ মানুষ দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে ভারসাম্যপূর্ণ সামাজিক জীব। তাই মানুষ নামক এই জীবের জীবনকে সুখকর, শান্তিময় ও শৃঙ্খলাপূর্ণ করার জন্য এমন একটি জীবনব্যবস্থা দরকার, যে জীবনব্যবস্থাটাও শরীয়াহ ও আধ্যাত্মিকতার সমন্বয়ে ভারসাম্যপূর্ণ হবে। যেখানে শরীয়াহগতভাবে অন্যায়ের শাস্তি যেমন থাকবে তেমনি অন্যায় না করার জন্য আত্মিক প্রশিক্ষণ তথা ন্যায়নীতিবোধ, পারলৌকিক মুক্তির চিন্তা, স্রষ্টার প্রতি পূর্ণ আনুগত্যবোধ ইত্যাদি সৃষ্টির প্রক্রিয়াও থাকতে হবে। সমগ্র মানবজাতিকে একটি জাতিতে পরিণত করার জন্য, সমস্ত পৃথিবীকে ন্যায়, সুবিচার ও শান্তিতে পরিপূর্ণ করার জন্য যে দীনটি আল্লাহ পাঠিয়েছেন, সেই দীনটি প্রাকৃতিক নিয়মের উপরে, আমাদের দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে ভারসাম্যপূর্ণ একটি ব্যবস্থা। স্রষ্টার দেওয়া ব্যবস্থাতে উপরোক্ত দু'টি দিকই আছে, ভারসাম্যপূর্ণভাবে। ১৪০০ বছর আগে যেটা অর্ধ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে মানুষ দেখেছিল শান্তি ও পূর্ণ নিরাপত্তার দৃষ্টান্ত। সেটি ছিল আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রকৃত এসলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে যখন এই জাতির একটি বিশেষ শ্রেণী তাদের নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য এর ভারসাম্য বিনষ্ট কোরল এবং ক্রমে ক্রমে এটিকে বিকৃত কোরে ফেললো তখন থেকে সমাজে সৃষ্টি হোল অন্যায়, অবিচার, শোষণ, বঞ্চনা এক কথায় চরম অশান্তি। এক পর্যায়ে মানুষ নিজেই তার জীবনব্যবস্থা তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিল, জন্ম হোল দাজ্জালের। দাজ্জাল গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র ইত্যাদির নামে এমন ভারসাম্যহীন জীবনব্যবস্থা কায়েম কোরল যেখানে মানুষের আত্মিক ভাগটা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। অপরাধ দমনের জন্য শাস্তির বিধান থাকলেও অপরাধ থেকে বিরত থাকার জন্য যে আত্মিক প্রশিক্ষণ দরকার অর্থাৎ স্রষ্টার প্রতি ভালবাসা, আনুগত্যবোধ, ভীতি কিছুই সেখানে রোইলো না; এই ব্যবস্থাটি হোল সম্পূর্ণ স্রষ্টাহীন, আত্মাহীন, জড়বাদী, ভোগবিলাসী এক সভ্যতা যার মূলনীতিই হোল খাও-দাও ফুর্তি করো। মোসলেম নামক জনগোষ্ঠীও তাদের জাতীয় জীবনে দাজ্জালের তৈরি জীবনব্যবস্থাগুলি ঢালাওভাবে গ্রহণ কোরে আল্লাহর দেওয়া দীন এসলামকে ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ কোরে ফেললো। এসলামের ব্যক্তিগত অংশটুকুও আলেম মোল্লাদের ফতোয়ার যাঁতাকলে পড়ে বিকৃত হোতে হোতে একেবারে বিপরীতমুখী হোয়ে গেছে, ফলে ব্যক্তিগত জীবনেও এসলামের

শান্তিময় ফল না পেয়ে মানুষ চাকচিক্যময় দাজ্জালের আত্মাহীন ব্যবস্থা গ্রহণ কোরছে। এভাবে মানুষ ধীরে ধীরে আত্মাহীন হোয়ে পোড়ছে। আত্মাই যখন অনুপস্থিত সুতরাং মানুষের ভেতরে আত্মা থেকে সৃষ্ট- দয়া-মায়া, সৃষ্টির প্রতি ভালবাসা, সহমর্মিতা, পারস্পরিক সহযোগিতা, ন্যায়নীতিবোধ, সততা, সত্যবাদিতা, বিবেক, ঐক্য, শৃঙ্খলাবোধ ইত্যাদি সৎগুণাবলীও অনুপস্থিত হোতে লাগলো। ফলে সমাজে সৃষ্টি হোল চরম অরাজকতা, অন্যায়, অশান্তি। তারা সম্মিলিতভাবে স্রষ্টার এই দুনিয়াটাকে সাক্ষাৎ এক নরকপুরীতে পরিণত কোরেছে। এখন শুধুমাত্র আইন প্রয়োগ কোরে, শাস্তির বিধান তৈরি কোরে আর সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না। আগুনের মধ্যে লাফ দিলে আগুন আপনাকে দগ্ধ কোরবেই, বাঁচতে হলে আগে আগুন থেকে বের হোতে হবে, আগুনের মধ্যে থেকে বাঁচার উপায় খোঁজা নিতান্তই বোকামী। তাই এখন বাঁচতে হোলে স্রষ্টা আল্লাহর দেওয়া সেই নিঁখুত জীবনব্যবস্থা (দীন) গ্রহণ করা ছাড়া পথ নেই। সেই নিঁখুত ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা কোথায় পাওয়া যাবে?

হেযবুত তওহীদ আল্লাহর রহমে মানবজাতির সামনে এটা উপস্থাপন কোরছে। আমরা হেযবুত তওহীদ বহু নির্যাতন, নিপীড়ন সহ্য কোরেও গত ১৮ বৎসর ধোরে চেষ্টা কোরে যাচ্ছি এই সত্যকে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে। এই সত্যকে প্রকাশ করার একটি মাধ্যম হোচ্ছে পত্রিকা। বিভিন্ন জাতীয় ও আঞ্চলিক পত্রিকায় যামানার এমামের লেখাগুলি প্রবন্ধ আকারে প্রকাশ কোরছে। এই পত্রিকাগুলির মধ্যে দৈনিক দেশেরপত্র, দৈনিক নিউজ, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক জনতা, কুষ্টিয়ার কাগজ, আরশীনগর, সময়ের কাগজ, আজকের সূত্রপাত, বজ্রপাত, ইন্তেজার, দেশ প্রতিদিন, জন মতামত, লালন কন্ঠ, বরিশাল আজকাল, বরিশাল প্রতিদিন, খবর বাংলা, মহাস্থান, সান শাইন, উত্তরের খবর, প্রথম খবর, স্বর্ণ সকাল, নীলফামারী চিত্র, রংপুর চিত্র, চাঁদপুর দর্পণ, নবদিগন্তসহ আরও অনেক দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা।

আল্লাহর রহমে এই লেখাগুলি ইতোমধ্যেই পাঠকদের চিন্তার জগতে ব্যাপক আলোড়ন ও আগ্রহ সৃষ্টি কোরেছে। বিভিন্ন সময় অসংখ্য পাঠক আমাদের সাথে যোগাযোগ কোরে ইতঃপূর্বে প্রকাশিত প্রবন্ধ বা নিবন্ধ সম্বলিত পুরাতন পত্রিকা ক্রয়ে আগ্রহ প্রকাশ কোরে যাচ্ছেন। কেউ কেউ সরাসরি

আমাদের অফিসে এসে পুরাতন পত্রিকা সংগ্রহ কোরে নিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু সবার পক্ষে এভাবে পুরাতন পত্রিকা সংগ্রহ করা সম্ভব নয়।

আমরা পাঠকদের সুবিধার জন্য পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু নিবন্ধের সমন্বয়ে কিছু বই এরই মধ্যে প্রকাশ কোরে ব্যাপক সাড়া পেয়েছি। এরই ধারাবাহিকতায় "এসলাম শুধু নাম থাকবে" বইটি প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেই। পাঠক-পাঠিকাদের সার্বক্ষণিক উৎসাহ, উদ্দীপনা ও প্রেরণাই আমাদেরকে এই নতুন উদ্যোগটি গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ কোরেছে।

আমরা চেষ্টা কোরেছি বইটিতে যতটা সম্ভব পুনরাবৃত্তি এড়ানোর জন্য, তবু পাঠকের সুবিধার কথা চিন্তা কোরে বক্তব্যের ধারাবাহিকতা, প্রাসঙ্গিকতা ও গুরুত্বের বিবেচনায় কিছু বিষয়ের পুনরাবৃত্তি রাখতে হোয়েছে।

আমাদের বিশ্বাস এ বইয়ের পাতায় পাঠক চলমান সঙ্কট থেকে মানবজাতির বাঁচার পথ খুঁজে পাবেন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সেই সত্য পথে হেদায়াত কোরুন এবং সাবের রাখুন।

- মোহাম্মদ রাকিব আল হাসান

সূচিপত্র

১। এসলাম শুধু নাম থাকবে ———— ০৯

২। প্রচলিত ‘এসলাম’ এসলাম নয় কেন? ———— ৭২

৩। জাতির মধ্যে বিভেদ ঔপনিবেশিক শাসনের বিষফল ———— ১১০

৪। মাননীয় এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী ———— ১২৬

৫। আপনাদের সাড়ে তিন হাত শরীরেই তো এসলাম নাই ———— ১২৯

بسم الله الرحمن الرحيم

এই সময় সম্পর্কে মহানবী (দ:) -

এসলাম শুধু নাম থাকবে

আল্লাহর শেষ রসুল আখেরী যামানা সম্পর্কে বোলেছেন, এমন সময় আসবে যখন- (১) এসলাম শুধু নাম থাকবে, (২) কোর'আন শুধু অক্ষর থাকবে, (৩) মসজিদসমূহ জাঁকজমকপূর্ণ ও লোকে লোকারণ্য হবে কিন্তু সেখানে হেদায়াহ থাকবে না, (৪) আমার উম্মাহর আলেমরা হবে আসমানের নিচে সবচেয়ে নিকৃষ্ট জীব, (৫) তাদের তৈরি ফেতনা তাদের ওপর পতিত হবে। [হযরত আলী (রা:) থেকে বায়হাকী, মেশকাত]

আল্লাহর রসুলের পবিত্র মুখনিঃসৃত এই বাণীর প্রতিটি পর্ব আজ অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হোয়েছে। এই নিবন্ধটির মাধ্যমে আমরা এই বিষয়টিই তুলে ধোরব এনশা'ল্লাহ্।

বর্তমানে আমরা যে ধর্মটিকে এসলাম হিসাবে দেখছি, যেটাকে ধর্মপ্রাণ মানুষ অতি যত্ন সহকারে পালন করার চেষ্টা কোরছেন, যে এসলামটাকে সর্বত্র স্কুল কলেজ মাদ্রাসায় ও পীরের খানকায় শেখানো হোচ্ছে সেটা প্রকৃত এসলাম নয়। একজন জীবিত মানুষ এবং একটি লাশের মধ্যে বাহ্যিক মিল বহু রোয়েছে। যেমন জীবিত মানুষের শরীরে যে সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে, লাশেরও সেগুলি সব আছে। কিন্তু তাতে প্রাণ না থাকায় সেটার দেহ সৌষ্ঠব যত সুন্দরই হোক সকল সৌন্দর্য, সকল সুগঠিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গসহই লাশ, মৃত। তেমনি আল্লাহ যে এসলাম দিয়ে তাঁর শেষ রসুলকে পাঠিয়েছিলেন আর আজ যেটা দুনিয়াময় চোলছে এ দু'টির মধ্যে বাহ্যিক দিক থেকে যতই একরকম মনে হোক, এদের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে ততটাই তফাৎ যতটা তফাৎ একটি জীবিত মানুষ আর লাশের মধ্যে, এমন কি তার চেয়েও বেশি। এ যেন যাত্রাপালার কাঠের বন্দুক। দেখতে আসল বন্দুকের মতই মনে হয় কিন্তু ওটা দিয়ে গুলি ছোঁড়া যায় না অর্থাৎ কার্যকরী নয়। যাত্রাদলের বন্দুকের সঙ্গে আসল বন্দুকের যতটা পার্থক্য, প্রকৃত এসলামের সঙ্গে বর্তমান এসলামের ততটাই পার্থক্য। এ দু'টির চলার পথ সম্পূর্ণ বিপরীত। আল্লাহ যে উদ্দেশ্যে মানবজাতিকে এই দীন প্রদান কোরেছেন সেই উদ্দেশ্যই এখন বদলে গেছে। মানব সৃষ্টির প্রারম্ভের ঘটনাগুলির মধ্যে এসলামের

প্রকৃত উদ্দেশ্য নিহিত রোয়েছে। আল্লাহ যখন পৃথিবীতে তাঁর খলিফা বা প্রতিনিধি হিসাবে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট একটি নতুন সৃষ্টি কোরতে চাইলেন, তখন সকল মালায়েক মানুষ সৃষ্টির বিরুদ্ধে যুক্তি উপস্থাপন কোরে বোলেছিল যে, 'তোমার প্রশংসা ও গুণকীর্তণ করার জন্য আমরাই কি যথেষ্ট নই। তোমার এই সৃষ্টি পৃথিবীতে গিয়ে ফাসাদ (অন্যায় অশান্তি) ও সাফাকুদ্দিমা (রক্তপাত, যুদ্ধ বিগ্রহ) কোরবে (সুরা বাকারা ৩০)। আল্লাহ তাদের এই মৃদু আপত্তি সত্ত্বেও আদম (আ:) কে সৃষ্টি কোরলেন। এরপর আল্লাহ তাঁর নিজের রূহ আদমের (আ:) ভিতরে ফুঁকে দিলেন এবং সকল মালায়েককে আদমের খেদমতে নিয়োজিত কোরলেন। প্রত্যেকেই তারা আদমকে (আ:) সেজদা করার মাধ্যমে আল্লাহর এই হুকুমের আনুগত্য কোরল এবং আদমের সেবায় নিয়োজিত হোল। কিন্তু এবলিস আল্লাহর এই হুকুমকে অন্যায্য ঘোষণা কোরে আদমকে সেজদা করা থেকে বিরত রোইল। ফলে আল্লাহ এবলিসকে তার সম্মানজনক অবস্থান থেকে বিতাড়িত (রাজীম) কোরলেন এবং অভিশাপ দিলেন। এবলিসও তখন আল্লাহর কাছে অবকাশ চেয়ে নিল এবং আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ দিল যে সে বিভিন্ন প্রকার প্ররোচনা দিয়ে অধিকাংশ মানুষকেই আল্লাহর হেদায়াত (দিক নির্দেশনা), সরল পথ থেকে বিচ্যুত কোরে ফেলবে এবং প্রমাণ কোরবে যে মানুষ তার চাইতে নিকৃষ্ট সৃষ্টি। আল্লাহ জানিয়ে দিলেন যে, তিনি প্রতি যুগে প্রতি জনপদে তাঁর নবী রসুল পাঠিয়ে হেদায়াহ ও দীন প্রেরণ কোরবেন। সেটাকে অনুসরণ কোরলেই তারা দুনিয়াতে একটি শান্তিময় ও প্রগতিশীল সমাজে বসবাস কোরতে পারবে। সেখানে থাকবে না কোনো ফাসাদ ও সাফাকুদ্দিমা অর্থাৎ অন্যায়, অশান্তি, যুলুম, রক্তপাত, যুদ্ধ, ক্রন্দন, হতাশা অর্থাৎ সৃষ্টির আদিতে মালায়েকরা মানবজাতিকে নিয়ে যে আশঙ্কা প্রকাশ কোরেছিল সেগুলি থাকবে না। পাশাপাশি এবলিসের সঙ্গে করা চ্যালেঞ্জে আল্লাহ বিজয়ী হবেন। এজন্যই এসলাম শব্দের আক্ষরিক অর্থ হোচ্ছে শান্তি, এই নামকরণ আল্লাহ কোরেছেন এই জন্য যে, এই দীন পৃথিবীর যে অংশে প্রতিষ্ঠিত হবে সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে, সেখানে অশান্তির লেশও থাকবে না। সুতরাং আল্লাহর দেওয়া এসলাম অনুসরণের অনিবার্য পরিণতি হোচ্ছে শান্তি এবং অনুসরণ না করার অনিবার্য পরিণতি হোচ্ছে অশান্তি। তাই যেখানে শান্তি নেই, আমরা বোলতে পারি সেখানে এসলাম নেই।

প্রশ্ন হোল, আজকের পৃথিবীতে মোসলেম নামের যে ১৬০ কোটির জনসংখ্যাটি বিরাজ কোরছে তারা শান্তিতে আছে না অশান্তিতে আছে? না, তারা মোটেও শান্তিতে নেই। পৃথিবীতে যে কয়টি

প্রধান জাতি আছে তার মধ্যে এই জনসংখ্যার অবস্থা নিকৃষ্টতম। আর সব জাতি মিলে পৃথিবীর সর্বত্রই এই জনসংখ্যাটিকে অপমানিত, অপদস্থ কোরছে, তাদেরকে আক্রমণ কোরে হত্যা কোরছে, ধন-সম্পদ লুটে নিচ্ছে, তাদের বাড়ি-ঘর আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিচ্ছে, তাদের মা, মেয়ে, বোনদের ওপর পাশবিক অত্যাচার কোরে সতিত্ব নষ্ট কোরছে। ঐ কাজগুলি খ্রিস্টানরা অতীতে কোরেছে স্পেনে, সেখান থেকে তারা সম্পূর্ণ মোসলেম জাতিটিকেই সমূলে উৎখাত কোরেছে, আজ সেখানে মোসলেম বোলতে নেই এবং নিকট অতীতে কোরেছে বসনিয়া হারযেগোভিনিয়ায়, সুদানে, ফিলিপাইনে। হিন্দুরা কোরছে কাশ্মীরে, ভারতের প্রতিটি রাজ্যে। বৌদ্ধরা কোরছে মায়ানমারে অর্থাৎ বার্মায়, আরাকানে, থাইল্যান্ডে, ভিয়েতনামে, কামপুচিয়ায় ও চীনে। এগুলি তো বড় বড়

ফিলিস্তিন, মায়ানমারসহ পৃথিবীর বহু স্থানে এভাবেই প্রতিদিন নির্যাতিত হোচ্ছে মোসলেম নামের এই জাতি

জাতি। অতি ক্ষুদ্র ইহুদি জাতি ঐ কাজ কোরছে পশ্চিম এশিয়ায়, প্যালেস্টাইনে। ভারতে হাজার হাজার মসজিদ হয় মন্দিরে পরিণত করা হোয়েছে না হয় অফিস ইত্যাদি অন্য কাজে ব্যবহার করা হোচ্ছে, না হয় ভেংগে দেয়া হোয়েছে। এ'তো গেল বহিঃশত্রুর হাতে মার খাওয়ার চিত্র, নিজেদের মধ্যেও এই জাতিটি ধর্মীয় মতবাদ, রাজনৈতিক মতবাদ নিয়ে নিরন্তর হানাহানি, মারামারি, যুদ্ধ, রক্তপাতে লিপ্ত, ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অশিক্ষা-কুশিক্ষা, কুসংস্কার, হীনমন্যতা ইত্যাদিতে জর্জরিত।

দুনিয়াময় পরাজয়ের ফলে এই জনসংখ্যাটি তাদের জাতীয় জীবনের প্রভু হিসাবে পশ্চিমা বিশ্বকে এবং দীন হিসাবে প্রভুদের প্রদত্ত গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ, ফ্যাসিবাদ ইত্যাদি জীবনব্যবস্থাগুলি গ্রহণ কোরে নিয়েছে। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে কিছু নামাজ রোজা করে, দাড়ি টুপি রেখে, আরবীয়

পোশাক ধারণ কোরে মোসলেম হিসাবে নিজেদের কর্তব্য সম্পন্ন কোরছে, ধর্মীয় এই উপাসনা ও আনুষ্ঠানিকতা পালন করাকেই মনে কোরছে এসলাম। এই এসলামটাও তারা শিখছে যে মাদ্রাসাগুলি থেকে সেই মাদ্রাসাগুলি প্রতিষ্ঠা কোরেছে ঔপনিবেশিক খ্রিস্টানরা। যে এসলামটা শিখেছে সেটাও ঐ খ্রিস্টান প্রভুদের তৈরি করা, আল্লাহ রসুলের এসলাম নয়। আজ থেকে কয়েকশ' বছর আগে খ্রিস্টান প্রাচ্যবিদ, পণ্ডিতরা বহু গবেষণা কোরে নুতন "এসলাম" দাঁড় করালেন, যে "এসলামের" বাহ্যিক দৃশ্য এসলামের মতই কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যেটার আকীদা এবং চলার পথ অর্থাৎ সেরাত, আল্লাহর রসুলের এসলামের, সেরাতুল মোস্তাকীমের ঠিক বিপরীত। ঐ বিপরীতমুখী এসলাম শিক্ষা দিতে কী কী বিষয় শিক্ষা দিতে হবে, কী কী বিষয়বস্তু বাদ দিতে হবে, কেমন কোরে শিক্ষা দিতে হবে অর্থাৎ এক কথায় Syllabus এবং Curriculum নির্ধারণ ও স্থির কোরলেন ঐ খ্রিস্টান পণ্ডিতরা। ঐ Syllabus ও Curriculum এ আল্লাহর সর্বব্যাপী তওহীদকে সংকুচিত কোরে ব্যক্তি জীবনে সীমাবদ্ধ করা হোল, কারণ সার্বভৌমত্ব তো বৃটিশের, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব শিক্ষা দিলে তো তাদের রাজত্ব করাই বিপদজনক। তারপর আল্লাহর সার্বভৌমত্ব অর্থাৎ তওহীদের ঠিক পরেই যে জেহাদের স্থান সেই জেহাদকে ঐ মাদ্রাসার পাঠ্যবস্তুতে অতি অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে পরিণত কোরে প্রায় বাদ দেওয়া হোল। সমষ্টিগত, জাতিগত বিষয়গুলিকে নিম্নস্তরে নামিয়ে দিয়ে অতি সাধারণ ব্যক্তিগত বিষয়গুলিকে অতি গুরুত্ব ও প্রাধান্য দেয়া হোল। বিয়ে-শাদী, বিবি তালাক, দাড়ি-টুপি, পাজামা, পাগড়ী, মেসওয়াক, কুলুখ, ওজু গোসল, হায়েয-নেফাস ইত্যাদি হাজার রকমের বিষয়গুলিকে এসলামের অতি জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বোলে উপরে স্থান দেয়া হোল। ঐ সিলেবাসে (Syllabus) আরও প্রাধান্য দেয়া হোল সেই সব বিষয়গুলিকে যেগুলি সম্বন্ধে দুর্ভাগ্যক্রমে বিভিন্ন মাযহাবে ও ফেরকায় মতভেদ ও বিতর্ক আগে থেকেই মওজুদ ছিল ও আছে। খ্রিস্টান পণ্ডিতেরা এটা কোরলেন এই জন্য যে তাদের শেখানো এসলামের আলেমরা যেন ঐগুলি নিয়ে নিজেদের মধ্যে তর্কাতর্কি, বাহাস ও প্রয়োজনে মারামারি কোরতে থাকে, বৃটিশদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হোতে না পারে এবং তাদের শাসন নিরাপদ হয়। ইংরাজ অধিকৃত এই উপমহাদেশের বড়লাট অর্থাৎ Viceroy মিঃ ওয়ারেন হেসটিংস ১৭৮০ সনে কোলকাতায় আলীয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা কোরলেন। সেই থেকে ১৯২৬ সন পর্যন্ত এই ১৪৬ বছর একাদিক্রমে ২৬ জন খ্রিস্টান পণ্ডিত আলীয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষপদে থেকে এই জাতিকে "এসলাম" শিখিয়েছেন।

বৃটিশরা এই উপমহাদেশসহ তাদের অধিকৃত অন্যান্য মোসলেম দেশগুলিতেও আলীয়া মাদ্রাসার অনুকরণে শত শত মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে ও তাদের তৈরি “এসলাম” শিক্ষা দেয়। ইংরাজ চোলে গেছে কিন্তু তাদের তৈরি করা “এসলাম” আজও আমাদের মাদ্রাসাগুলিতে শিক্ষা দেওয়া হোচ্ছে, ঐ মাদ্রাসাগুলি থেকেই ঐ এসলাম শিখে আলেমরা বের হোয়ে আসছেন ও আমাদের ঐ “এসলাম”ই শিক্ষা দিচ্ছেন। আমরা আজ এসলাম বোলতে সেই এসলামই বুঝি যে “এসলাম” খ্রিস্টান পণ্ডিতরা তৈরি কোরে ১৪৬ বছর ধরে আমাদের শিক্ষা দিয়েছে। ফলে আজ আমাদের রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক জীবন পরিচালিত হোচ্ছে পাশ্চাত্যের খ্রিস্টানদের তৈরি করা নানা রকম তন্ত্র-মন্ত্র দিয়ে আর ব্যক্তিগত ধর্মীয় জীবন পরিচালিত হোচ্ছে খ্রিস্টান পণ্ডিতদের তৈরি করা বিকৃত ও বিপরীতমুখী “এসলাম” দিয়ে, আল্লাহ রসুলের এসলাম দিয়ে নয়। ফলে এসলামের অস্তিত্বের যে উদ্দেশ্য অর্থাৎ শান্তিময় পৃথিবী সেটা নেই, আর শান্তি নেই মানেই এসলাম নেই। ভাবতে অবাক লাগে এরপরও আমরা নিজেদের মো'মেন, মোসলেম ও উম্মতে মোহাম্মদী বোলে বিশ্বাস কোরি এবং পরকালে আল্লাহর ক্ষমা ও জান্নাতের আশা কোরি। এই অবস্থাকেই আল্লাহর রসুল এক কথায় প্রকাশ কোরেছেন এই বোলে যে, এসলাম শুধু নামে থাকবে।

হাদীসে যে দ্বিতীয় বিষয়টি রসুলাল্লাহ বোললেন অর্থাৎ কোর'আন শুধু অক্ষর থাকবে, এর মানে কোর'আন যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ নাযেল কোরেছেন তা পূরণ করা হবে না। বাস্তবেও তাই, সম্পূর্ণ মোসলেম দুনিয়ায় কোর'আনকে তেলাওয়াত করা হয় সওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে, প্রতি অক্ষরে অক্ষরে সওয়াব গণনা করা হয় অথচ আল্লাহ কোর'আন পাঠিয়েছেন এটি দিয়ে মানুষের সামগ্রিক জীবন পরিচালনা করার জন্য। তিনি এও বোলে দিয়েছেন যে, যারা আল্লাহর নাজেলকৃত বিধান দিয়ে হুকুম (শাসন, বিচার ফয়সালা) করে না, তারা কাফের, জালেম ও ফাসেক (সুরা মায়েদা- ৪৪, ৪৫, ৪৭)। তবুও আজ পৃথিবীর এক ইঞ্চি জায়গাতেও এই কোর'আনের বিধান প্রতিষ্ঠিত নেই, কেবল অক্ষরের মধ্যেই সেগুলি বন্দী হোয়ে আছে। এই কোর'আন আল্লাহর হুকুমের সমষ্টি। অথচ অর্ধেক বিশ্বজয়ী ঐ জাতির বহু মানুষ বই আকারে কোর'আনকে কোনোদিন চোখেই দেখেন নি। কোর'আনের লিখিত কপি প্রস্তুত করা হয় ওসমান (রা:) এর খেলাফতের সময়, আর ততদিনে অর্ধেক পৃথিবীতে তারা দীন প্রতিষ্ঠা কোরে ফেলেছেন। তাদের মধ্যে যার যেটুকু মুখস্থ ছিলো তারা সেইটুকুই জানতেন এবং সেই অনুযায়ী কাজ কোরতেন।

কোর'আনের বিধান বাস্তবে নেই, সেগুলি অক্ষরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ

যে মহাগ্রন্থ আল কোর'আন মহান আল্লাহ যে জাতির উপর নাযেল কোরেছেন সে জাতিকে সম্বোধন কোরেছেন 'খায়রা উম্মাতিন- সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি' (সুরা এমরান ১১০) অর্থাৎ এই কোর'আন নিয়ে যে জাতি জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, শৃঙ্খলায়, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে, সামরিক শক্তিতে, নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে সমস্ত দুনিয়ার শীর্ষে, সকল জাতির শিক্ষকের আসনে অধিষ্ঠিত হোয়েছিল, বাকি দুনিয়া সভয় সম্ভ্রমে এই জাতির দিকে চেয়ে থাকতো, সেই একই কোর'আন নিয়ে সমস্ত দুনিয়াময় এই জাতির করুণ দুর্দশা কেন? যে ঔষধ খেয়ে একজন মানুষ হোয়ে গেল স্বাস্থ্যবান, গতিশীল, কর্মঠ, সাহসীহৃদয়, দুর্বিনীত, বুদ্ধিমান, আর সেই একই ঔষধ খেয়ে আরেকজন কেন চরম অসুস্থ, রুগ্ন, নির্জীব, নিথর, অচল, পক্ষাঘাতগ্রস্ত, ভীরু, কাপুরুষ, জড়বুদ্ধি হোয়ে গেল?

বর্তমানে ঝকঝকে হরফে ছাপানো অতি সুন্দর কোর'আন পৃথিবীতে কোটি কোটি সংখ্যায় বর্তমান। অনেক কোর'আন আছে যা সোনার হরফে লিখিত। এই কোর'আন আগের চেয়ে মুখস্থকারী অর্থাৎ হাফেজ তো লক্ষ লক্ষগুণ বেশি, কোর'আনের প্রতিটি শব্দ নিয়ে অসংখ্য

তাফসির হোয়েছে, পাড়া মহল্লা কাঁপিয়ে সুর কোরে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ স্থান থেকে পড়া হোচ্ছে তবুও এই অবস্থা কেন? এর একমাত্র উত্তর হোল, এই জাতি ঐ কোর'আনের উপরে যা কিছু কোরছে তা অক্ষরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। একদল কোর'আন পাঠ কোরছে জনসাধারণের মধ্যে বিক্রি কোরে অর্থ উপার্জনের জন্য, আরেকদল তা কোরছে 'পরকালের পুঁজি' সওয়াব সঞ্চয়ের জন্য। কিন্তু এই কোর'আন যে জন্য নাযেল হোয়েছে অর্থাৎ মানবজাতির জাতীয় জীবনে একে প্রতিষ্ঠা কোরে অন্যায় অবিচার দূর কোরে শান্তি আনার জন্য সেটা বাদ দেওয়া হোয়েছে। যেমন ধোরুন, একটি দেশের সংবিধান। মনে কোরুন, দেশের কয়েক কোটি মানুষের মধ্যে লক্ষ লক্ষ লোক সংবিধানটি মুখস্থ কোরে ফেলল, সুর কোরে আবৃত্তি কোরতে শুরু কোরল। অবশিষ্টদের অনেকেই প্রতিদিন অর্থ বুঝে হোক আর না বুঝেই হোক সংবিধানের কোনো না কোনো অংশ পাঠ কোরল, কিন্তু সংবিধানের কোনো বিধি-বিধানই দেশে প্রয়োগ করার বা বাস্তবায়ন করার চেষ্টা এমনকি বাস্তবায়নের চিন্তাও কোরল না। সংবিধানের অনুচ্ছেদ বা উপ-অনুচ্ছেদসমূহে যা বলা হোয়েছে আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের কোথাও যদি তা না মানা হয়, ঐ দেশের সংবিধানকে ভিত্তি ধোরে যদি রাষ্ট্র পরিচালিত না হয় তবে এই সংবিধানের কোনো মূল্য বা মর্যাদাই থাকল না। যদি এমন হয় রাষ্ট্রীয় আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের সদস্যগণ প্রতিদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে সংবিধানটি থেকে কিছু অংশ পাঠ কোরে দিনের কার্যক্রম শুরু করেন, সেটাকে ঘরের সবচেয়ে উঁচু স্থানে দামি গেলাফ দিয়ে আবৃত কোরে রাখেন কিন্তু তাদের স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে ঐ সংবিধানের অধিকাংশ বিধি-বিধান বাদ দিয়ে অন্য কোনো সংবিধান বা তাদের নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী পরিচালিত করেন, তাহোলে ঐ সংবিধানকে যতই বাহ্যিক সম্মান মর্যাদা দেওয়া হোক না কেন, কার্যতঃ তার কোনোই মূল্য রোইল না। বর্তমানে আল্লাহর নাযেল করা মানবজাতির জন্য শেষ সংবিধান পবিত্র কোর'আনের অবস্থা ঐ সংবিধানের মতই।

এই জন্যই রসুল বোলেছেন, 'কোর'আন শুধু অক্ষর থাকবে' অর্থাৎ এর কোনো প্রয়োগ (Implementation) থাকবে না।

প্রসঙ্গ ৩। মসজিদসমূহ জাঁকজমকপূর্ণ ও লোকে লোকারণ্য হবে কিন্তু সেখানে হেদায়াহ্ থাকবে না

আল্লাহর রসুলের ভবিষ্যদ্বাণী করা তৃতীয় বিষয়টি হোচ্ছে, মসজিদসমূহ জাঁকজমকপূর্ণ ও লোকে লোকারণ্য হবে কিন্তু সেখানে হেদায়াহ থাকবে না। প্রথম অংশটির ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না, কারণ এটা সকলেই জানেন যে সারা দুনিয়াতে এমন বহু মসজিদ রোয়েছে যার গম্বুজ সোনার তৈরি। আমাদের দেশের মতো একটি দরিদ্র দেশের অলিতে গলিতে রোয়েছে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মসজিদ, এসব মসজিদে প্রায়ই মুসল্লীদের স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় মসজিদ সংলগ্ন রাস্তায় চট বিছিয়ে নামাজ পড়তে দেখা যায়। কথা হোচ্ছে, রসুল বোললেন এই মসজিদগুলিতে হেদায়াহ

মসজিদগুলি অতি জাঁকজমকপূর্ণ ও লোকে লোকারণ্য কিন্তু সেখনে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব নাই

থাকবে না। কি এই হেদায়াহ? প্রচলিত ধারণা হোল, কোনো দুষ্ট প্রকৃতির গোনাহগার লোককে যদি উপদেশ দিয়ে মদ খাওয়া ছাড়ানো যায়, চুরি-ডাকাতি ছাড়ানো যায়, তাকে নামাজী বানানো যায়, রোজা রাখানো যায় তবে আমরা বলি- লোকটা হেদায়াত হোয়েছে। এই ধারণা ভুল, কারণ মানুষ নামাজ পড়তেই মসজিদে যায় অথচ বলা হোচ্ছে সেখানে হেদায়াহ থাকবে না। তাহোলে রসুলাল্লাহর কথা মোতাবেকই বুঝা গেল হেদায়াহ একেবারেই অন্য জিনিস। কারণ বর্তমানে যে কাজগুলিকে এবাদত মনে করা হয় যেমন নামাজ, রোজা ইত্যাদি, সেগুলি কোরলেই হেদায়াতে থাকা হোল এ ধারণা ভুল। হেদায়াহ অর্থ হোচ্ছে সঠিক দিক নির্দেশনা (Right direction, guidance, orientation) অর্থাৎ আল্লাহ রসুল মানবজাতিকে যে পথ প্রদর্শন কোরেছেন, যে দিক নির্দেশনা

দিয়েছেন, সেই পথে, সেই দিকে চলাই হোচ্ছে হেদায়াহ। আল্লাহ যে পথে চোলতে আদেশ দিচ্ছেন সেটা হোল সেরাতুল মোস্তাকীম- সহজ, সরল পথ, জীবনের সর্বস্তরে, সর্ব অঙ্গনে, সর্ব বিভাগে এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো আইন-কানুন, নীতি নির্দেশ অস্বীকার করা এবং তাঁকে ছাড়া আর কারো খেলাফত না করা- এক কথায় তওহীদ; এই সহজ সোজা কথা। আর আজ সারা দুনিয়ার কোথাও আল্লাহকে একমাত্র এলাহ, হুকুমদাতা, সার্বভৌমত্বের মালিক হিসাবে মানা হোচ্ছে না, এমন কি ঐ জাঁকজমকপূর্ণ সোনার গম্বুজওয়ালা মসজিদগুলিতেও এই হেদায়াহ নেই, সেখানেও চোলছে তাগুতের গোলামী।

অথচ আল্লাহর রসুল এবং প্রকৃত উম্মতে মোহাম্মদী খেজুর পাতার ছাউনি দেওয়া মাটির মসজিদ থেকে অর্ধ পৃথিবী শাসন কোরেছেন, তাঁদের মসজিদসমূহ কোনোই জাঁকজমকপূর্ণ ছিল না। তবু যে ভূখণ্ডে এই জাতি শাসন কোরেছেন সেখান থেকে সমস্ত অন্যায় অবিচার, যুদ্ধ রক্তপাত, ক্ষুধা দারিদ্র্য, শোষণ এক কথায় সর্ব প্রকার অন্যায় অশান্তি লুপ্ত হোয়ে গিয়েছিল। অর্ধেক পৃথিবীর কোথাও শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কোনো বাহিনী না থাকা সত্ত্বেও সমাজে বোলতে গেলে কোনো অপরাধই ছিলো না। সুন্দরী যুবতী নারী অলঙ্কার পরিহিত অবস্থায় শত শত মাইল পথ একা পাড়ি দিত, তার মনে কোনো প্রকার ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কাও জাগ্রত হোত না। মানুষ রাতে ঘুমানোর সময় ঘরের দরজা বন্ধ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব কোরত না, রাস্তায় ধন-সম্পদ ফেলে রাখলেও তা খোঁজ কোরে যথাস্থানে পাওয়া যেত, চুরি, ডাকাতি, হত্যা, রাহাজানি প্রায় নির্মূল হোয়ে গিয়েছিল, আদালতে বছরের পর বছর কোনো অপরাধ সংক্রান্ত মামলা আসতো না। আর অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রতিটি মানুষ স্বচ্ছল হোয়ে গিয়েছিল। এই স্বচ্ছলতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, মানুষ যাকাত ও সদকা দেওয়ার জন্য টাকা পয়সা নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াত, কিন্তু সেই টাকা গ্রহণ করার মতো লোক পাওয়া যেত না। এই পরিবেশ সৃষ্টি হোয়েছিল, কারণ ঐ জাতি হেদায়াতে ছিল, তওহীদে ছিল। তাদের এলাহ, বিধাতা, হুকুমদাতা ছিলেন আল্লাহ।

আর আজ যারা সোনার গম্বুজওয়ালা মসজিদে নামাজ পড়তে যাচ্ছেন তাদের কারও এলাহ গণতন্ত্র, কারও রাজতন্ত্র, কারও সমাজতন্ত্র, কেউ সরকারী দলের, কেউ বিরোধীদলের অনুসারী, অর্থাৎ আল্লাহর সার্বভৌমত্ব কোথাও নেই। সবাই ইহুদি খ্রিস্টান 'সভ্যতা'র অর্থাৎ দাজ্জালের সার্বভৌমত্ব মাথায় নিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত মসজিদে দৌঁড়ে পাক্কা মুসল্লী হোচ্ছে। এ জন্যই আল্লাহর রসুল বোলেছেন,

মসজিদ সমূহ ভর্তি হবে কিন্তু সেখানে হেদায়াহ থাকবে না। পাঠক, ভেবে দেখেছেন কি, মোসলেম জাতি যদি হেদায়াতেই না থাকে তবে কোথায় রোয়েছে? নিশ্চয়ই হেদায়াতের বিপরীত অর্থাৎ পথভ্রষ্টতায়, যদি সেরাতুল মোস্তাকীমেই না থাকে তবে নিশ্চয়ই রোয়েছে এবলিসের বক্রপথে। এই পথ তাদেরকে কোন গন্তব্যে নিয়ে যাচ্ছে- জান্নাতে, না জাহান্নামে?

প্রসঙ্গ ৪। আমার উম্মাহর আলেমরা হবে আসমানের নিচে সবচেয়ে নিকৃষ্ট জীব

আল্লাহর রসুল চতুর্থ যে বিষয়টি বোললেন তা ভালো কোরে বুঝে নেওয়া খুব জরুরি। তিনি বোললেন, আসমানের নিচে সবচেয়ে নিকৃষ্ট জীব হবে আমার উম্মাহর ওলামা শ্রেণী। অতি ভয়ঙ্কর কথা সন্দেহ নেই, কারণ যারা দীনের ধারক-বাহক ওলামা শ্রেণী, যাদেরকে আল্লাহর রসুল 'নবীদের উত্তরাধিকারী' বোলে সম্মানিত কোরেছেন, তারাই যদি আসমানের নিচে সবচেয়ে নিকৃষ্ট জীবে পরিণত হয়, তাহোলে ঐ সমাজে এসলামের অবস্থা কি দাঁড়াবে তা সহজেই অনুমেয়। তাই এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়ার আগে আমাদের জানতে হবে আল্লাহর দৃষ্টিতে প্রকৃত আলেম বা জ্ঞানী কারা? আলেম কথাটি এসেছে এলেম অর্থাৎ জ্ঞান থেকে, যিনি জ্ঞানের অধিকারী তিনিই আলেম। এলেম বোলতে বর্তমানের বিকৃত আকীদায় কেবলমাত্র ধর্মীয় জ্ঞানকে বোঝানো হয় এবং আলেম বোলতে ধর্মীয় জ্ঞানের অধিকারীদেরকে বোঝানো হয়। কিন্তু এ ধারণাটি সঠিক নয়। মানুষের ইতিহাসে দেখা যায় যে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন সভ্যতা জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা, গবেষণা কোরে তাকে অগ্রগতির পথে নিয়ে গেছে। যখন যে জাতি বা সভ্যতার প্রাণশক্তি (Dynamism) বৃদ্ধি পেয়েছে সেই জাতি বা সভ্যতা জ্ঞান, বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ কোরেছে এবং সমগ্র মানবজাতি তা থেকে উপকৃত হোয়েছে। সুতরাং আলেমদের এলেম থেকে কোনো নির্দিষ্ট ধর্ম বা গোষ্ঠীর মানুষ নয়, সমগ্র মানবজাতি উপকৃত হবে। এখানে আল্লাহর রসুলের একটি হাদীসের উল্লেখ প্রয়োজন। তিনি বোলেছেন- জ্ঞান আহরণের জন্য প্রয়োজন হোলে চীনেও যাও (আনাস (রাঃ) থেকে বায়হাকী, মেশকাত)। বিশ্বনবীর সময় জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তিতে (Science and

Technology) চীনদেশ ছিলো পৃথিবীতে সবচেয়ে উন্নত, তাই তিনি তাঁর অনুসারীদের (উম্মাহ) তদানীন্তন পৃথিবীর জ্ঞান বিজ্ঞানের কেন্দ্র চীনে যেয়ে ঐ জ্ঞান আহরণের আদেশ দিয়েছেন।

এ কথা আহাম্মকেও বুঝবে যে এই হাদীসে 'জ্ঞান' শব্দ দিয়ে তিনি দীনের জ্ঞান বোঝান নি, কারণ আল্লাহর রসুলকে মদীনায় রেখে দীনের জ্ঞান শেখার জন্য চীনে যাওয়ার (যে চীন তখনও এসলামের নামই শোনে নি) কোনো অর্থই হয় না। বিশ্বনবী এখানে 'জ্ঞান' বোলতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে বুঝিয়েছেন। মহানবীর ঐ আদেশের সময় এই জাতিটি, যেটা বর্তমানে মোসলেম বোলে পরিচয় দেয়, সেটা জীবিত (Dynamic) ছিলো এবং জীবিত ছিলো বোলেই তাঁরা নেতার আদেশ শিরোধার্য কোরে জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে পৃথিবীর শিক্ষকের আসন অধিকার কোরে নিয়েছিলো। তারপর আল্লাহ ও রসুল জ্ঞান বোলতে যা বুঝিয়েছেন তা থেকে ভ্রষ্ট হোয়ে যখন এ জাতি 'জ্ঞান' কে শুধু ফতোয়ার জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ কোরলো তখন এটা অশিক্ষা-কুশিক্ষায় পতিত হোয়ে মৃত হোয়ে গেলো এবং আজও সেই মৃতই আছে।

আল্লাহ 'জ্ঞান' বোলতে কি বুঝিয়েছেন? মুসা (আঃ) একবার আল্লাহকে সাতটি প্রশ্ন কোরেছিলেন। তার মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিলো- আল্লাহ! আপনার বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানী কে অর্থাৎ আলেম কে? আল্লাহ বোললেন- যে জ্ঞানার্জনে কখনো তৃপ্ত হয় না এবং মানুষের অর্জিত জ্ঞানকেও যে ব্যক্তি নিজের জ্ঞানের মধ্যে জমা কোরতে থাকে (হাদীসে কুদসী- আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বায়হাকী ও এবনে আসাকির)। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে আল্লাহ জ্ঞানকে দুই ভাগে ভাগ কোরেছেন। প্রথমটি তাঁর দেয়া জ্ঞান যা তিনি সৃষ্টির প্রথম থেকে তাঁর নবী-রসুলদের মাধ্যমে তাঁর কেতাবসমূহে মানবজাতিকে অর্পণ কোরে আসছেন, যার শেষ কেতাব বা বই হোচ্ছে আল-কোরান। এটা হোচ্ছে অর্পিত জ্ঞান। আর মানুষ পড়াশোনা, চিন্তা-ভাবনা, গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা কোরে যে জ্ঞান অর্জন করে তা হোল অর্জিত জ্ঞান। মুসার (আঃ) প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ নির্দিষ্ট কোরে 'মানুষের অর্জিত জ্ঞান' বোললেন, শব্দ ব্যবহার কোরলেন 'আন্-নাসু', মানুষ। অর্থাৎ **যে আল্লাহর অর্পিত জ্ঞান, অর্থাৎ দীন সম্বন্ধে জ্ঞান এবং মানুষের অর্জিত জ্ঞান- এই উভয় প্রকার জ্ঞান অর্জন কোরতে থাকে এবং কখনোই তৃপ্ত হয় না অর্থাৎ মনে করে না যে তার জ্ঞানার্জন সম্পূর্ণ হোয়েছে, আর প্রয়োজন নেই, সেই হোচ্ছে প্রকৃত জ্ঞানী, আলেম।** বর্তমানে যারা নিজেদের আলেম, অর্থাৎ জ্ঞানী মনে করেন, আল্লাহর দেয়া

জ্ঞানীর সংজ্ঞায় তারা কি আলেম? শুধু দীনের জ্ঞানের বাইরে মানুষের অর্জিত জ্ঞান সম্বন্ধে যাদের সামান্যতম জ্ঞানও নেই এবং সেই জ্ঞান সম্বন্ধে পিপাসাও নেই তারা আলেম হোতে পারেন না। আলোচ্য হাদীসে আল্লাহর রসুল আলেম বোলতে তাদেরকেই বুঝিয়েছেন যারা আলেম হিসাবে তাঁর উম্মাহর মধ্যে পরিচিত হোলেও 'প্রকৃত আলেম' নন। কারণ প্রকৃত যারা আলেম তারা আসমানের নিচে নিকৃষ্টতম জীব হোতে পারেন না, তারা আল্লাহ ও রসুলের কাছেও সম্মানিত, রসুলাল্লাহ বলেন, 'আলেমের নিদ্রা আবেদের এবাদতের চেয়েও উত্তম' (হাদীস)।

আরবি পৃথিবীর অন্যান্য প্রধান ভাষাগুলির মধ্যে একটি ভাষা। এই ভাষা সম্পর্কে কিছু জ্ঞান লাভ কোরে যারা খুব অহংকারে স্ফীত হোয়ে থাকেন, নিজেদেরকে এসলামের আলেম বোলে মনে করেন, তাদের জ্ঞাতার্থে বলছি, তারা নিজেদের সম্পর্কে একটি ভ্রান্ত ধারণা পোষণ কোরছেন এবং সেই ভ্রান্ত ধারণা প্রচারও কোরছেন। এসলাম শিক্ষা এক জিনিস আর আরবি ভাষা শিক্ষা আরেক জিনিস। আপনাদের জানা থাকার কথা, ১৭৮০ সন থেকে এই উপমহাদেশে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই অধ্যক্ষ পদে যে খ্রিস্টান পণ্ডিতরা ছিলেন (ড. এ. স্পিঙ্গার থেকে হ্যামিলটন হার্টি পর্যন্ত ২৬ জন) তাদেরকে প্রাচ্যবিদ (Orientalist) বলা হত। তাদের একেকজন ছিলেন আরবি ভাষায় বিশেষজ্ঞ (Scholar, Master)। আরবি ভাষা, সাহিত্য ইত্যাদি সম্পর্কে তাদের যে অগাধ জ্ঞান ছিল তার তুলনা আজকের আলেমদের মধ্যে দু'চারজন পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ আছে। তাছাড়া সবারই জানার কথা, এসলামের শত্রু আবু জাহেল, আবু লাহাবরাও আরবি জানতো। আজকের মাদ্রাসাগুলিতে আরবি সাহিত্য হিসাবে এমরুল কায়েসের যে 'সাব'আ মোয়াল্লাকা' পড়ানো হয় তা রসুলাল্লাহর আগমনের আগেই লিখিত হয় যার সঙ্গে এসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ আমি যে কথা বোলতে চাচ্ছি, এসলাম শিক্ষা এক জিনিস আর আরবি ভাষা শিক্ষা আরেক জিনিস। এসলাম শিখেছিলেন বেলাল (রা:), আম্মা খাদীজা (রা:), আম্মার (রা:), আলী (রা:), আবুবকর (রা:), ওমর (রা:), ওসমান (রা:), আবু ওবায়দা (রা:) প্রমুখ রসুলাল্লাহর সাহাবীরা, সেই এসলাম শিখে তাঁরা সেটিকে অর্থাৎ আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থাকে সমস্ত দুনিয়াময় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানবজাতির সামষ্টিক জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁদের বাড়ি-ঘর, স্ত্রী, পুত্র, সহায় সম্পত্তি সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে অবশেষে নিজের প্রাণটুকুও বিসর্জন দেওয়ার জন্য দুনিয়ার বুকে বহির্গত হোয়ে গিয়েছিলেন। এই অধিকাংশ সাহাবীর কবর হোয়েছে বিদেশের মাটিতে। তাঁরা এসলাম প্রচার ও

প্রতিষ্ঠার কাজ কোরতে গিয়ে বিনিময় নেওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না বরং তাঁরা অবর্ণনীয় নির্যাতন ও দুঃখ কষ্টের শিকার হোয়েছেন। তাঁরা জান দিয়ে জাতির ঐক্য রক্ষা কোরেছেন, আল্লাহর রসুলের হুকুমের বিপরীতে কোনো শক্তির কাছে মাথা নত করেন নি। তাঁদের এই অতুলনীয় কোরবানীর বিনিময়ে আটলান্টিকের তীর থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত অর্ধ পৃথিবীতে আল্লাহ রসুলের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হোয়েছিল। কোনো শক্তি দুনিয়াতে ছিল না যে এই জাতির দিকে চোখ তুলে তাকায়। জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, সামরিক শক্তিতে সকল জাতির শিক্ষকের আসনে অধিষ্ঠিত হোয়েছিলেন। এটা হোল এসলামের এলেম অর্থাৎ জ্ঞান অর্জনের ফল। এই কাজ কোরতে গিয়ে বোধহয় পুরো জাতির মধ্যে এমন একজন লোকও খুঁজে পাওয়া মুশকিল ছিল যাদের শরীরে কোনো প্রকার অস্ত্রের আঘাত লাগে নি। **তাঁরা কিন্তু আমাদের আজকের আলেমদের মতো হুজরায়, খানকায়, মাদ্রাসায়, মসজিদে, মক্তবে আরাম আয়েশে বসে বসে বিকৃত দীনের এলেম বিক্রি কোরে অর্থ উপার্জন কোরেই নিরাপদ জীবন অতিবাহিত করেন নি এবং নিজেদের নামের পূর্বে মাওলানা, মুফতী, মোফাসসের, মোহাদ্দেস, আল্লামা ইত্যাদি পদবীও ব্যবহার কোরে জনসাধারণের মধ্যে সেই এসলাম বিক্রি কোরে খান নি। যদি তাঁরা এটা কোরতেন তবে এসলাম হাজার হাজার মাইল দূরের আরবের মরুভূমি থেকে পাহাড় পর্বত সমুদ্র ডিঙ্গিয়ে এই পর্যন্ত আসতো না, আলেমরাও আজ আল্লাহ, রসুল, কোর'আন, হাদীসের নাম ভাঙ্গিয়ে ধর্মব্যবসা কোরে খেতে পারতেন না। তাদের নাম হোত অমুক চন্দ্র অথবা তমুক বড়-য়া ইত্যাদি। তারা মন্দিরে প্যাগোডায় বোসে নামাবলী গায়ে দিয়ে, কপালে তিলক চন্দন মাখিয়ে বৌদ্ধং শরণং গচ্ছামী জপতেন অথবা নাম সংকীর্তন গাইতেন।**

সুরা হুজরাতের ১৫ নং আয়াত অনুসারে মো'মেন হওয়ার জন্য প্রধান দু'টি শর্ত- এক) আল্লাহর ও তাঁর রসুলের প্রতি ঈমান অর্থাৎ তওহীদ (আল্লাহর সার্বভৌমত্ব) এবং দুই) এই তওহীদভিত্তিক সত্যদীনকে দুনিয়াময় প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম (জেহাদ) । এই দু'টি শর্ত পূরণকারীরাই মো'মেন। এদেরকে আল্লাহ দুনিয়াতে কর্তৃত্ব ও আখেরাতে জান্নাতে দাখিল করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এখন কেউ যদি মুফতি, আলেম, ফকীহ, আল্লামা, মাওলানা বহু কিছু হন কিন্তু আল্লাহর দেওয়া সংজ্ঞা মোতাবেক মো'মেন না হন তবে কি লাভ হোল? প্রকৃত উম্মতে মোহাম্মদী মো'মেন ছিলেন যদিও তাঁদের

অধিকাংশই লেখা-পড়া জানতেন না। অথচ আল্লাহর দৃষ্টিতে এই নিরক্ষর মানুষগুলিই ছিলেন প্রকৃত আলেম। তার প্রমাণ সুরা এমরানের ১৮ নং আয়াতে আল্লাহ আলেমদের সম্পর্কে বোলেছেন তারা আল্লাহর সার্বভৌমত্বের, তওহীদের ঘোষণা দেন অর্থাৎ তওহীদে কায়েম থাকেন। বর্তমানে কেবল আলেমরাই নন, পুরো মোসলেম জাতিই দাজ্জালের সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে তার পায়ে সেজদায় প্রণত হোয়ে আছে।

আমার আজকের কথাগুলো হয়তো অনেকের কাছে রূঢ় মনে হোতে পারে, কিন্তু আমি নিরুপায়, আমি যা বোলছি তা সত্যের খাতিরেই আমাকে বোলতে হোচ্ছে। নয়তো আল্লাহর কাছে আমি দায়ী থাকবো। আমি শুধু বোলতে চাই আল্লাহর রসুল যে এসলাম রেখে গেছেন, যে জাতি রেখে গেছেন, সেই এসলাম এবং সে জাতির সঙ্গে বর্তমানের এই জাতিকে একটু মিলিয়ে দেখুন, তাহোলেই আমাদের আজকের এই হীনতা, এই লাঞ্ছনা, অনৈক্য পরিশেষে ইহুদি খ্রিস্টান সভ্যতার নিকৃষ্ট দাসত্বের কারণ দেখতে পাবেন।

এটা মানুষের ইতিহাসে বারম্বার ঘোটেছে যে, রাজা, বাদশাহ বা শাসক শ্রেণী যখনই শরীয়াহবিরোধী কোনো কাজ কোরতে চেয়েছে, তখন তারা এই কাজের বৈধতা প্রমাণের জন্য, জায়েজ করার জন্য (License) আলেমদেরকে দিয়েই তাদের অপকর্মের পক্ষে ফতোয়া প্রদান কোরিয়েছে। সাধারণ এসলাম-প্রিয় মানুষ ধর্মীয় ব্যাপারে এই আলেম শ্রেণীর উপরে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। তাই আলেমরা যখন কোর'আন হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা কোরে আল্লাহর রসুলের হুকুম পরিপন্থী কর্মকাণ্ডকে জায়েজ বোলে প্রচার করেন, তখন সাধারণ মানুষ সেটাকেই আল্লাহর কথা বোলে বিশ্বাস করে। এসলামের নাম নিয়ে এসলাম পরিপন্থী ফতোয়া দেওয়ার জন্য কিছু ধর্মজীবীর এমন দীন বিক্রয় আল্লাহর চোখে অত্যন্ত ঘৃণার কাজ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বোলেছেন, "সুতরাং দুর্ভোগ তাদের জন্য, যারা নিজ হাতে কেতাব রচনা করে এবং তুচ্ছ মূল্য প্রাপ্তির জন্য বলে, 'এগুলি আল্লাহর নিকট থেকে আগত। তাদের হাত যা রচনা কোরেছে তার জন্য তাদের শাস্তি দেওয়া হবে এবং যা তারা উপার্জন করে, তার জন্যও তাদের শাস্তি দেওয়া হবে।) [বাকারা-৭৯]

কোন সত্যনিষ্ঠ লোক যদি আজ আল্লাহর দয়ায় এই দীনের মর্মবাণী কী, আত্মা কী তা বুঝতে পারেন এবং তিনি যদি সেটা মানুষের মধ্যে প্রচার করার জন্য আত্মনিয়োগ করেন তবে এই

মানুষটিকে প্রথমে বাধা দিবে এই আলেম হিসাবে পরিচিত শ্রেণীটি। তারা প্রথমে বলবে এই লোক এসলামের কী বুঝে? সে কি মাদ্রাসায় পড়েছে? সে কি আরবি জানে? আরবি ব্যাকরণ জানে? তার কি লম্বা দাড়ি আছে, পাগড়ী আছে, আলখেল্লা আছে? সুতরাং এর এসলামের কথা বলার কোনো অধিকার নেই, দীন বোঝা কি এতই সোজা? কোর'আন বোঝা অত্যন্ত কঠিন, এটা জানতে মাদ্রাসায় ডিগ্রী নিতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। তাদের জ্ঞাতার্থে বলছি, আল্লাহ এই দীনের নাম দিয়েছেন সেরাতুল মোস্তাকীম যার অর্থ সহজ সরল পথ (সুরা ফাতেহা) । নবী করীম (দ:) বলেছেন দীন অত্যন্ত সহজ, তোমরা একে জটিল কোর না (আবু হোরায়রা (রা:) থেকে মোসলেম) । আল্লাহ রসুল বলেন দীন সহজ সরল আর আমাদের আলেমরা বলেন কঠিন ও জটিল, একেবারে বিপরীত কথা।

এ ছাড়াও সুরা বাকারার ১৭৪-১৭৬ নং পর্যন্ত আয়াতগুলিতে আল্লাহ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বোলেছেন, "আল্লাহ যে কেতাব অবতীর্ণ কোরেছেন যারা তা গোপন করে এবং বিনিময়ে তুচ্ছমূল্য গ্রহণ করে তারা (১) নিজেদের পেটে আগুন ছাড়া কিছুই পুরে না, (২) কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বোলবেন না, (৩) আল্লাহ তাদের পবিত্রও কোরবেন না, (৪) তারা ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তি ক্রয় কোরেছে, (৫) তারা হেদায়াতের পরিবর্তে পথভ্রষ্টতা, গোমরাহী ক্রয় কোরেছে, (৬) তারা দীন সম্পর্কে ঘোরতর মতভেদে লিপ্ত আছে (৭) আগুন সহ্য কোরতে তারা কতই না ধৈর্যশীল" অর্থাৎ মোটকথা তারা নিকৃষ্টতম জাহান্নামী। এখন আপনারাই বোলুন, যারা বিভিন্ন উপলক্ষ্যে, বিভিন্ন উপায়ে দীনের বিনিময় নিচ্ছেন তারা কি প্রকৃত আলেম হোতে পারেন? অসম্ভব। এজন্যই মহান আল্লাহ সুরা ইয়াসীনের ২১ নং আয়াতে বোলেছেন, "তোমরা তাদের এত্তেবা (আনুগত্য, পেছনে দাঁড়ানো, অনুসরণ) কোরো, যারা তোমাদের কাছে বিনিময় চায় না এবং যারা হেদায়াতে আছে।"

আল্লাহর রসুল আমাদের আলোচ্য হাদীসটিতে মূলত আল্লাহর উপরোক্ত কথারই প্রতিধ্বনি কোরেছেন। যারা সত্য গোপন রাখে, দীনের মধ্যে মতভেদ তৈরি কোরে রাখে এবং সেই দীনকে বিক্রি কোরে জীবিকা নির্বাহ করে তারা আলেম নন বরং তারা আসমানের নীচে সর্বনিকৃষ্ট জীব।

এই শ্রেণী কিভাবে সৃষ্টি হোল?

সুপ্রিয় পাঠক, প্রথমে আমাদের জানা দরকার এই যে মোসলেম নামের বৃহত্তর জনসাধারণ থেকে আলাদা একটি শ্রেণী যারা অর্থের বিনিময়ে আমাদের মসজিদগুলিতে নামাজ পড়াবেন, মিলাদ পড়াবেন, আমাদের মৃত্যুর পর জানাজা পড়াবেন, আমাদের পূর্বপুরুষদের কবর জেয়ারত কোরবেন, গরু কোরবানী কোরে দিবেন, ফতোয়া দিবেন, বিয়ে পড়িয়ে দিবেন ইত্যাদি ধর্মীয় কাজগুলি কোরে দিবেন আর বৃহত্তর জনসাধারণ এসলাম সম্পর্কে কিছুই জানবে না, তারা এই শ্রেণীটির মুখাপেক্ষী হোয়ে থাকবে এই রীতিটি কিভাবে চালু হোল। একদিকে ধর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ তথা বৃহত্তর জনসাধারণ, অন্যদিকে অর্থের বিনিময়ে তাদের ধর্মীয় কাজগুলি কোরে দেওয়ার জন্য পৃথক একটি শ্রেণী অর্থাৎ পুরোহিত শ্রেণী- মোসলেম সমাজে এই রকম শ্রেণী বিভাজন আল্লাহর রসুল যে জাতিটি রেখে গিয়েছিলেন সেই জাতির মধ্যে ছিল কি না? এর এক কথায় উত্তর হোল: ছিল না। তাহোলে সেই জাতিটি কেমন ছিল? এই প্রশ্নের জবাব জানতে আমাদেরকে একটু পেছনে ফিরে যেতে হবে।

মানবজাতির শ্রেষ্ঠতম পুরুষ মোহাম্মদ (দ:) কে আল্লাহ সর্বশেষ নবী হিসাবে মনোনীত কোরলেন। তাঁকে আল্লাহ যে উদ্দেশ্যে প্রেরণ কোরলেন তা তিনি পবিত্র কোর'আনে অন্ততঃ তিনবার সুস্পষ্টভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি স্বীয় রসুল প্রেরণ কোরেছেন হেদায়াহ ও সত্যদীন (ন্যায় জীবনব্যবস্থা) সহকারে এই জন্য যে, রসুল যেন একে অন্যান্য সকল জীবনব্যবস্থার উপরে বিজয়ী হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন (সুরা সফ ৯, সুরা তওবা ৩৩, সুরা ফাতাহ ২৮)। আল্লাহ রসুলকে দিলেন হেদায়াহ অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কোনো হুকুমদাতা (এলাহ) নেই' এই তওহীদ এবং এই তওহীদের উপর ভিত্তি করা জীবনব্যবস্থা, দীনুল হক। এই জীবনব্যবস্থা বা দীনের মধ্যে আল্লাহ উল্লেখ কোরলেন মানবজাতি তাদের সামগ্রিক জীবনে কিভাবে পথ চোলবে, কি তাঁর আদেশ-নিষেধ, হালাল-হারাম, বৈধ-অবৈধ, জায়েজ-নাজায়েজ ইত্যাদি। এই দীন আল্লাহ রসুলকে অর্পণ কোরে দায়িত্ব দিলেন সমগ্র পৃথিবীতে সেটি প্রতিষ্ঠা করার জন্য। এই বিশাল দায়িত্বকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি কোরেছিলেন বলেই বিশ্বনবী (দ:) বলেছেন- আমি আদেশ পেয়েছি (আল্লাহর) পৃথিবীর মানুষের বিরুদ্ধে কেতাল চালিয়ে যেতে যে পর্যন্ত না তারা সাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহ ছাড়া এলাহ নেই এবং আমি মোহাম্মদ আল্লাহর রসুল এবং সালাহ প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত দেয় [আবদুল্লাহ এবনে

ওমর (রা:) থেকে বোখারী]। এবং আল্লাহর ঐ বহুবার পুনরাবৃত্তি করা আদেশ যাকে জোর গুরুত্ব দেবার জন্য তিনি নিজে ঐ কথার সাক্ষী হোয়েছেন, বোলেছেন আমিই এ কথার সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট। এত বড় কাজ একা করা সম্ভব নয়। তাই শুরুতেই তিনি মানুষের মধ্যে হেদায়াতের, তওহীদের আহ্বান প্রচার কোরতে আরম্ভ কোরলেন। সাফা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে তিনি মানবজাতিকে আহ্বান কোরলেন, "হে মানবজাতি! তোমরা বল আল্লাহ ছাড়া কোনো হুকুমদাতা নেই"। সুতরাং এটা পরিষ্কার বোঝা গেল যে, এই শেষ দীনের লক্ষ্য হোচ্ছে মানবজাতি। সেইজন্য শেষ রসুলের উপাধি আল্লাহ দিয়েছেন 'মানবজাতির জন্য সর্বোত্তম আদর্শ (উসওয়াতুন হাসানা)', বিশ্বজগতের জন্য রহমত (রাহমাতাল্লেল আলামীন), সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি (খুলকুন আযীম)। তাঁকে প্রেরণের উদ্দেশ্যই হোচ্ছে পুরো মানবজাতিকে একটি জীবনব্যবস্থার অধীনে নিয়ে আসা, একজন নেতার নেতৃত্বে তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ কোরে একটি মহাজাতিতে পরিণত করা। এই লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে রসুলাল্লাহ ১৩ বছর মক্কায় কেবল তওহীদের ডাক দিয়ে গেলেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে এসলাম গ্রহণ কোরলেন আম্মা খাদীজা (রা:), যায়েদ (রা:), আম্মার (রা:), ওমর (রা:), আলী (রা:), আবু বকর (রা:), বেলাল (রা:) প্রমুখ সাহাবীগণ। রসুলাল্লাহ এবং তাঁর আসহাবগণ তওহীদের ডাক দিতে গিয়ে ১৩ বছর মক্কায় অবর্ণনীয় নির্যাতন নিপীড়ন ভোগ কোরলেন। তারপর আল্লাহ যখন তাঁকে মদীনার কর্তৃত্ব দান কোরলেন তিনি সেখানে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ভিত্তিক জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা কোরলেন। তখন এই জাতির মধ্যে এর আদর্শ ও লক্ষ্য নিয়ে কোনো মতভেদ ছিল না। পুরো উম্মতে মোহাম্মদী ছিল একটি জাতি এবং তাঁদের নেতা ছিলেন একজন, স্বয়ং রসুলাল্লাহ। রসুলাল্লাহ তাঁর জীবদ্দশায় ঐ জাতিকে সঙ্গে নিয়ে জেহাদ (সংগ্রাম) চালিয়ে গেলেন এবং সমগ্র আরব উপদ্বীপ আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থার অধীনে এলো। বাকী পৃথিবীকেও আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ছায়াতলে নিয়ে আসার জন্য স্বীয় উম্মাহকে দায়িত্ব অর্পণ কোরে রসুলাল্লাহ প্রভুর কাছে চোলে গেলেন। রেখে গেলেন পাঁচ দফার অমূল্য এক কর্মসূচি। এই কর্মসূচি তিনি তাঁর উম্মাহর উপর অর্পণ করার সময় বোলছেন- এই কর্মসূচি আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন, (আমি সারাজীবন এই কর্মসূচি অনুযায়ী সংগ্রাম কোরেছি) এখন এটা তোমাদের হাতে অর্পণ কোরে আমি চোলে যাচ্ছি। সেগুলো হোল :

(১) ঐক্যবদ্ধ হও।

(২) (নেতার আদেশ) শোন।

(৩) (নেতার ঐ আদেশ) পালন করো।

(৪) হেজরত করো।

(৫) (এই দীনুল হক কে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার জন্য) আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করো।

যে ব্যক্তি (কর্মসূচির) এই ঐক্যবন্ধনী থেকে এক বিঘত পরিমাণও বহির্গত হোল, সে নিশ্চয় তার গলা থেকে এসলামের রজ্জু (বন্ধন) খুলে ফেললো- যদি না সে আবার ফিরে আসে (তওবা করে) এবং যে ব্যক্তি অজ্ঞানতার যুগের (কোনও কিছুর) দিকে আহ্বান কোরলো, সে নিজেকে মোসলেম বোলে বিশ্বাস কোরলেও, নামাজ পোড়লেও এবং রোজা রাখলেও নিশ্চয়ই সে জাহান্নামের জ্বালানী পাথর হবে [আল হারিস আল আশয়ারী (রাঃ) থেকে আহমদ, তিরমিযি, বাব উল এমারাত, মেশকাত] ।

উম্মতে মোহাম্মদী এই কর্মসূচি ও তাঁদের উপরে তাঁদের নেতার অর্পিত দায়িত্ব হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি কোরেছিলেন তার অকাট্য প্রমাণ এই যে, ঐ উম্মাহ বিশ্বনবীর (দ:) ওফাতের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের পার্থিব সব কিছু কোরবান কোরে তাঁদের নেতার উপর আল্লাহর দেয়া দায়িত্ব পূর্ণ কোরতে আবু বকরের (রা:) হুকুমে তাঁদের দেশ থেকে বের হোয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা ছিলেন এক নেতার নেতৃত্বে বজ্রকঠিন ঐক্যবদ্ধ, সুশৃঙ্খল, নেতার হুকুমে জীবন উৎসর্গকারী, শেরক ও কুফর তথা মোশরেক ও কাফেরদের জন্য ত্রাস সৃষ্টিকারী একটি দুর্ধর্ষ যোদ্ধা জাতি। তাঁদের মধ্যে কোনো মতভেদ তো ছিলই না, কোনো মোনাফেক যদি নেতার হুকুমের ব্যাপারে কোনো দ্বিমত সৃষ্টির চেষ্টা কোরত, প্রকৃত উম্মতে মোহাম্মদী নির্দ্বিধায় তার ফায়সালা কোরে ফেলত। সেই জাতির কোর'আনের কোনো অখণ্ড কপিও ছিল না, হাদীসের কোনো বই ছিল না, ফেকাহ, তফসির, ফতোয়ার কেতাব তো দূরের কথা। অর্ধেক দুনিয়া আল্লাহ এই জাতির পায়ের নিচে দিয়ে দিলেন। তখনও এ জাতির মধ্যে কোনো পুরোহিত শ্রেণী ছিল না, সবাই ছিলেন যোদ্ধা। যিনি ছিলেন যত বড় মো'মেন তিনি ছিলেন তত বড় যোদ্ধা। দীনের ছোটখাট বিষয়গুলি নিয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকারী, আল্লামা, মাওলানা, মুফতি, মোফাসসের টাইটেলধারী, মসজিদে, খানকায়, হুজরায় নিরাপদে বসে জনগণের মধ্যে ফতোয়া প্রদান কোরে জীবিকা নির্বাহকারী একটি আলাদা পুরোহিত শ্রেণী কল্পনাও করা যেত না।

তারপর শুরু হোল সেই দুঃখজনক অধ্যায়। আল্লাহর রসুল ভবিষ্যদ্বাণী কোরে গিয়েছিলেন যে, তাঁর উম্মাহর আয়ু হবে ৬০/৭০ বছর [আবু হুরায়রা (রা:) থেকে মোসলেম]। ঠিকই তাই হোল। ৬০/৭০ বছর পরে এই উম্মাহ তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলল। জাতির নেতৃত্ব ভুলে গেল এ জাতির উদ্দেশ্য সমগ্র পৃথিবীতে আল্লাহর দেওয়া দীনুল হক প্রতিষ্ঠা কোরে মানবজীবন থেকে সর্বপ্রকার অন্যায় অশান্তি নির্মূল কোরে দিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। এই উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে তারা অন্যান্য রাজা বাদশাহদের মতো শান শওকতের সঙ্গে রাজত্ব কোরতে লাগল। আল্লাহর রসুলের সৃষ্টি করা উম্মতে মোহাম্মদীর মোজাহেদরা অর্ধাহারে অনাহারে থেকে, জীবন, সম্পদ, ঘাম ও রক্তের বিনিময়ে যে বিরাট ভূখণ্ড এই নেতাদের হাতে তুলে দিয়েছিল সেই নেতারা এই বিরাট পার্থিব সম্পদের অধিকারী হোয়ে সীমাহীন ভোগ বিলাসে মত্ত হোয়ে পারসিয়ান ও রোমান বাদশাহ কেসরা ও কায়সারদেরকেও ছাড়িয়ে গেল। তখন তারা আর আল্লাহ রসুলের খলিফা রইলেন না। তারা হোয়ে গেলেন উমাইয়া, আব্বাসীয় রাজা বাদশাহ। তাদের সামরিক অভিযানের লক্ষ্য হোয়ে দাঁড়ালো রাজ্যবিস্তার। ধীরে ধীরে রসুলাল্লাহ ও খোলাফায়ের রাশেদুনের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হোতে শুরু কোরল, তারা আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠার জেহাদ পরিত্যাগ কোরল। সাধারণ মোসলেমরা এই আদর্শচ্যুতির বিরুদ্ধে কথা বোলতে আরম্ভ কোরল। জেহাদ যখন ত্যাগ করা হোল, তখন জাতির মুখ্য কাজটিই হারিয়ে গেল, জেহাদ সংক্রান্ত বিপুল কর্মব্যস্ততা হারিয়ে ফেলে সময় অতিবাহিত করার জন্য নতুন একটি কাজ খুঁজে নিল। সেটা হোল দীনের বিধি বিধানের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। দীনের প্রতিটি বিষয় নিয়ে মাসলা মাসায়েল বের করা আরম্ভ হল। সেই মাসলার বিপক্ষেও আরেকদল অন্য মাসলা হাজির কোরতে আরম্ভ কোরল। এভাবে শুরু হোল দীন নিয়ে মতভেদ। অবস্থা এমন পর্যায়ে গেল যে, দীনের একটি বিষয়ও রোইল না, যেটা নিয়ে কোনো বিতর্ক বা দ্বিমত নেই। এভাবে সহজ সরল দীন - শুধু তওহীদ লা- এলাহা এল্লা আল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কারও সার্বভৌমত্ব, হুকুম মানবো না) এবং এই সার্বভৌমত্বকে সারা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার জেহাদ এই সেরাতুল মোস্তাকীমের উপরেই রসুলাল্লাহ উম্মতে মোহাম্মদীকে ঐক্যবদ্ধ কোরেছিলেন। সেই দীনটি পণ্ডিতদের কাজের ফলে হোয়ে গেল জটিল ও দুর্বোধ্য।

আলেম ওলামারা সহজ সরল দীনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ কোরে একে সাধারণ মানুষের বোধগম্যতার বাইরে নিয়ে গেছেন এবং বিকৃত-বিপরীতমুখী সেই দীনটিকে বিক্রি কোরে জীবিকা নির্বাহ কোরছেন।

একটা জাতির মধ্যে জ্ঞানী, চালাক, বোকা, সর্ব রকম মানুষই থাকবে, সব নিয়েই একটি জাতি। সুতরাং লক্ষ্য যদি জটিল হয় তবে সবার তা বোধগম্য হবে না। জাতির যে অংশটুকু শিক্ষিত ও মেধাবী, শুধু তাদেরই বোধগম্য হবে- সমগ্র জাতি একতাবদ্ধ হোয়ে ঐ লক্ষ্য অর্জনের সংগ্রাম কোরতে পারবে না। তাই আল্লাহ ও তাঁর রসুল (দ:) যে জাতি সৃষ্টি কোরলেন তার ভিত্তি কোরলেন অতি সহজ ও সরল-তওহীদ, একমাত্র প্রভু হিসাবে তাঁকেই স্বীকার কোরে নেওয়া। এর নাম দিলেন দীনুল কাইয়্যেমা ও সেরাতুল মোস্তাকীম, চিরন্তন, সহজ সরল পথ। এটাই যে সব কিছু তা বোঝাবার জন্য অবশ্য কর্তব্য (ফরজ) কোরে দিলেন প্রতি রাকাতে ঐ সেরাতুল মোস্তাকীমে চালাবার প্রার্থনা করা, যাতে প্রতিটি মোসলেমের সর্বক্ষণ এ সহজ সরল পথের কথা মনে থাকে, ঐ সহজ সরলতার ভিত্তি ছেড়ে জটিলতার দিকে সরে না যায় এবং জাতির লক্ষ্যও স্থির কোরে দিলেন অতি সহজ ও সরল-ঐ দীনুল কাইয়্যেমাকে, সেরাতুল মোস্তাকীমকে সংগ্রামের মাধ্যমে সমস্ত পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা কোরে পৃথিবীতে শান্তি (এসলাম) প্রতিষ্ঠা করা। দুটোই বুঝতে সহজ। সহজ

বোলেই বিশ্বনবীর (দ:) সৃষ্ট অত্যন্ত অশিক্ষিত জাতিটি, যার মধ্যে লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা হাতে গোনা-যেতো তারাও ভিত্তি ও লক্ষ্য পরিষ্কারভাবে বুঝতে পেরেছিলেন এবং তা থেকে চ্যুত হন নি এবং তারা সফলভাবে আল্লাহ রসুলের (দ:) উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে বহু দূর অগ্রসর হোয়েছিলেন। কিন্তু অতি বিশ্লেষণের বিষময় ফলে ঐ দীনুল কাইয়্যেমা, সেরাতুল মোস্তাকীম হোয়ে গেলো অত্যন্ত জটিল, দুর্বোধ্য এক জীবন-বিধান, যেটা সম্পূর্ণ শিক্ষা করাই মানুষের এক জীবনের মধ্যে সম্ভব নয়- সেটাকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম তো বহু দূরের কথা। জাতি লক্ষ্যচ্যুত তো আগেই হোয়ে গিয়েছিলো, তারপর ফকিহ ও মোফাস্সেরদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণের ফলে জাতির মধ্যে ভয়াবহ বিভেদ সৃষ্টি হোয়ে, বিভিন্ন মাযহাব ও ফেরকা সৃষ্টি হোয়ে যে অনৈক্য সৃষ্টি হোল তার ফলে পুনরায় একতাবদ্ধ হোয়ে সংগ্রাম করার সম্ভাবনাও শেষ হোয়ে গেলো। এই জন্য রসুলাল্লাহ (দ:) বোলেছিলেন আমার উম্মাহর আয়ু ৬০/৭০ বছর।

জাতির মধ্যে বিভেদের এই ভয়াবহ ঘটনার সূত্রপাত হোল ঠিক রসুলাল্লাহর এন্তেকালের ৬০/৭০ বছর পর থেকেই। যে কথাটি পূর্বে বোলেছিলাম, জাতির নেতৃত্ব যখন জেহাদ ত্যাগ কোরল তখন আব্বাসীয়, উমাইয়া, ফাতেমীয় ইত্যাদি নামের শাসকরা নিজেদের এই অন্যায় কাজের ন্যায্যতা প্রমাণের জন্য এসলামের বিধি বিধান সম্পর্কে সেই জ্ঞানী লোকদেরকে ঠিক কোরল, যারা ইতোপূর্বেই জেহাদ ছেড়ে দিয়ে দীনের মাসলা মাসায়েল নিয়ে ব্যাপৃত ছিল।

এই জ্ঞানীদের নতুন কাজ হোল শাসকের সকল অন্যায় কাজের পক্ষে সাফাই গাওয়া এবং সেগুলির একটি ধর্মীয় ব্যাখ্যা দাঁড় কোরিয়ে তাকে জায়েজ করা এবং প্রয়োজনে রসুলাল্লাহর নামে হাদীস তৈরি করা। বিনিময়ে শাসকদের পক্ষ থেকে তারা লাভ কোরতে লাগল মদদ, উপঢৌকন, ভোগবিলাসের যাবতীয় উপকরণ সর্বোপরি একটি নিরাপদ নিশ্চিত জীবন। শাসকের নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে থেকে এভাবে হাজার হাজার জাল হাদীস সৃষ্টি হোতে লাগল। সেই জাল হাদীসগুলির উপর এজমা, কেয়াস কোরে তৈরি হোল হাজার হাজার মত, পথ, দল। দলের মধ্যে বিভক্তি কোরে সৃষ্টি হোল উপদল ইত্যাদি। এই জ্ঞানীরাই হোল এসলামের ইতিহাসে প্রথম ধর্মজীবী আলেম। এসলামের বিধান হোল, জাতির নেতা বা এমাম সালাতেরও এমামতি কোরবেন। তবে বিধর্মী রাজা বাদশাহদের অনুকরণে ভোগবিলাসে লিপ্ত শাসকরা এটুকু উপলব্ধি কোরলেন যে 'খলিফা' বা আমীর' উপাধি তাদের আর সাজে না, তাই তারা সুলতান, মালিক (রাজা বাদশাহ) ইত্যাদি

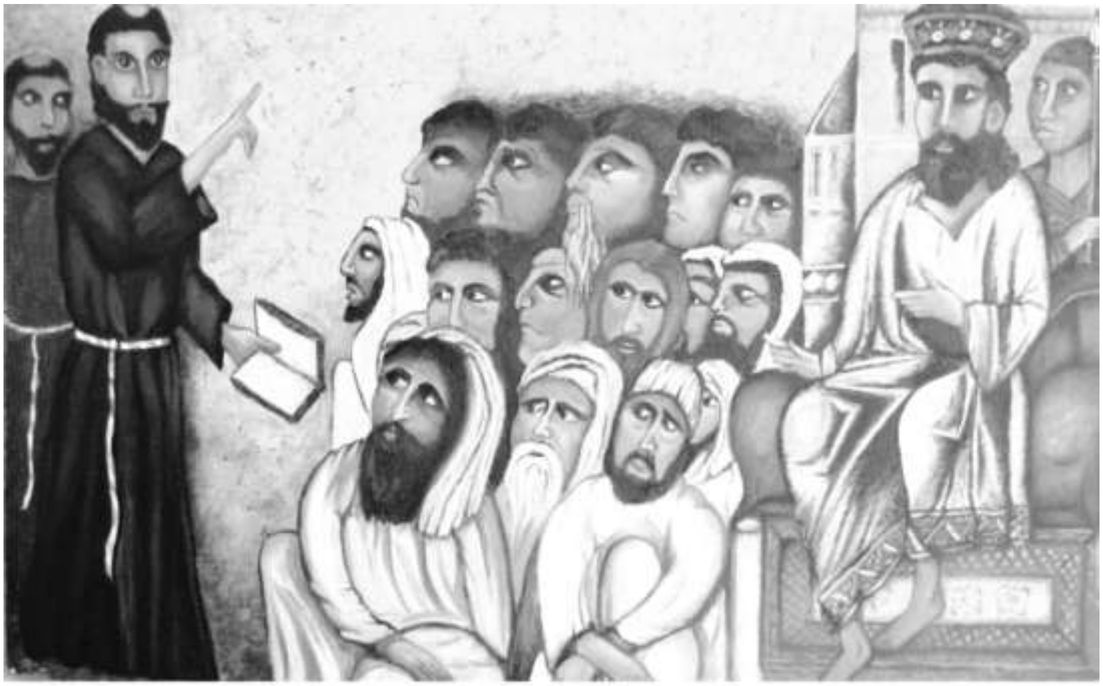

আব্বাসীয়, উমাইয়া, ফাতেমীয় ইত্যাদি খলিফা নামের রাজা বাদশারা নিজেদের অন্যায় কাজের ন্যায্যতা প্রমাণের জন্য এসলামের বিধি বিধান সম্পর্কে সেই আলেম লোকদেরকে ঠিক কোরল, যারা আগে থেকেই জেহাদ পরিত্যাগ কোরে দীনের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণে ব্যস্ত ছিল। এই আলেমরা রাজার স্বার্থ রক্ষার্থে সাধারণ জনগণকে নানা ফতোয়া দিয়ে বিভ্রান্ত কোরত। এই ধারাবাহিকতা আজও চলমান আছে।

নাম ধারণ কোরে রাজতন্ত্রের ষোলকলা পূর্ণ কোরলেন। এ সময় তারা গাফেলতি কোরে সালাতে এমামতি করার জন্য মসজিদে উপস্থিত হওয়াও ত্যাগ কোরতে লাগলেন এবং মসজিদে তাদের পক্ষ থেকে সালাহ কায়েম করানোর জন্য বেতনভুক্ত এমামও নিয়োগ দিলেন। এভাবেই ধীরে ধীরে জাতির মধ্যে জন্ম নিল পৃথক একটি গোষ্ঠী যাদের কাছে বাঁধা পড়ল দীনের সকল কর্মকাণ্ড। তাদের হাতে পড়ে দীন বিকৃত হোতে শুরু কোরল।

পূর্ববর্তী দীনগুলিতেও ঠিক এভাবেই এই পুরোহিত শ্রেণীর উদ্ভব হোয়েছিল, তাদের কাজও ছিল দীনের আইন-কানুন, আদেশ, নিষেধগুলির চুলচেরা বিচার, পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ এবং যার পরিণতিতে ঘটে দীনের বিকৃতি। আল্লাহ পবিত্র কোর'আনে এ ইতিহাস ব্যক্ত কোরেছেন এভাবে, "তাদের (নবী ও প্রকৃত মো'মেন) পরে আসল অপদার্থ পরবর্তীগণ, তারা সালাহ বিকৃত ও নষ্ট

কোরল ও লালসা পরবশ হোল। সুতরাং তারা অচিরেই তাদের কুকর্মের শাস্তি প্রত্যক্ষ কোরবে। (সুরা মারইয়াম ৫৯)"। অপদার্থ পরবর্তীগণ বোলতে নবীদের ও প্রকৃত মো'মেনদের পরে যারা তাদের স্থলাভিষিক্ত হোয়েছেন, প্রধানত জাতির নেতারা এবং নবীদের উত্তরসূরী হিসাবে খ্যাত আলেমরা। সাধারণ মানুষ এই উভয়শ্রেণীর অনুসরণেই অভ্যস্থ। স্বভাবতই, তারা যখন জাতিকে ভুল পথে পরিচালিত কোরল, তখন পুরো জাতিটাই বিপথগামী হোল। এটাকেই আল্লাহ বোলেছেন 'অপদার্থ উত্তরসূরীগণ'। সুতরাং এটা আল্লাহর বাণী দ্বারা প্রমাণিত হয় এই নেতৃবর্গ ও উদ্ভূত আলেম শ্রেণীই পার্থিব সম্পদের লোভে নিজেদের সকল অন্যায়কে ধর্মের মোড়কে ঢাকতে গিয়ে দীনের বিকৃতি সাধন কোরেছেন এবং দীনের অতি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ কোরে দীনকে সাধারণের বোধগম্যতার বাইরে নিয়ে গিয়েছেন। তাদের এই কাজের ফলে ঐ জাতিগুলির কি দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি হোয়েছিল তা রসুলাল্লাহ (দ:) খুব ভালভাবেই জানতেন, তাই তিনি নিজের সৃষ্ট জাতিটাকে, তাঁর উম্মাহকে সতর্ক কোরে দিয়েছিলেন যাতে এই উম্মাহও যেন ঐ একই ভুল কোরে ধ্বংস না হয়। একজন সাহাবা তাকে একটু খুঁটিয়ে প্রশ্ন করাতে তিনি উষ্মাভরে বোলেছিলেন- তোমাদের পূর্ববর্তী অনেক জাতি তাদের নবীদের এমনি কোরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন কোরত, তারপর সেই উত্তরগুলি নিয়ে নানা গবেষণা কোরে মতভেদ সৃষ্টি হোত এবং ফলে তারা ধ্বংস হোয়ে গেছে [এবনে মাসুদ (রা:) থেকে বোখারী]। আমি তোমাদের যতটুকু কোরতে বোলেছি ততটুকু কোরতে চেষ্টা করো, ওর বেশি আমাকে প্রশ্ন কোরোনা। বিশ্বনবীর (দ:) এই হাদীসটিকে ভাল কোরে বোঝার প্রয়োজন আছে। এই হাদীসটির মধ্যে তিনটি জিনিস আছে।

প্রথম হোল- তাকে খুঁটিয়ে কোনো প্রশ্ন করা অর্থাৎ সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণে যাওয়া নিষেধ হোয়ে গেলো।

দ্বিতীয় হোল- ঐ কাজের পরিণতি হোল জাতির বিভক্তি ও ধ্বংস।

তৃতীয় হোল- রসুলাল্লাহ (দ:) যেটুকু কোরতে সরাসরি আদেশ কোরেছেন তার বেশি এগুতে যাওয়া নিষিদ্ধ হোয়ে গেলো।

অর্থাৎ অতি ধার্মিক হওয়া, দীনের অতি বিশ্লেষণ কোরে সেগুলি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পালন করা নিষেধ হোয়ে গেলো। আল্লাহর রসুল (দ:) যে কাজ কোরতে নিষেধ কোরেছেন সে কাজ শরিয়াহ মোতাবেকই যে নিষিদ্ধ, হারাম আশা করি তাতে কারো দ্বিমত থাকতে পারে না।

কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, আল্লাহ ও তাঁর রসুল (দ:) যে কাজ নিষিদ্ধ কোরেছেন সেই নিষিদ্ধ কাজই করা হোল এবং করা হোল পুরোদমে, মহা উৎসাহে এবং অতি পুণ্যের, সওয়াবের কাজ বোলে মনে কোরে। ঐ কাজ কোরে জাতির মন-মগজ আসল উদ্দেশ্য, বিশ্বনবীর (দ:) দায়িত্ব, সমস্ত পৃথিবীতে এই দীন, জীবন-বিধান চালু করার সংগ্রাম থেকে মোড় ঘুরিয়ে ঐ দীনের খুঁটিনাটি পালন করার মধ্যে ব্যাপৃত হোয়ে পড়লো এবং ফলে নানা মাযহাবে (দলে) ও ফেরকায় বিভক্ত হোয়ে চরমভাবে দুর্বল হোয়ে পোড়ল। যারা দীনের খুঁটিনাটির অবিশ্বাস্য চুলচেরা বিশ্লেষণ কোরে জাতিকে বহু ভাগে বিভক্ত কোরে ঐ বিভক্তিগুলির মধ্যে বাদানুবাদ, তর্কাতর্কি সৃষ্টি কোরে, ঐক্য নষ্ট কোরে জাতিকে দুর্বল নির্জীব কোরে দিয়েছিলেন, তারা সেরাতুল মোস্তাকীম- সহজ সরল দীনকে, জটিলতার, দুর্বোধ্যতার চরমে নিয়ে সাধারণ মানুষের বোঝার বাইরে নিয়ে গিয়েছিলেন। আরেক শ্রেণীর আলেম এই ভারসাম্যপূর্ণ দীনের মধ্যে ভারসাম্যহীন সুফীবাদ আমদানি কোরে উম্মাহর বিস্ফোরণমুখী (Explosive), বহির্মুখী (Extrovert) চরিত্রকে উলটিয়ে একেবারে অনড় (Passive) ও অন্তর্মুখী (Introvert) চরিত্রে পরিবর্তন কোরে দিয়েছিলেন। এই উভয়শ্রেণীর কাজের ফলে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি শুধু সর্ব নিকৃষ্টেই পরিণত হোল না, যাদের উপর তাদের জয়ী হবার কথা এবং এক সময় হোয়েও ছিলো, তাদের কাছে পরাজিত হোয়ে তাদের ঘৃণিত ক্রীতদাসে পরিণত হোল। এটা যে হবে তাও রসুলাল্লাহ বোলে গেছেন এবং এর কারণও বোলে গেছেন। তিনি একদিন সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস কোরলেন- তোমরা কি জান, এসলামকে কিসে ধ্বংস কোরবে? এই প্রশ্ন কোরে তিনি নিজেই জবাব দিচ্ছেন- শিক্ষিতদের ভুল, মোনাফেকদের বিতর্ক এবং নেতাদের ভুল ফতোয়া (হাদীস-মেশকাত)। যে কাজ এসলামকেই ধ্বংস কোরে দেয় সে কাজের চেয়ে বড় গোনাহ আর কি হোতে পারে!

এর পরের ইতিহাস অতি করুণ। আমি শুধু আমাদের এই অঞ্চলের অর্থাৎ ভারত উপমহাদেশের ঐ সময়ের মূল ঘটনাপ্রবাহ তুলে ধোরছি।

কয়েক শতাব্দী আগে ইউরোপীয় খ্রিস্টানরা যখন সামরিক শক্তিবলে মোসলেম ভূখণ্ড পদানত করে এবং এই মোসলেম নামধারী জনসংখ্যাকে পদানত গোলামে পরিণত করে তখনও এ জাতির অনেকের মধ্যেই এসলামের চেতনা, **আল্লাহর হুকুমের প্রতি আনুগত্য ও মোসলেম হিসাবে শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতি কিছু হোলেও অবশিষ্ট ছিল, তাদের উপর আল্লাহ ও রসুলের হুকুম কি এ ব্যাপারে তারা সচেতন ছিলেন অর্থাৎ আগুনের শিখা না থাকলেও ঈমানের উত্তপ্ত কয়লা তখনও গনগন কোরছিল।** এ কারণে খ্রিস্টানরা ক্ষমতা লাভ কোরলেও তাদের কর্তৃত্ব নিষ্কণ্টক ছিল না। বিভিন্ন স্থানে স্বাধীনচেতা মোসলেমদের বিদ্রোহ লেগেই ছিল। পাক ভারত উপমহাদেশের পরিস্থিতিও এর ব্যতিক্রম নয়। হাজী শরিয়তুল্লাহ ও তার পুত্র দুদু মিয়ার ফারায়েজী আন্দোলন, নুরুদ্দিন বাকের মোহাম্মদ জঙ্গের ফকীর সন্ন্যাসী আন্দোলন, ১৮৫৭ এর স্বাধীনতা সংগ্রাম, শহীদ তিতুমীরের বাঁশের কেল্লার ঘটনাগুলি ব্রিটিশ শাসকদের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। এ ঘটনাগুলির প্রত্যেকটিতে ব্রিটিশ অধ্যুষিত ভারতবর্ষকে দারুল হারব (যুদ্ধক্ষেত্র) ঘোষণা দিয়ে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করা হোয়েছিল। হাজার হাজার মোসলেম এসব আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দিয়েছিলেন এবং বহু সংখ্যক জীবন উৎসর্গও কোরে গেছেন।

এ অস্থিরতা থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ হিসাবে খ্রিস্টানরা যে কয়টি শয়তানী চক্রান্ত কোরল তার একটি হোচ্ছে নিজেদের তৈরি করা আল্লাহর সার্বভৌমত্বহীন, জেহাদবিমুখ বিকৃত এসলাম মাদ্রাসার মাধ্যমে এ জাতির চরিত্রে, আত্মায় গেঁড়ে দেওয়া, দ্বিতীয় পথটি হোচ্ছে চিরাচরিতভাবে কিছু আলেমকে ভাড়া কোরে তাদেরকে দিয়ে ইংরেজ শাসকদের পক্ষে ফতোয়া জারি করা। সেই মোতাবেক কিছু নামীদামি আলেম মোসলেম জাতিকে বোঝালেন যে, ভারতবর্ষ দারুল হারব নয়, দারুল আমান। কারণ তারা ভাল কোরেই জানতেন যে, যেখানে আল্লাহর কোর'আনের হুকুম কার্যকরী নয়, সেটা কখনওই দারুল এসলাম হোতে পারে না। তাই তারা মাঝামাঝি একটি শব্দ উদ্ভাবন কোরল দারুল আমান অর্থাৎ যেখানে ব্যক্তিগতভাবে ধর্ম পালনের অধিকার সুরক্ষিত। যেহেতু খ্রিস্টানরা আযান দিতে, নামাজ পড়তে, হজ্ব কোরতে, আরও অন্যান্য ধর্মীয় কাজে বাধা দিচ্ছে না, তাই জুম্মার সালাহ ও দুই ঈদের সালাহ এখানে কেবল জায়েজ নয়, বাধ্যতামূলকও বটে। সুতরাং এখানে ব্রিটিশ খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে জেহাদ করা অবৈধ এবং বিদ্রোহের শামিল (কেরামত আলী জৈনপুরী রচিত মুকাশাফাত-ই-রাহমা গ্রন্থে ১৩ পৃ:)। ব্রিটিশ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় এই

আলেমরা ব্যাপকভাবে এই মিথ্যা ফতোয়া প্রচার কোরতে থাকলেন এবং এক পর্যায়ে মানুষ এ মিথ্যাকে গ্রহণ কোরে নিল। এই আলেমরা জানতেন তারা মিথ্যা কথা বোলছেন, তারা ভেবেছিলেন এ মিথ্যা ছাড়া এ জাতিকে প্রাণে রক্ষা করার আর কোনো পথ ছিল না, কারণ ব্রিটিশদের সাথে লড়াই কোরে জেতা সম্ভব নয়। এ মিথ্যা কথা বোলে তারা এই জাতির দেহকে জীবিত রাখলেন এবং ব্যক্তিগতভাবে প্রচুর লাভবান হোলেন, কিন্তু জাতির জাত্যবোধ, আত্মাকে মেরে ফেললেন, যে জাতির শির কেবল আল্লাহর সামনে অবনত হোত, তাদেরকে ব্রিটিশ খ্রিস্টানদের পায়ে সেজদাবনত কোরে দিলেন। তারা বুঝলেন না যে এই ভাবে গোলাম হোয়ে বেঁচে থাকা উম্মতে মোহাম্মদীর জীবন নয়, মো'মেনের জীবন নয়, কাফেরের জীবন। মো'মেন কখনও তাগুতের, গায়রুল্লাহর সার্বভৌমত্বের অধীনে বেঁচে থাকতে পারে না। তারা এটা বুঝলেন না যে মো'মেন যখন কাফেরের বিরুদ্ধে জেহাদের অবতীর্ণ হয়, কাফেরের পরাজয় অবধারিত হোয়ে যায়। কেননা আল্লাহ বোলেছেন, মো'মেন কখনও শত্রুর সঙ্গে পরাজিত হবে না, যখনই তারা কাফেরদের সম্মুখীন হবে, কাফের পৃষ্ঠপ্রদর্শন কোরবে। আল্লাহ বলেন, এটা আমার চিরন্তন সুন্নাহ। নিশ্চয়ই আল্লাহর সুন্নাতে (রীতি-নীতি-পন্থা) কোনো ব্যতিক্রম নেই (সুরা ফাতাহ ২৩)। সুতরাং যখন এই জাতি পরাজয় বরণ কোরে নিল তখন এটা সুস্পষ্ট হোয়ে গেল যে এই জাতি আর মো'মেন নয়, মোসলেম নয়, উম্মতে মোহাম্মদী তো দূরের কথা।

ভারত উপমহাদেশের মোসলেমদেরকে সম্পূর্ণরূপে জেহাদ বিমুখ, ভীরু, কাপুরুষ এবং খ্রিস্টান শাসকদের অনুগত নির্বীর্য একটি জনগোষ্ঠীতে পরিণত করার জন্য খ্রিস্টানরা আরেকটি সুদূর প্রসারী ষড়যন্ত্র কোরল। তারা অনেক গবেষণা কোরে একটি বিকৃত এসলাম তৈরি কোরল যাতে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও জেহাদকে বাদ দেওয়া হোল এবং ব্যক্তিগত জীবনের মাসলা মাসায়েল, ফতোয়া, দোয়া কালাম, মিলাদের উর্দূ ফার্সী পদ্য বিশেষ কোরে যে বিষয়গুলি সম্পর্কে পূর্ব থেকেই বহু মতবিরোধ সঞ্চিত ছিল সেগুলিকে অন্তর্ভুক্ত কোরল। এই আত্মাহীন মৃত এসলামটিকে জাতির মনে মগজে গেঁড়ে দেওয়ার জন্য খ্রিস্টানরা ১৭৮০ সনে ভারতের তদানীন্তন রাজধানী কোলকাতায় আলীয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা কোরল। সেখানে নিজেরা অধ্যক্ষ থেকে ১৯২৭ সন পর্যন্ত ১৪৬ বছর ধোরে মোসলেম জাতিকে সেই বিকৃত এসলাম শেখালো। এই শিক্ষাব্যবস্থার সিলেবাসে অংক, ভূগোল, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষা ইত্যাদির কোনো কিছুই

রাখা হোল না, যেন মাদ্রাসা থেকে বেরিয়ে এসে আলেমদের রুজি-রোজগার কোরে খেয়ে বেঁচে থাকার জন্য এই দীন, ধর্ম বিক্রি কোরে রোজগার করা ছাড়া আর কোনো পথ না থাকে। খ্রিস্টানরা এটা এই উদ্দেশ্যে কোরল যে তাদের মাদ্রাসায় শিক্ষিত এই মানুষগুলো যাতে বাধ্য হয় দীন বিক্রি কোরে উপার্জন কোরতে এবং তাদের ওয়াজ নসিহতের মাধ্যমে বিকৃত এসলামটা এই জনগোষ্ঠীর মন-মগজে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হোয়ে যায়। খ্রিস্টানরা তাদের এই পরিকল্পনায় শতভাগ সাফল্য লাভ কোরল। তাদের এই মাদ্রাসা প্রকল্পের মাধ্যমে দীনব্যবসা ব্যাপক বিস্তার লাভ কোরল এবং এর মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যেও হিন্দুদের ব্রাহ্মণ, আচার্য, খ্রিস্টানদের পাদ্রী, ইহুদিদের রাব্বাই, সাদ্দুসাই, ফরিশি, বৌদ্ধদের শ্রমণ, ভিক্ষুদের মতো একটি স্বতন্ত্র পুরোহিত শ্রেণী প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ কোরল।

বর্তমানে 'মোসলেম' দুনিয়ার এই পুরোহিত শ্রেণীর জন্ম ধর্মের, দীনের ইতিহাসে নতুন নয়। এই শ্রেণী সৃষ্টির অনুমতি আল্লাহ কোনো দীনকেই দেন নি, অন্ততঃ যে কয়টি দীন সম্বন্ধে আমরা জানতে পারি। তার আগেরগুলির কথা বোলতে পারি না। কিন্তু প্রত্যেক দীনেই এরা গজিয়েছেন। নিজেদের নিজেরা সৃষ্টি কোরেছেন সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য, সম্মান, প্রভাব ইত্যাদি ভোগ করার জন্য। আর প্রত্যেক দীনকেই, জীবন ব্যবস্থাকেই তারা নতুন ব্যাখ্যা কোরে নতুন মতবাদ সৃষ্টি কোরে টুকরো টুকরো কোরে ভেঙ্গে ফেলেছেন, গুরুত্বের (Priority) উল্টা-পাল্টা কোরে ফেলেছেন, যার ফলে ঐ দীন অর্থহীন হোয়ে গেছে। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিস্টান, ইহুদি ইত্যাদি প্রত্যেক দীনের ঐ একই ইতিহাস, একই অবস্থা। শেষ এসলামে এই শ্রেণীর কোনো অস্তিত্ব ছিলো না। এই উম্মাহ যখন তার অস্তিত্বের উদ্দেশ্য ভুলে যেয়ে, সমস্ত পৃথিবীতে এই জীবন-বিধান প্রতিষ্ঠা কোরে মানব জীবনে শান্তি আনয়নের সংগ্রাম ও সশস্ত্র সংগ্রাম বন্ধ কোরে রাজত্ব কোরতে আরম্ভ কোরলো অর্থাৎ তাদের নেতার, রসুলাল্লাহর (দ:) প্রকৃত সুন্নাহ ত্যাগ কোরে এই দীনের চুলচেরা বিশ্লেষণ কোরে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মসলা-মাসায়েল উদ্ভাবন কোরে জাতিকে বহু ভাগে ভাগ কোরে ফেলল, জাতির আকীদা নষ্ট হোয়ে গুরুত্ব উলটে-পালটে গেলো, তখন জন্ম হোল এই পুরোহিত শ্রেণীর। অন্যান্য দীনের পুরোহিত শ্রেণীর চেয়ে জুডিয় ধর্মে অর্থাৎ ইহুদি ধর্মের পুরোহিত শ্রেণীর সঙ্গে বর্তমান 'এসলাম' ধর্মের পুরোহিত শ্রেণীর মিল বেশি। ধর্মের চুলচেরা বিশ্লেষণে ও ফতোয়ায় (বিধানে) হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধরাও কম যান না, একই রকমের, কিন্তু জুডিয় অর্থাৎ ইহুদিদের পুরোহিতদের সাথে শুধু কাজে নয় একেবারে উপাধিতে পর্যন্ত মিলে গেছে। 'এসলামের' এই শ্রেণীর নাম মাওলানা

আর ইহুদিদের রাব্বাই-একদম একার্থবোধক। মাওলা অর্থ প্রভু আর মাওলানা অর্থ আমাদের প্রভু। রব শব্দের অর্থও প্রভু, আর রাব্বাই শব্দের অর্থ আমাদের প্রভু। ইহুদি ধর্মের

মাওলা অর্থ প্রভু আর মাওলানা অর্থ আমাদের প্রভু। রব শব্দের অর্থও প্রভু, আর রাব্বাই শব্দের অর্থ আমাদের প্রভু। ইহুদি ধর্মের রাব্বাইরা যেমন তাদের 'ধর্মীয়' জ্ঞানের জন্য প্রচণ্ড অহঙ্কারী, তেমনি বিকৃত এসলামের এই ধর্মব্যবসায়ী মাওলানারাও তাই। দুনিয়াজোড়া এই জাতির লাঞ্ছনা, অপমান, গোলামি সম্পর্কে এই ধর্মব্যবসায়ী শ্রেণীর যদি ন্যূনতম অপমানবোধ থাকতো তবে তারা কেবল লেবাস ধারণ কোরে অহঙ্কারে স্ফীত হোত না। বরং সকল মতবিরোধ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হোয়ে রসুলের আসহাবদের মতো জীবনযাপন কোরত এবং আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম কোরত।

রাব্বাইরা যেমন তাদের 'ধর্মীয়' জ্ঞানের জন্য প্রচণ্ড অহঙ্কারী, তেমনি বিকৃত এসলামের এই মাওলানারাও তাই। ঐ 'ধর্মীয়' জ্ঞানের আত্মম্ভরিতায় রাব্বাইরা যেমন সত্য নবী ঈসাকে (আ:) অস্বীকার কোরেছিলেন, আজ যদি কেউ প্রকৃত দীনকে উপস্থাপিত করেন তবে এই মাওলানারা

এবং দীনের অন্যান্য ধারক-বাহকরা তেমনি তাকে অস্বীকার কোরবেন, তাকে প্রচণ্ড ভাবে বাধা দেবেন।

আল্লাহর রসুলেরও প্রধান বিরোধি ছিলো এব্রাহীম (আ:) এর আনীত দীনে হানিফের বিকৃতরূপের ধ্বজাধারী মূর্তিপূজক পুরোহিত আলেম শ্রেণী। রসুলাল্লাহর বিরোধিদের নেতৃত্বদানকারী আবু জাহেলের খেতাব ছিল আবুল হাকাম, যার অর্থ জ্ঞানীদের পিতা, ঠিক আজ যেমন আলেমরা নিজেদের নামের আগে লিখে থাকেন আল্লামা (মহাজ্ঞানী, Very high scholar)। যে পবিত্র মানুষগুলি স্বয়ং আল্লাহর রসুলের কাছ থেকে এসলামের আকীদা শিক্ষা কোরেছেন তাদের থেকে এসলাম সম্পর্কে বেশি জানা কি সম্ভব? নিশ্চয় নয়। কিন্তু তাদের কেউ নামের আগে আল্লামা, মাওলানা জাতীয় কোনো খেতাব ব্যবহার কোরেছেন বোলে ইতিহাসে পাওয়া যায় না। খ্রিস্টানদের বেলাতেও আল্লাহ একই কথা বোলেছেন যে, 'তারা তাদের ধর্মগুরু ও পাদ্রীদেরকে তাদের রব (প্রভু) বানিয়ে নিয়েছে" (সুরা তওবা ৩১)। সুতরাং বোঝা গেল সর্বযুগে সব ধর্মেই পুরোহিতদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য হোচ্ছে তারা আল্লাহর বিধানকে গোপন কোরে নিজেদের মুখের কথাকেই ধর্ম হিসাবে চালাতে চায় এবং নিজেদের কথাকে আল্লাহর কথা হিসাবে প্রচার কোরে নিজেরাই মানুষের রব বা মওলা সেজে বসে। সুতরাং প্রভুর আসনে বোসে অর্থের বিনিময়ে পরকালীন মুক্তির টিকিট বিক্রি করার সকল দরজা 'আসল প্রভু' মহাপ্রভু আল্লাহ একেবারেই বন্ধ কোরে দিয়েছেন। বর্তমানের বিকৃত এসলামের আলেম ওলামা ওয়াজকারীরাও এর ব্যতিক্রম নন। তারা এমন মোহনীয় সুরে ধর্মের বয়ান কোরে থাকেন যে তাদের এসব কথাকে এসলাম বোলেই মানুষ বিশ্বাস কোরতে বাধ্য হয়। তাদের এই বৈশিষ্ট্যের কথা আল্লাহ পূর্বেই কোর'আনে বোলে দিয়েছেন এবং আমাদেরকে সাবধান কোরে দিয়েছেন। তিনি বলেন, "তাদের মধ্যে একদল রয়েছে, যারা বিকৃত উচ্চারণে মুখ বাঁকিয়ে কিতাব পাঠ করে, যাতে তোমরা মনে কর যে, তাঁর কিতাব থেকেই পাঠ কোরছে। অথচ তারা যা আবৃত্তি করছে তা আদৌ কিতাব নয় এবং তারা বলে যে, এসব কথা আল্লাহর তরফ থেকে আগত। অথচ এসব আল্লাহর তরফ থেকে প্রেরিত নয়। তারা বলে যে, এটি আল্লাহর কথা অথচ এসব আল্লাহর কথা নয়। আর তারা জেনে শুনে আল্লাহরই প্রতি মিথ্যারোপ করে (সুরা এমরান ৭৮)। এমন পরিষ্কারভাবে আল্লাহ এই ধর্মজীবী আলেমদের সব আবরণ উন্মোচিত কোরে দেওয়ার পর আর কি বলার বাকি থাকে?

আল্লাহ পূর্ববর্তী দু'টি ধর্ম ইয়াহুদি ও ধর্মজীবী খ্রিস্টান আলেম, বৈরাগ্যবাদী পীরদের উদাহরণ টেনে এনে এই উম্মাহকেও তাদের ন্যায় ধর্মজীবীদের ব্যাপারে সতর্ক কোরে দিচ্ছেন। কারণ **প্রথমতঃ** তারা আল্লাহর বিধানকে গোপন করে। **দ্বিতীয়তঃ** তারা আল্লাহর দীন বিক্রি করে, **তৃতীয়তঃ** তারা দীনের অতি বিশ্লেষণ কোরে এর মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করে এবং জাতির ঐক্য ধ্বংস করে, **চতুর্থতঃ** তারা সমাজের অন্যায় অবিচার অনাচার ও অবৈধ বহু কাজের প্রসার দেখলেও মানুষকে সেটা থেকে ফেরানোর চেষ্টা (অর্থাৎ জেহাদ) করে না। আল্লাহ বলেন: পীর ও আলেমগণ কেন তাদের পাপ কথা ও হারাম ভক্ষণে নিষেধ করে না? **বরং এরাও যা করে তাও অতি নিকৃষ্ট।** [সুরা মায়েদা-৬৩]

এভাবে আল্লাহর অমূল্য আসমানী কেতাবকে যারা আয়ত্ব কোরে দীনকে নিজেদের কুক্ষিগত কোরে রেখেছেন তাদেরকে আল্লাহ তুলনা কোরেছেন কেতাব বহনকারী গর্দভের সাথে। আল্লাহ বলেন: যাদেরকে তওরাতের দায়িত্বভার অর্পণ করা হোয়েছিল, তারা তা বহন করে নাই। **তাদের দৃষ্টান্ত পুস্তক বহনকারী গর্দভ।** (সুরা জুম'আ: ৫) ।

অনেক আলেম আল্লাহর দ্ব্যর্থহীন এসব আয়াতের থেকে আত্মরক্ষার জন্য খোঁড়া অজুহাত দাঁড় করানোর চেষ্টা কোরে বলেন, 'এই আয়াতগুলো শুধুমাত্র ইহুদি-খ্রিস্টান আলেমদের, পণ্ডিত সুফিদের সম্পর্কে, ওগুলো আমাদের জন্য নয়।' কিন্তু প্রকৃত সত্য হোল, কোর'আনে আল্লাহ পূর্ববর্তী ধর্মগুলির বিভিন্ন প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন এই উম্মাহর সামনে উদাহরণ হিসাবে পেশ করার জন্য যাতে এই উম্মাহ অন্তত পূর্ববর্তীদের মতো ধর্মব্যবসা কোরে দীনকে একটি শ্রেণীর কুক্ষিগত না কোরে ফেলে। কারণ এই ধর্ম ইহুদিদের মতো কোনো গোত্রীয় ধর্ম নয়, কোনো আঞ্চলিক ধর্ম নয়; এটা বিশ্বজনীন, সমস্ত মানবজাতির জন্য আল্লাহর প্রেরিত শেষ দীন। তাই কোনোভাবেই একে বিকৃত করা হোলে, দুর্বোধ্য কোরে ফেলা হোলে তা সঙ্কুচিত হোয়ে পড়বে এবং পুরো মানবজাতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যেমন বর্তমানে হোয়েছে।

পক্ষান্তরে, উল্লেখিত বহু আয়াতে বজ্রকঠিন হুঁশিয়ারি থাকা সত্ত্বেও এই জনগোষ্ঠীর দুনিয়ালোভী আলেমগণ নামাজ পড়িয়ে, মিলাদ পড়িয়ে, জানাযা পড়িয়ে, ওয়াজ মাহফিল কোরে, ফতোয়া দিয়ে, বিয়ে পড়িয়ে, তালাক করিয়ে, মসজিদ, মাদ্রাসা, মাজারে, পীরের আস্তানায় টাকা রোজগার কোরছেন। এক কথায় টাকা ছাড়া ধর্মের চাকা একেবারেই স্তব্ধ! মুফতি ও আল্লামাগণ সামান্য

মোসলেম বিশ্বে বহু বছর ধোরেই চোলছে এভাবে ওয়াজ মাহফিল। কিন্তু এইসব ওয়াজ শুনে কী পরিবর্তন হোল এই জাতির। তারা কি মো'মেন হোয়েছে? ঐক্যবদ্ধ হোয়ে ইহুদি-খ্রিস্টান 'সভ্যতা'র তৈরি কুফরী জীবনব্যবস্থাগুলি প্রত্যাখ্যান কোরেছে? তারা কি রসুলাল্লাহর রেখে যাওয়া জীবনব্যবস্থায় ফিরে গেছে? যায় নি। বরং জাতি পূর্বের চাইতেও দিন দিন আরও বেশি গোলামী, হানাহানি, রক্তারক্তিতে লিপ্ত হোয়েছে। এর কারণ, এত ওয়াজ কোরে যে এসলামটি শেখানো হোচ্ছে সেটা আল্লাহ রসুলের এসলামই নয়, সেটা একটি বিকৃত বিপরীতমুখী মৃত এসলাম। কাজেই মরা এসলামের মরা ওয়াজ শুনে জাতি কোনোদিন জাগ্রত হবে না। তবুও লক্ষ লক্ষ লোক জড়ো কোরে এসব নিষ্ফল ওয়াজ চালিয়ে যাওয়া হোচ্ছে, কারণ এইসব ওয়াজ মাহফিল বিশিষ্ট ওয়াজশিল্পীদের কাড়ি কাড়ি টাকা উপার্জনের উৎস।

রোজগারের (সামানান ক্বালীলা) আশায় ইহুদি খ্রিস্টানদের আদর্শের রাজনীতিকদের অবৈধ কর্মকাণ্ড ও অনৈসলামিক কর্মকাণ্ডের পক্ষে ফতোয়া দিয়ে হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করেন। তারা উল্লিখিত আয়াতগুলি জানেন এবং বুঝেন এবং জেনে শুনেই তা গোপন রেখে বিনিময় গ্রহণ করেন! সত্যিকার অর্থে এই পুরোহিত শ্রেণীটি নিজেরাই এই দীনের মধ্যে একটি মূর্তিমান বে'দাত বা সংযোজন। অন্যান্য দীনের কথা বাদ দিলাম, অন্তত আখেরী নবীর উপর অবতীর্ণ এসলামের এই শেষ সংস্করণে ধর্মজীবী পুরোহিত শ্রেণীর প্রাদুর্ভাব ঘটার কোনো সুযোগ বা সদর দরজা আল্লাহ রাখেন নি। এসলামে কোনো কালেই এই পুরোহিত বা যাজক শ্রেণীর কোনো

স্থান ছিল না এবং নেই, তারপরেও এসলামের পূর্ববর্তী সংস্করণগুলিতেও ব্যতিক্রমহীনভাবে পেছনের দরজা দিয়েই এদের অনুপ্রবেশ ঘোটেছিল। পরবর্তীতে তারা এই উম্মাহর মধ্যে এমনভাবে আসন গেঁড়ে বসে যেন ধর্মে এদের স্থান কেবল অবধারিতই নয়, এরাই ধর্মের ধ্বজাধারী ও কর্তৃপক্ষ (Authority)। নবীদের বিদায়ের কিছুদিন পরেই এই পুরোহিত শ্রেণীর আবির্ভাব হোয়েছে এবং তারা নিজেদেরকে নবীদের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার, ওরাসাতুল আম্বিয়া (Spiritual Successor) বোলে ঘোষণা দিয়ে দীনকে নিজেদের কুক্ষিগত কোরে নিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, তাদের (নবী-রসুল ও প্রকৃত) পেছনে এসেছে কিছু অপদার্থ যারা উত্তরাধিকারী হোয়েছে কেতাবের; তারা নিকৃষ্ট পার্থিব উপকরণ আহরণ কোরেছে এবং বোলেছে, 'আমাদের ক্ষমা কোরে দেওয়া হবে। বস্তুতঃ এর অনুরূপ সামগ্রী (পার্থিব বিনিময়) তাদের নিকট আবারও যদি উপস্থিত করা হয়, তবে তাও তারা গ্রহণ কোরবে। কেতাবের অঙ্গীকার কি তাদের নিকট থেকে নেওয়া হয় নি যে, তারা আল্লাহ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বোলবে না? এবং তারা তো কেতাবে যা আছে তা পড়েও (সুরা আরাফ ১৬৯)। সুতরাং তারা জেনে শুনেই হারাম খাচ্ছেন এবং এটা যে হারাম তা মানুষের কাছে গোপন রাখছেন। অন্যদিকে তারাই আবার মানুষকে রসুলের বরাত দিয়ে বলেন, 'এবাদত ও দোয়া কবুল হওয়ার পূর্ব শর্ত হালাল উপার্জন।' এমন আরও বহু ওয়াজ তারা মানুষের উদ্দেশ্যে করেন কিন্তু নিজেরা সেগুলির পরোয়া করেন না। আল্লাহ বার বার বোলেছেন, 'তোমরা নিজেরা যা করো না তা অপরকে কোরতে বল কেন? নিজেরা যা করো না, তা অপরকে কোরতে বলা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত ক্রোধ উদ্রেককারী' (সুরা সফ ২-৩)। আল্লাহর এ ক্রোধকে তারা পুরোপুরি উপেক্ষা করেন।

প্রকৃত যারা আলেম তাদের সম্পর্কে কিছু কথা

আলেম শব্দের অর্থ জ্ঞানী। প্রকৃত আলেম হোচ্ছেন মহান আল্লাহ। তাঁর একটি নামই হোচ্ছে 'আলেম'। আল্লাহর সৃষ্টি এবং আল্লাহর দীন সম্পর্কে যারা জ্ঞান অর্জন কোরবেন তারাও এক প্রকার আলেম বা জ্ঞানী। যদিও বর্তমানে কেবল দীন সম্পর্কে যারা জ্ঞানী তাদেরকেই আলেম বলা হয়, এই ধারণা এক প্রকার অন্ধত্ব। যাই হোক, যারা সকল জ্ঞানের স্রষ্টা, উৎস আল্লাহ থেকে জ্ঞান বা এলেম অর্জন কোরবেন তাদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য থাকবে। এখানে আমরা প্রকৃত আলেম বোলতে

বুঝবো আল্লাহর রসুলের আসহাবগণকে যাদেরকে স্বয়ং রসুল নিজে এসলাম শিখিয়ে গেছেন, এসলামের জ্ঞান তাদের চেয়ে বেশি আর কারও থাকা সম্ভব নয়। রসুলের আসহাবগণের পরবর্তীতে যারা আলেম হোতে চান তাদের চরিত্র ও কাজ আসহাবদের মতই হোতে হবে। তা না হোলে যত বড় টাইটেলধারীই হোন না কেন, যত বড় আলখেল্লাধারীই হোন না কেন তারা প্রকৃত আলেম নন।

১। প্রকৃত যারা আলেম তারা কখনও অহঙ্কারী হবেন না, কারণ অহঙ্কার কেবলমাত্র আল্লাহরই সাজে। প্রকৃত আলেমরা তাদের সঞ্চিত জ্ঞানকে খুবই সামান্য মনে কোরবেন এবং সর্বদা অতৃপ্ত থাকবেন। তারা নিজেদেরকে কখনওই আলেম বোলে মনে কোরবেন না, দাবি বা প্রচার করা তো দূরের কথা।

২। তারা আল্লাহর দীন বিক্রি কোরে জীবিকা নির্বাহ কোরবেন না। এই জ্ঞান অন্যকে দেওয়া তারা নিজেদের ঈমানী দায়িত্ব বোলে মনে কোরবেন। আলী (রা:) কে রসুলাল্লাহ 'জ্ঞান-নগরীর দ্বার' বোলে আখ্যায়িত কোরেছেন। তিনি কি আজকের আলেমদের মতো তাঁর জ্ঞান বিক্রি কোরে জীবিকা নির্বাহ কোরতেন? জীবিকা অর্জনের জন্য তিনি কুলির কাজ কোরতেন এবং যাঁতার চাক্কি পিষে যবের আটা প্রস্তুত কোরতে গিয়ে তাঁর স্ত্রী জান্নাতের রানী মা ফাতেমার (রা:) পবিত্র হাতে কড়া পড়ে গিয়েছিল। এই জ্ঞানের দুয়ার আলীকেই (রা:) আমরা দেখি সিংহের বিক্রমে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কোরতে। তার অনন্য সাহসিকতা ও বীরত্বের জন্য রসুলাল্লাহ তাঁকে আরেকটি উপাধি দিয়েছিলেন- সেটা হোল আসাদুল্লাহ বা আল্লাহর সিংহ। সুতরাং যিনি দীনের যত বড় আলেম হবেন তিনি তত বড় যোদ্ধা হবেন।

৩। দীনের জ্ঞান যিনি যত বেশি অর্জন কোরবেন, তিনি তত বড় দানশীল হবেন। যেমন আম্মা খাদীজা (রা:), আবু বকর (রা:)। এসলাম গ্রহণের পূর্বে তারা প্রত্যেকেই ঐ সমাজের প্রতিষ্ঠিত ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন। আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় কোরতে কোরতে তারা এমন দরিদ্র হোয়ে পড়েছিলেন যে, আবু বকরের (রা:) পরিবারের তিনবেলা ঠিকমত খাদ্যও জুটতো না। আর আম্মা খাদীজার (রা:)

সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা বোলে থাকেন যে, শিয়াবে আবু তালেবে তিন বছর নির্মম অনাহারের ফলে তিনি মারাত্মক অপুষ্টিতে আক্রান্ত হন এবং এটাই তাঁর মৃত্যুর কারণ।

৪। প্রকৃত জ্ঞানীরা হবেন লোহার মতো ঐক্যবদ্ধ। কোনো দুনিয়ার সম্পদের লোভ লালসা (সামানান কালীলা) তাদের ঐক্যে ভাঙ্গন ধরাতে পারবে না। কারণ তারা জানেন ঐক্য নষ্ট করা কুফর। তারা একে অপরের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা কোরবেন না, কারও পিছনে গীবত কোরবেন না, কারণ তারা জানেন অপর মো'মেনের আড়ালে তার ব্যাপারে অপছন্দনীয় কিছু বলা মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সমতুল্য। কারও কোনো ভুল থাকলে তারা সেটা তাকে ধোরিয়ে দিবে, আড়ালে নিন্দা কোরবে না। পক্ষান্তরে আজকের সমাজে আলেমদের ব্যাপারে একটি কথা প্রচলিত আছে যে, দু'জন আলেম কখনও এক বিছানায় শুতে পারেন না। দুনিয়ার সম্পদের দেনা-পাওনা, রাজনৈতিক স্বার্থ ইত্যাদি বহুবিধ কারণ তাদের মধ্যে অনতিক্রম্য ব্যবধান তৈরি কোরে রেখেছে, তারা একে অপরকে অনেকাংশেই প্রতিপক্ষ জ্ঞান করেন।

৫। প্রকৃত আলেমরা হবেন সুশৃঙ্খল। আল্লাহর রসুলের হুকুমের শিকলে তারা নিজেদেরকে আবদ্ধ কোরে রাখবেন। তাদের জাতি হবে একটি, তাদের এমাম হবেন একজন, দীন (জীবনব্যবস্থা) হবে একটি। তাদের সকলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যও হবে অভিন্ন; সেটা হোচ্ছে- সংগ্রামের মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবীতে আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠা করা। তারা কোনোভাবেই এমামের, আমীরের হুকুম অমান্য কোরবে না, হুকুম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা সেটাকে বাস্তবায়ন করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বেন। তাদের স্ত্রী, পুত্র, সহায় সম্পদ বাড়িঘর, ব্যবসা-বাণিজ্য, খেত-খামার ইত্যাদি বিসর্জন দিয়ে আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠা করার জন্য দুনিয়ার বুকে বেরিয়ে পড়বেন, পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখবেন না। কিভাবে জীবনটা আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ করা যায়, শহীদ হওয়া যায় এটাই হবে তাদের জীবনের একমাত্র বাসনা (Utter Desire for death). যেমন রসুলাল্লাহর কাছ থেকে এসলামের জ্ঞান অর্জন কোরেছিলেন খালেদ (রা:)। যিনি জাহেলিয়াতের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে আল্লাহর রাস্তায় এমনভাবে বহির্গত হোয়েছিলেন যেন এক প্রচণ্ড ঝড় (Cyclone) । এসলামের শত্রুদের উপর আঘাত হানার জন্য তিনি যে তলোয়ার কোষমুক্ত কোরেছিলেন তা কখনও

কোষবদ্ধ করেন নি। লাখ লাখ সুশিক্ষিত সৈন্যের রোমান পারস্য বাহিনী কখনও তাঁকে এতটুকুও বিচলিত কোরতে পারে নি।

৬। শেরক, কুফর, ফেসক ইত্যাদি থেকে এমনভাবে হেজরত কোরবে অর্থাৎ এগুলিকে এমন ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান কোরবে যে প্রয়োজনে তার জীবন যাবে [যেমন: সুমাইয়া (রা:), ইয়াসের (রা:), বেলাল (রা:)], না খেয়ে থাকবে, অবর্ণনীয় দারিদ্র্যে পতিত হবে, তাদের উপরে নির্যাতনের স্টীম রোলার চোলবে তবুও শেরক কুফরের সঙ্গে আপোস কোরবে না।

মহানবীর যে সাহাবীরা রসুলের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ কোরে এসলামের আলেম হোয়েছিলেন তাঁদের চরিত্র এইসব বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ ও মহীয়ান ছিল। অথচ দুঃখের বিষয় হোল আজ আলেম বোলতে আমাদের সামনে সেই আসহাবদের জীবন ও চরিত্র ভেসে ওঠে না, ভেসে ওঠে রং বেরঙের মাদ্রাসা শিক্ষিত কিছু ধর্মব্যবসায়ীর শশ্রুমণ্ডিত মুখমণ্ডল, যাদেরকে আল্লাহর রসুল বোলেছেন, "আসমানের নিচে সর্ব নিকৃষ্ট প্রাণী।"

যুক্তির নিরীখে ধর্মব্যবসা

এখন দেখা যাক তাদের এই পেশা যুক্তির বিচারে কতটা টেকসই। ধর্মজীবীদের একটি বড় অংশের পেশা মসজিদের এমামতি করা। এমাম শব্দের অর্থ নেতা হোলেও এই কথিত এমামগণের নেতৃত্বের পরিধি নামাজের সময়ের ৮/১০ মিনিটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে তারা মসজিদ কমিটির বেতনভুক্ত কর্মচারী মাত্র। আর তারা যে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়িয়ে টাকা নেন তার যৌক্তিকতা কী? নামাজ পড়াতে ও পড়তে যা জানা আবশ্যক তা এমাম সাহেব যেমন জানেন, মুসল্লীগণও তা-ই জানেন; এমামের যতটুকু সময় ব্যয় হয়, মুসল্লীদেরও ততটুকু সময়ই ব্যয় হয়। মুসল্লীদের নামাজ পড়া ফরদ, এমামেরও তাই। পার্থক্য হোল মুসল্লীদের নামাজের চাওয়া-পাওয়া আল্লাহর কাছে, পক্ষান্তরে এমামের নামাজের চাওয়া-পাওয়া আল্লাহর কাছে নয়। তার বেতন বন্ধ হোলে এমামতিও বন্ধ!

এখানেই শেষ নয়, আল্লাহর পরিষ্কার ঘোষণা অনুযায়ী, যারা ধর্মের বিনিময় নেন, তাদের পেছনে নামাজও হয় না। আল্লাহ মো'মেনদেরকে তাদের অনুসরণ কোরতে নিষেধ কোরে দিয়েছেন যাতে কোনোভাবেই এই দীনে কোনো পুরোহিত শ্রেণীর আবির্ভাব হোতে না পারে। আল্লাহ বলেন, 'অনুসরণ ও আনুগত্য কর তাদের যারা তোমাদের নিকট থেকে কোনো মজুরি গ্রহণ করে না এবং হেদায়াত প্রাপ্ত। [সুরা ইয়াসিন-২১] সুতরাং যারা তাদের পেছনে নামাজে দাঁড়াবেন তারা আল্লাহর হুকুম অমান্য কোরছেন।

রসুল (দঃ) ও তাঁর সাহাবাগণ আল্লাহর দীন কায়েমের সংগ্রামে নিজেদের শেষ সম্বলটুকু ব্যয় কোরে নিঃশেষ হোয়েছেন, এমন কি নিজেদের জীবনও উৎসর্গ কোরে গেছেন। পক্ষান্তরে আজকের আলেম নামধারীগণ ও পীররা সেই এসলাম বিক্রি কোরে অর্থ সম্পদের পাহাড় গড়ছেন, এমনকি অনেকের শান-শওকত, রাজকীয় হালচাল মোগল বাদশাহদেরও হার মানায়। তাদের অনুসারী কাউকে যখন কোর'আন থেকে দেখিয়ে দেওয়া হয়, যে এই ধর্মব্যবসা অবৈধ তখন তারা প্রশ্ন করেন, তাহোলে তারা খাবেন কী? প্রশ্নটি নিতান্তই বুদ্ধিহীন এবং আল্লাহর হুকুমের উপর অনধিকার চর্চা; যেহেতু হারাম কোরেছেন আল্লাহ, তাই তারা কী খাবেন এ প্রশ্নটিও আল্লাহকেই করা দরকার। তারা কী খাবেন আর কী খাবেন না তা কোর'আনে বর্ণিত আছে- আল্লাহ যা কিছু হালাল কোরেছেন তাই খাবেন। বর্তমানে তারা কী খাচ্ছেন, এর পরিণতি কী - তা'ও কোর'আনে সহজ-সরল ভাবে বলা হোয়েছে যে তারা আগুন খাচ্ছেন (বাকারা ১৭৪)। আপদে-বিপদে কোনো উপায়ান্তর না থাকলে (শুধু প্রাণ বাঁচানোর জন্য যতটুকু দরকার) হারাম ঘোষিত মদ, শুকর, মৃত পশু ইত্যাদি সাময়িক ভাবে খাওয়ার সুযোগ আল্লাহ দিয়েছেন (বাকারা ১৭৩) কিন্তু ধর্ম-কর্মের বিনিময় গ্রহণের সুযোগ তিনি কোনো কালেই দেন নি; বরং যারা তা কোরবে তাদের বিষয়ে তিনি বোলেছেন, তাদেরকে তিনি পবিত্র কোরবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে তিনি মর্মন্তুদ শাস্তি দিবেন। এখানে অনন্যোপায় হোয়ে কোরলে ক্ষমা করার কোনো প্রতিশ্রুতি মহান আল্লাহ দেন নি বরং সকল মো'মেনদেরকেই তিনি সালাহ শেষে মাঠে ঘাটে ছড়িয়ে পড়ে হালাল রোজগারের সন্ধানের নির্দেশ দিয়েছেন, মুসল্লীগণ যা কোরে থাকেন। [কোর'আন: ৬২: জুম'আ-১০] তারা কি খাবেন এ আয়াতে তারই দিক নির্দেশনা রোয়েছে। এই দীনের বিনিময় সংক্রান্ত যে আয়াতগুলি উল্লেখ কোরলাম, এমন আরও বহু আছে, সেগুলিও তারাও গোপন করেন। এই সত্যগোপন ও দীনের বিনিময় গ্রহণ

প্রসঙ্গে আল্লাহর কথা হোল, ‘তারা আগুন ছাড়া কিছুই খায় না’, অর্থাৎ তারা যা-ই খায় তাই আগুন। কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের দিকে দৃষ্টিপাত কোরবেন না, তাদের সঙ্গে কথাও বোলবেন না, পবিত্রও কোরবেন না। পরকালে তাদের কোনো অংশ নেই। তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রোয়েছে। [৩: সুরা এমরান: ৭৭] এমন কঠোর সাবধানবাণী আল্লাহ আর কোনো অপরাধের ক্ষেত্রে উচ্চারণ কোরেছেন কি?

আল্লাহর সব নবী-রসুলগণই ধর্মব্যবসায়ের বিরুদ্ধে কঠিন অবস্থান নিয়েছেন এবং তাদের প্রবল বিরোধিতারও সম্মুখীন হোয়েছেন। এর অন্যতম কারণ নবী রসুলরা তাদের এই ধর্মব্যবসাকে নিষিদ্ধ বোলে ঘোষণা কোরেছেন, যার ফলে তারা রুজি রোজগার বন্ধের আশঙ্কায় শঙ্কিত হোয়ে নবীরসুলদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন। নবী-রসুলগণ প্রায় সকলেই তাদের জাতির উদ্দেশ্যে একটি সাধারণ কথা বোলেছেন যে, আমি তোমাদের কাছে কোনো বিনিময় চাই না, আমার বিনিময় রোয়েছে আল্লাহর কাছে। এটা বলার উদ্দেশ্য হোচ্ছে, তিনি যা তাদের সামনে উপস্থাপন কোরছেন তা নির্ভেজাল সত্য, হক্, এতে মিথ্যার কোনো মিশ্রণ নেই। কারণ প্রতিটি মিথ্যাই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত এবং তাতে মানুষের কোনো না কোনো পার্থিব স্বার্থ থাকে। নবী-রসুলগণ যে কোনো পার্থিব স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে কাজ কোরছেন না সেটা বোঝানোর জন্যই উপরোক্ত কথাটি বোলতেন। বিনিময় গ্রহণ না করা তাঁদের সত্যতার একটি বিরাট প্রমাণ।

ধর্মব্যবসায়ের বিরুদ্ধে নবী-রসুলদের কঠিন ভূমিকার কিছু বিবরণ পবিত্র কোর’আনে বর্ণিত হোয়েছে। যেমন:

১। নূহের (আ:) এর ঘোষণা: হে আমার সম্প্রদায়! এর পরিবর্তে আমি তোমাদের নিকট ধন সম্পদ চাই না। আমার পারিশ্রমিক আল্লাহর নিকট। [সুরা হুদ-২৯, সুরা শুআরা - ১০৯, সুরা ইউনুস - ৭২]

২। হুদের (আ:) ঘোষণা: হে আমার সম্প্রদায়! আমি এর পরিবর্তে তোমাদের নিকট কোনো মজুরি চাই না। আমার পারিশ্রমিক তাঁরই নিকট যিনি আমাকে সৃষ্টি কোরেছেন। তোমরা কি তবুও বুঝতে চেষ্টা কোরবে না? [হুদ-৫১, সুরা শুআরা - ১২৭]

৩। সালেহ (আ:) এর ঘোষণা: আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোনো পারিশ্রমিক চাই না। আমার মজুরি জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট রোয়েছে। [শুয়ারা-১৪৫]

৪। লুতের (আ:) ঘোষণা: এর জন্য আমি কোনো মজুরি চাইনা। আমার মজুরি জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে। [শুয়ারা-১৬৪]

৫। শোয়েবের (আ:) ঘোষণা: আমি এর জন্য তোমাদের নিকট কোনো মূল্য চাই না। আমার মজুরি জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে। [শুয়ারা-১৮০]

৬। মোহাম্মদ (দ:) এর প্রতি আল্লাহর হুকুম:

ক. এবং তুমি তাদের নিকট কোনো মজুরি দাবি কোর না। এই বাণী তো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ মাত্র। [ইউসুফ - ১০৪]

খ. বল! আমি এর জন্য তোমাদের নিকট কোনো পারিশ্রমিক চাই না। এবং যারা মিথ্যা দাবি করে আমি তাদের দলভুক্ত নই। [সাদ - ৮৬]

গ. তাদেরকেই (নবীদেরকেই) আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত কোরেছেন। সুতরাং তুমি তাদের পথ অনুসরণ কর; বল! এর জন্য আমি তোমাদের কাছে কোনো মজুরি চাই না। [আনআম - ৯০]

ঘ. বল! আমি এর বিনিময়ে তোমাদের কাছ থেকে প্রেম-ভালোবাসা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার ব্যতীত অন্য কোনো মজুরি চাই না। [শুরা - ২৩]

ঙ. আমি তাদেরকে দিয়েছি উপদেশ, কিন্তু তারা উপদেশে থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। অথবা তুমি কি তাদের নিকট কোনো প্রতিদান চাও? তোমার প্রতিপালকের প্রতিদানই তো শ্রেষ্ঠ এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ রেযেকদাতা। [২৩: সুরা মো'মেনুন: ৭১-৭২]

চ. তবে কি তুমি উহাদের নিকট পারিশ্রমিক চাচ্ছো যা ওরা একটি দুর্বহ বোঝা মনে করে? [৫২: সুরা তুর: ৪০]

সুতরাং কোর'আনের ভাষ্যমতে দীনের, ধর্মের কোনো কাজ কোরে নবী ও রসুলরা যেমন পারিশ্রমিক গ্রহণ কোরতেন না, তেমনি তাঁদের উম্মাহর জন্যও পারিশ্রমিক গ্রহণ করার বৈধ নয়।

ধর্মব্যবসার বিরুদ্ধে রসুলাল্লাহর কয়েকটি বাণী

আল্লাহর রসুলও তাঁর জাতির মধ্যে যেন ধর্মব্যবসায়ী পুরোহিত শ্রেণী গজিয়ে উঠতে না পারে সেজন্য তিনি তাঁর আসহাবদেরকে বার বার সতর্ক কোরে গেছেন। উবায়দা বিন সামেত (রা:) ছিলেন আসহাবে সুফফার অন্তর্ভুক্ত এক সাহাবী। তাঁকে রসুলাল্লাহ কোনো এক গোত্রের লোকদেরকে কোর'আন শিক্ষা দিতে প্রেরণ কোরেছিলেন। সেই গোত্রের একজন ব্যক্তি উবায়দাকে (রা:) আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করার উদ্দেশ্যে একটি ধনুক ও তীর উপহার দিয়েছিলেন। উবায়দা (রা:) রসুলাল্লাহর দরবারে ফিরে এসে যখন সেই তীর ও ধনুক তাঁকে দেখালেন তখন রসুলাল্লাহ বোললেন, **"যদি তুমি আগুনের তীর গলায় জড়িত হওয়া পছন্দ করো তাহোলে তুমি এটা গ্রহণ করো" (আবু দাউদ)।**

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সন্দেহ নেই। উবায়দাহ (রা:)-কে কোর'আন শিক্ষা দেওয়ার বিনিময়ে যে উপহারটি দেওয়া হোয়েছিল সেটা কোনো অর্থকড়ি নয়, ব্যক্তি ব্যবহার্য কোনো বস্তুও নয়। **সেটা হোচ্ছে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদে ব্যবহারের জন্য একটি অস্ত্র। অথচ সেই অস্ত্রটি গ্রহণ করাও নিষিদ্ধ হোয়ে গেল, কেবল নিষিদ্ধই না, সেটা আখেরাতে আগুনের তীর হোয়ে গ্রহণকারীর বুকে বিঁধবে এই কারণে যে, তিনি সেটা গ্রহণ কোরেছিলেন কোর'আন শিক্ষা দেওয়ার বিনিময়ে।** এমন ঘটনা আরও আছে। রসুলাল্লাহর এই কথার পর দীনের জ্ঞান শিক্ষা দিয়ে অর্থ উপার্জনের কোনো পথ খোলা রোইল কি? তা সত্ত্বেও বর্তমানের বিকৃত এসলামে পয়সা ছাড়া কিছুই হয় না, মুর্দা দাফনেও পয়সা দিতে হয়। মোল্লাদের শিষ্য অর্থাৎ তালবে-এলেম থেকে শুরু করে পীরে কামেল, গাউস কুতুব, মুফতি, শায়খ, আল্লামাগণ পয়সা ব্যতীত কেউই ধর্ম-কর্ম করেন না। শুধু তাই নয়, তারা যে মানুষকে এসলাম থেকে সরিয়ে রাখতে চায় এবং ধর্মকে পুঁজি কোরে সম্পদের মালিক হোতে চায় সেটাও আল্লাহও জানিয়ে দিয়েছেন সুস্পষ্টভাষায়। তিনি বোলেছেন, **"হে মো'মেনগণ! আলেম ও সুফিদের (আহবার ও রোহবান) মধ্যে বহুসংখ্যক**

তোমাদের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ কোরে চোলছে এবং আল্লাহর পথ থেকে মানবজাতিকে ফিরিয়ে রাখছে (সুরা তওবা ৩৪) ।

কিভাবে ফিরিয়ে রাখছে? উদাহরণস্বরূপ একটি হাদীস উল্লেখ কোরছি। নবী করীম (সা) তাবুকের যুদ্ধের বৎসরে একটি খেজুর বৃক্ষে হেলান দিয়ে লোকদিগকে সম্বোধন কোরে বোললেন- 'আমি কি তোমাদেরকে সর্বোত্তম ব্যক্তি ও নিকৃষ্টতম ব্যক্তির পরিচয় প্রদান কোরব? সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে স্বীয় অশ্ব অথবা উষ্ট্রে আরোহণ কোরে অথবা পদব্রজে গমনাগমন কোরে মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহর পথে কাজ কোরে যায় ও জেহাদ কোরতে থাকে। আর নিকৃষ্টতম ব্যক্তি হোল সেই পাপাসক্ত ব্যক্তি যে কোর'আন মাজীদ তেলাওয়াত করে কিন্তু এর কোনো আদেশ-নিষেধের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না ও তা পালন করে না।' (আবু সাঈদ খুদরী থেকে আহমদ)। এসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার আল্লাহ রেখেছেন যারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধে শহীদ হন তাদের জন্য। অথচ এই আলেম ওলামারা এসলামের যে আমলগুলির সাথে বৃহৎ কোরবানী জড়িত যেমন জেহাদ, কেতাল ইত্যাদি সেই কাজগুলি তারা নিজেরাও করেন না, এগুলি নিয়ে ওয়াজও করেন না, এগুলির প্রসঙ্গ তারা স্বযত্নে এড়িয়ে যান। তারা সুর কোরে কোর'আন তেলাওয়াত করেন বটে, কিন্তু এর আদেশ নিষেধ মানার কোনো প্রয়োজন বোধ করেন না। কারণ তারা তেলাওয়াত করেন আল্লাহর তরফ থেকে প্রতি অক্ষরে অক্ষরে দশ নেকী এবং মানুষের তরফ থেকে চাহিদা মাফিক অর্থ লাভের আশায়। এদের আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী রসুলাল্লাহ ১৪০০ বছর আগেই কোরে গেছেন। তিনি বোলেছেন- 'ষাট বৎসর পরে একদল লোক আবির্ভূত হবে যারা সালাহ্ পরিত্যাগ কোরবে এবং স্বীয় কুপ্রবৃত্তিসমূহ চরিতার্থ করার জন্য ব্যস্ত থাকবে। তারা ধ্বংস ও গোমরাহীতে নিপতিত হবে। **অতঃপর একদল লোকের আর্বিভাব ঘোটবে যারা কোর'আন মজীদ তেলোওয়াত কোরবে (ক্বারী) কিন্তু কোর'আন তাদের কন্ঠদেশ অতিক্রম কোরবে না** (আবু সাঈদ খুদরী থেকে আহমদ)। ইতোপূর্বে আমরা দেখিয়ে এসেছি যে, সত্যিই রসুলাল্লাহর বিদায় গ্রহণের ৬০/৭০ বছর পরে এই জাতির উদ্দেশ্যচ্যুতি ঘটে এবং এমন একদল লোক উম্মাহর মধ্যে সৃষ্টি হয় যারা দীনকে পার্থিব স্বার্থে ব্যবহার কোরতে আরম্ভ করে। কোর'আন তাদের কন্ঠদেশ অতিক্রম করবে না অর্থ কোর'আন তারা পাঠ কোরবে প্রচুর কিন্তু এর আদেশ নিষেধ মর্মার্থ তাদের হৃদয়ে প্রবেশ কোরবে না।

এখানেই শেষ নয়। সারা পৃথিবীর হাজার হাজার মাদ্রাসায় লক্ষ লক্ষ ছাত্র কোর'আন হেফজ অর্থাৎ মুখস্থ কোরে থাকেন। তাদের প্রধান উদ্দেশ্যই থাকে এর বিনিময়ে জীবিকা নির্বাহ করা এবং বাস্তবেও তারা এটাই কোরে থাকেন। রমাদান মাসে তারাবীর সালাহ কায়েম করানোর সময় রীতিমত ইন্টারভিউ নিয়ে একমাসের জন্য আমাদের দেশে এবং অন্যান্য দেশেও কোর'আনের হাফেজদের নিয়োগ দেওয়া হয়। তারা অতি দ্রুত কোর'আন তেলাওয়াত কোরে থাকেন। এদের প্রসঙ্গে রসুলাল্লাহর একাধিক ভবিষ্যদ্বাণী হাদীস গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায়, এখানে একটি উল্লেখ কোরছি। আনাস (রা) বলেন-একদা আমরা একদল লোক একস্থানে সমবেত ছিলাম। আমাদের মধ্যে আরব, অনারব, কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ শ্রেণীর লোকই ছিল। এই অবস্থায় নবী করীম (সা) আমাদের নিকট আগমন কোরে বোললেন, 'তোমরা সৌভাগ্য দ্বারা পরিবেষ্টিত রোয়েছ। তোমরা আল্লাহর কেতাব তেলাওয়াত কোরে থাকো। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রসুল বর্তমান রোয়েছেন। অদূর ভবিষ্যতে মানুষের নিকট এইরূপ এক যামানা আসবে, যখন তীরের ফলক কিংবা দণ্ড যেরূপ সরল ও সোজা করা হয়, লোকেরা তা (কোর'আন তেলাওয়াতকে) ঠিক সেইরূপ সরল ও সোজা কোরবে। **তারা দ্রুত তেলোওয়াত কোরে নিজেদের পারিশ্রমিক আদায় কোরবে এবং যেহেতু তারা পারিশ্রমিক আদায় কোরবে তাই তাদের তাদের বিলম্ব সহ্য হবে না।'** (আনাস এবনে মালিক (রা) থেকে আহমদ)।

মসজিদের এমামগণ আযান দিতে ও মসজিদ পরিষ্কার রাখতে অনাগ্রহ বোধ করেন, তাই মোয়াযেন আছেন। তিনি মসজিদ দেখা-শুনা, পয়-পরিষ্কার রাখেন, আযান দেন; অতঃপর এমাম সাহেব হুজরা থেকে বেরিয়ে এসে ৫/১০ মিনিটের জন্য নামাজ পড়ান! এই মোয়াযেনদের বেলাতেও রসুলের হুকুম রোয়েছে। ওসমান বিন আবুল আস (রা:) বলেন, আমাকে রসুল আমার গোত্রের আমীর নিযুক্ত কোরে বোললেন, "তুমি তাদের নেতা। তুমি তাদের মধ্যে দুর্বলতম ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য রেখো যেন সে তোমার আনুগত্য কোরতে পারে এবং **এমন একজন মোয়াযেন নিযুক্ত কোরো, যে আযানের বিনিময়ে মজুরি গ্রহণ কোরবে না।** (আবু দাউদ, নেসায়ী শরীফ) আযানের বিনিময়ে যদি মজুরি নেওয়া নিষিদ্ধ হয়, নামাজের এমামতির বিনিময় কিভাবে সিদ্ধ হোতে পারে?

হেযবুত তওহীদের প্রতিষ্ঠাতা এমাম জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী আল্লাহর দয়ায় আল্লাহর সত্যদীনের প্রকৃত রূপকে নিজ হৃদয়ে উপলব্ধি কোরেছেন এবং নবীর উম্মত হিসাবে সেটিকে মানবজাতির সামনে প্রকাশ কোরেছেন। তাই হেযবুত তওহীদ প্রতিষ্ঠার পর থেকে তাঁকে এবং তাঁর অনুসারীদেরকেও এই বিকৃত ধর্মের আলেম ওলামার প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হোতে হোয়েছে। এটা বিশ্বনবীর সুন্নাহ। বিশ্বনবী (দ:) বোলে গেছেন যে, এই দীনের ভবিষ্যতে যখন বিকৃত হবে তখন যে ভয় না কোরে দাঁড়িয়ে দীনের প্রকৃত রূপ প্রচার কোরবে তার স্থান (দরজা) নবীদের স্থানের চেয়ে মাত্র এক দরজা নিচু হবে। অন্য হাদীসে বলা আছে তার সওয়াব (পুণ্য) একশ' শহীদের সমান হবে। শোকর আল হামদুলেল্লাহ। তবে আমরা চাই এ জাতির সত্যনিষ্ঠ আলেম ওলামাদের কালঘুম ভাঙুক। তারাও আল্লাহর প্রকৃত তওহীদের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হোন। তাদের প্রতি আমাদের কথা হোচ্ছে:

আজ এই হতভাগ্য জাতিসহ সমস্ত মানবজাতি শেরক ও কুফরে ডুবে আছে, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব বাদ দিয়ে তাগুতের সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়েছে। অথচ আল্লাহ এই উম্মাহকে শ্রেষ্ঠতম উম্মাহ বোলেছেন (সুরা এমরান ১১০)। আপনারা সামান্য কিছু অর্থ লাভের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী হোয়ে ছোট হোয়ে থাকবেন না। এই হতভাগ্য জাতিকে ঐক্যবদ্ধ কোরে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আপনাদেরও আছে। তাগুতের পূজারীরা মনে করে আপনাদেরকে অর্থের বিনিময়ে তাদের পছন্দমত ফতোয়া দেওয়ানো যায়। পরমুখাপেক্ষী যারা হয় তাদের আর মেরুদণ্ড বোলতে কিছু থাকে না। সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তারা বেশিদূর এগুতে পারে না। বড় কোনো কোরবানী করার আত্মিক শক্তি তারা হারিয়ে ফেলে। তাই আপনারা এই জাতির কল্যাণে, মানবতার কল্যাণে ধর্মব্যবসা পরিত্যাগ কোরুন এবং ক্ষুদ্রস্বার্থ ভুলে, মতবিরোধ ত্যাগ কোরে তওহীদের উপরে ঐক্যবদ্ধ হোন। এই কাজ কোরতে গিয়ে আপনাদেরকে হয়তো কিছু অর্থকষ্ট সহ্য কোরতে হোতে পারে, তবু ভয় পাবেন না। আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কাল রেখে হারাম উপার্জন বন্ধ কোরুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাদেরকে উত্তম রেযেকের বন্দোবস্ত কোরে দেবেন এবং আপনাদের দুনিয়া ও আখেরাতকে সুন্দর কোরে দেবেন।

প্রসঙ্গ ৫। তাদের তৈরি ফেতনা তাদের ওপর পতিত হবে

আল্লাহর রসুল এই হাদীসে যে পঞ্চম বিষয়টি বোললেন তা হোল, ওলামাদের সৃষ্ট ফেতনা তাদের উপরই আপতিত হবে। ফেতনা সম্পর্কে আল্লাহ সুরা বাকারার ১৯১ ও ২১৭ নং আয়াতে বলেছেন, "ফেতনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর অন্যায়"। আল্লাহ যখন বোলেছেন ফেতনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর অন্যায় তখন বুঝতে হবে ব্যাপারটা সাধারণ নয়। বর্তমানে ফেতনাকে যে রকম মামুলি ব্যাপার মনে করা হয় আসলে ফেতনা সে রকম নয়। ফেতনা এমনই ভয়াবহ ব্যাপার যে, কখনো কখনো এটি হাজার হাজার হত্যাকাণ্ডের কারণ হোয়ে দাঁড়ায়। কি এই ফেতনা যা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর? ফেতনা একটি আরবি শব্দ যার আভিধানিক অর্থ দাঙ্গা, গোলযোগ, বিপদ, কষ্ট (আরবী-বাংলা অভিধান, এসলামিক ফাউন্ডেশন; দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৩০)। এসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাংলায় অনুদিত কোর'আনের ৪৭ পৃষ্ঠায় এই শব্দটির অনুবাদ করা হয়েছে- প্রলোভন, দাঙ্গা, বিশৃঙ্খলা, গৃহযুদ্ধ, শিরক, কুফর, ধর্মীয় নির্যাতন ইত্যাদি। রসুলের (দ:) ভবিষ্যদ্বাণী আমাদেরকে একটি ভয়ঙ্কর সত্য অবহিত কোরছে তা হোল, ফেতনা ওলামাদের দ্বারা সৃষ্ট হবে; এর অর্থ দাঁড়ায় দাঙ্গা, বিশৃঙ্খলা, গৃহযুদ্ধ, শিরক, কুফর এবং ধর্মের নামে নির্যাতন তাদের থেকেই সৃষ্টি হবে। দুনিয়াময় এই জাতির এই যে জিল্লতি, শাস্তি সবই সৃষ্টি হোয়েছে এদের কারণেই। বিষয়টা নিঃসন্দেহে ভয়ানক। অতএব কিভাবে যাবতীয় ফেতনা এই ওলামাদের দ্বারা সৃষ্টি হোল তা বুঝে নেওয়ার দরকার আছে। ফেতনা শব্দের উপরোক্ত অর্থগুলি মাথায় রেখে ধর্মব্যবসায়ী আলেম মোল্লা শ্রেণীর কার্যক্রম একটু পর্যবেক্ষণ কোরলেই ফেতনা সম্পর্কে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বক্তব্য পরিষ্কার বোঝা যাবে।

মূল প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে একটি কথা বোলে নেওয়া জরুরি। সেটা হোল অনেকে বলতে পারেন এই হাদীসটি উল্লেখ করার উদ্দেশ্য কী? মহানবী (দ:) এর পবিত্র মুখঃনিসৃত এই হাদীসটি উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, আমাদের সঙ্গে আলেমদের বিদ্বেষ আছে। বরং আমাদের উদ্দেশ্য হোচ্ছে: আল্লাহ দীন-উল হক এসলাম নাজেল কোরেছেন মানবজাতির শান্তির জন্য। সেই দীন বিকৃত হোয়ে যাওয়ার ফলে মানবজাতি সেই শান্তি থেকে বঞ্চিত হোচ্ছে। আমরা চাই মানুষ এসলামের মাধ্যমে

সেই শান্তি লাভ কোরুক। এখন এই দীনের যে বিকৃতিগুলি এসেছে সেগুলিকে দূরীভূত করার ক্ষেত্রে প্রধান বাধা হোচ্ছেন এই বিকৃত দীনের আলেম সমাজ। তারা দীনকে নিজেদের কাছে কুক্ষিগত কোরে রাখতে চান এবং এটাকে বিক্রি কোরে জীবিকা নির্বাহ কোরতে চান। তারা সত্যকে প্রকাশ হোতে দিতে চান না, তারা ভাবেন এই সত্য প্রকাশ হোয়ে পড়লে তাদের আয় রোজগারের পথ বন্ধ হোয়ে যাবে এই আশঙ্কায় সব সময় সত্যের বিরোধিতা করেন। মূলত: সামান্য পার্থিব লাভে মানুষকে প্রকৃত সত্য জানতে না দেওয়া এক চরম অন্যায়। তাদের এই কাজটি মানবজাতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার শামিল। আমরা চাই এসলামকে তার সঠিক রূপে মানবজাতির সামনে তুলে ধোরতে, কিন্তু আলেমরা সেটা হোতে দিতে চান না নিছক ব্যক্তিস্বার্থে। সুতরাং মানবজাতির কল্যাণের স্বার্থে রসুলাল্লাহর এই ভবিষ্যদ্বাণীটি প্রকাশ করা আমাদের জন্য অপরিহার্য হোয়ে পড়েছে। নয়তো সাধারণ মানুষ ধর্মীয় ব্যাপারে আজীবন ধর্মব্যবসায়ী আলেম-মোল্লাদেরই মুখাপেক্ষী হোয়ে থাকবে। পরিণামে দুনিয়াতেও শান্তি পাবে না, আখেরাতেও জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ হবে।

এখন দেখা যাক,
আলেম ওলামাদের দ্বারা সৃষ্ট ফেতনা কোনটি!

এর উত্তর জানতে হোলে তাদের অতীত কর্মকাণ্ডও আমাদের জানতে হবে। এই আলেমশ্রেণীই দেশে দেশে যুগে যুগে আল্লাহদ্রোহী শক্তির এসলাম পরিপন্থী সকল কর্মকাণ্ডকে কোর'আন হাদীসের অপব্যাখ্যা দ্বারা জায়েজ কোরে এসেছেন, বৈধতা দিয়ে এসেছেন, তাদের এই কাজের ফলে তাগুত শক্তি নির্বিঘ্নে তাদের আল্লাহর হুকুমপরিপন্থী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে সুযোগ পেয়েছে। সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষ যতবার আল্লাহ, প্রাণপ্রিয় রসুল ও এসলামের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে উজ্জীবিত হবার চেষ্টা কোরেছে ততবারই ধর্মজীবী একশ্রেণীর আলেম ধর্মের বীণ বাজিয়ে দক্ষ সাপুড়ের মতো ধর্মপ্রিয় মানুষকে বশ কোরে বাক্সবন্দী কোরেছে, দূষিত পানি ঢেলে নির্বাপিত কোরেছে তাদের এসলামী চেতনার বহ্নিশিখা। এভাবেই ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হোয়েছে এবলিসের রাজত্ব, ভূলুণ্ঠিত হোয়ে গেছে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব থেকে শুরু কোরে এসলামী মূল্যবোধ, সংস্কৃতি এমন কি মোসলেমদের জাতীয় চেতনাটুকুও। এটা ঘোটেছে তথাকথিত খেলাফতের নামে উমাইয়া

যুগে, আব্বাসীয় যুগে, ফাতেমীয়দের সময়, ঘোটেছে সুলতানী আমলে, মোগল আমলে, ঔপনিবেশিক আমলে, তুর্কি খেলাফতের নামে রাজতন্ত্রের সময়ে এভাবে আজকের দিন পর্যন্ত এই দুঃখজনক ঘটনার পুনঃ পুনঃ আবর্তন ঘোটেই চোলেছে। মহানবীর এন্তেকালের ৬০/৭০ বছর পর এই জাতির নেতারা যখন উম্মাহর মূল দায়িত্ব জেহাদ ত্যাগ কোরে শান শওকতের সঙ্গে অপরাপর রাজা-বাদশাহদের মতো ভোগ বিলাসে মগ্ন হোয়ে গেল, তখনও জাতির মধ্যে বহু মানুষ ছিলেন যাদের মধ্যে উম্মতে মোহাম্মদীর প্রকৃত চেতনা দীপ্তমান ছিল। তাদেরকেও আলেম, পণ্ডিত, ফকীহ

এভাবে খলিফা নামের রাজা বাদশাদের সামনেই আলেমদের মধ্যে দীনের নানা বিষয় নিয়ে তর্ক-বাহাস চোলতে থাকে, একই বিষয়ে নানা ফতোয়ার উদ্ভব হয়।

সমাজ এই বোলে ঘরে বসিয়ে দিলেন যে, জেহাদ দুই প্রকার। জেহাদে আকবর আর জেহাদে আসগর। বড় জেহাদ বা জেহাদে আকবর হোল আত্মার কু-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জেহাদ, আর কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ হোল গৌণ বা জেহাদে আসগর। এই ছোট জেহাদও আবার ফরদে আইন নয়, ফরদে কেফায়া। সুতরাং স্বভাবতই একসময় পুরো জাতি শত্রুর বিরুদ্ধে জেহাদ কোরে প্রাণ ও সম্পদ বিপন্ন না কোরে আত্মার বিরুদ্ধে নিরাপদ জেহাদেই মগ্ন হোয়ে গেল। কোর'আনে আল্লাহ পরিষ্কারভাবে বোলে দিয়েছেন যে, কাফেরদের বিরুদ্ধে কোর'আন দ্বারা কঠোর জেহাদ চালিয়ে যাওয়াই হোচ্ছে বড় জেহাদ (জেহাদান কাবীরা) (সুরা ফোরকান ৫২), আর আল্লাহর রসুল বোলেছেন, 'জালেম শাসকের সামনে দাঁড়িয়ে ন্যায্য কথা বলাই আল্লাহর রাস্তায় বড় জেহাদ [আবু সাঈদ খুদরী (রা:) থেকে আবু দাউদ]।' জালেম শাসক মানে কেবল অত্যাচারী শাসক নয়, যে শাসক আল্লাহর নাযেল করা হুকুম দিয়ে শাসন করে না, সেই জালেম শাসক (সুরা মায়েদা-৪৫)। পবিত্র কোর'আনে প্রদত্ত এই সংজ্ঞার আলোকে বর্তমান পৃথিবীর কোনো শাসকই জালেমের সংজ্ঞার বাইরে যান না। গত ২৭ জুলাই ২০১৩ ঈসায়ী তারিখ খোদ সৌদি প্রিন্স খালেদ বিন ফারহান আল-সৌদ তা স্বীকার কোরে এক বিবৃতি দিয়েছিলেন। তিনি রাজ পরিবারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে বলেছিলেন, দেশে আল্লাহর আইন বা শাসন নেই। খালিদ বিন ফারহান বলেন, "গর্বের সঙ্গে আমি সৌদি আরবের রাজ পরিবার ছাড়ার ঘোষণা কোরছি। এই সরকার আল্লাহর শাসনের পাশে দাঁড়ায়নি এমনকি সরকারের আইন, নীতি, সিদ্ধান্ত ও কাজকর্মে এর নেতাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছারই কেবল প্রতিফলন রোয়েছে।" -(সূত্র: দৈনিক দেশেরপত্র ৩০ জুলাই ২০১৩)

ধর্মজীবী আলেমদের ফতোয়ার তোড়ে আল্লার হুকুম ও রসুলের নির্দেশনার কোনটিই সাধারণ জনগণের মনে রোইল না। পরিণামে এ জাতির কপালে নেমে এল খ্রিস্টানদের নিকৃষ্ট গোলামী। আজ সকল জাতির গোলাম হোয়েও এ জাতি আত্মার বিরুদ্ধেই জেহাদ চালিয়ে যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে আত্মার বিরুদ্ধেও জেহাদ করে না, যদি আত্মার বিরুদ্ধেও অন্তত জেহাদ কোরত তবুও এই জাতির এত অধঃপতন হোত না, অন্যায় কোরতে প্রভুর ভয়ে আত্মা কাঁপতো, কিন্তু আত্মারও উন্নতি হয় নি।

এই জাতি যখন ব্রিটিশ খ্রিস্টানদের গোলাম হোল তখন কিন্তু জাতি দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য, হতাশাগ্রস্ত, কিংকর্তব্যবিমূঢ়, এই অবস্থায় জাতিকে এসলামের চেতনায় ঐক্যবদ্ধ কোরে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার পরিবর্তে ইংরেজ শাসনামলকে দারুল আমান ফতোয়া দিয়ে ব্রিটিশ শাসনকে নিষ্কণ্টক কোরেছে একদল আলেম, মুফতী। কোনো কোনো সত্যনিষ্ঠ মর্দেমোজাহেদ সংগ্রাম চালালেও আরেকদল আলেম, মুফতী ফতোয়া দিয়ে তাদের সংগ্রামী চেতনাকে নির্বাপিত কোরে দেয়। ভারত যখন স্বাধীন হোল তখন কংগ্রেসে যোগ দিল একদল আলেম এবং কংগ্রেস মোসলেমদের বন্ধু বলে ফতোয়াও দিল সেই সব জাদরেল আলেমগণ। আবার আরেকদল মোল্লা কংগ্রেসকে কাফের ফতোয়া দিল ফলে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হোল। দুই পাকিস্তান যখন ভাগ হোল তখন একদল আলেম এটাকে জায়েজ বলে ফতোয়া দিল এবং অপরদল আলেম একটাকে নাজায়েজ বলে ফতোয়া দিল। লিবিয়ায় যখন ইতালির আগ্রাসন চোলল তখন মরুসিংহ বলে খ্যাত ওমর মোকতার প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তুললেন, তখন তার সংগ্রামকে ব্যর্থ কোরে দেওয়ার পেছনে কাজ করে একদল সুফী, মাওলানা, মুফতীদের ফতোয়া। বর্তমানে একদল আলেম বলছে ওমুক মার্কায় ভোট দিলে কাফের আবার ওমুক মার্কায় ভোট দিলে স্বর্গে যাওয়া যাবে এই সব ফতোয়ার বোমা ফাটানো চোলছে সমগ্র বিশ্বজুড়েই। এইভাবে সারা দুনিয়ায় একই দুঃখজনক ঘটনার পুনঃ পুনঃ সংঘটন যা বোলতে গেলে বিরাট বই হোয়ে যাবে এখানে এটা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, শুধু এটুকু আমরা বোলতে পারি যে এধরনের যত ফেতনা সৃষ্টি হোয়েছে তার সবই ধর্মব্যবসায়ী এই আলেম শ্রেণির দ্বারাই সৃষ্টি হোয়েছে।

তবু সত্যনিষ্ঠ কোনো মানুষ যদি কখনও এই চেপে রাখা সত্যগুলি জনসম্মুখে প্রকাশ কোরতে গেছেন তখন এই ধর্মব্যবসায়ী মোল্লা শ্রেণী সাধারণ জনতা ও শাসক শ্রেণীকে তাদের পেছনে লেলিয়ে দিয়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, গোলযোগ, বিশৃঙ্খলা, নিজেদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ (যা কার্যত শিরক ও কুফর), ধর্মীয় নির্যাতন এক কথায় ফেতনা সৃষ্টি কোরেছে। রসুলাল্লাহর কথা অনুযায়ী এই ফেতনা তাদের দিকেই ধাবিত হবে। কিভাবে সেটা পরে আসছি। সর্বশেষ এই আলেমরাই ব্রিটিশদের তৈরি করা বিকৃত ও সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী এসলাম শিখে মসজিদে, মাদ্রাসায়, খানকায়, ওয়াজ নসিহত কোরে বিভিন্নভাবে এই এসলাম মানুষকে শেখাতে লাগল। জাতির ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কোনো পথ তো রোইলই না, তারা বিকৃত এসলাম শিখে নিজেদের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, রক্তপাত, বিশৃঙ্খলা

ইটালিয়ান আর্মিদের কাছে আটকাবস্থায় ওমর মুখতার।

ইত্যাদিতে নিমজ্জিত হোয়ে রোইল। মনে রাখতে হবে সত্য এক, সত্যের কোনো বিভাজ্যতা নেই, যেকোন ব্যাপারে রায় হবে একটা আর সেটা হোল ঐ বিষয়ে আল্লাহর দেওয়া রায়, অর্থাৎ ঐ বিষয়ে আল্লাহ যা বলেছেন তাই হবে সিদ্ধান্ত। সিদ্ধান্তটি কার পক্ষে গেল, কার বিপক্ষে গেল সেটা বিবেচ্য বিষয় নয়। যেটা ন্যায়, হক, সত্য অর্থাৎ আল্লাহর হুকুম সেটাই হবে চূড়ান্ত– কিন্তু আমরা বাস্তবে কী দেখি? মোসলেম জাতির কোনো একটি বিষয় নেই যে, মরক্কো থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত পুরো জাতি একমত এবং সবাই মিলে সেটার আনুগত্য কোরছে বরং আমরা দেখি এদেশের কওমীরা কোনো সিদ্ধান্ত নিলে আলীয়ার মৌলভীরা সেটা প্রত্যাখ্যান কোরছেন, দিল্লী থেকে সিদ্ধান্ত নিলে লাহোর থেকে প্রত্যাখ্যাত হোচ্ছে, মদীনা থেকে প্রদত্ত ফতোয়া আল-আজহার নাকোচ কোরছে, শিয়াদের সিদ্ধান্ত তো সুন্নিরা কেবল প্রত্যাখ্যানই কোরছে না বরং এর বিরুদ্ধে পারলে যুদ্ধ ঘোষণা করে, আবার শিয়ারাও অনুরূপ। তাহলে সাধারণ মানুষ কোনদিকে যাবে। এই জন্য এসলামের ব্যাপারে সাধারণ মানুষও বিভক্ত, বিচ্ছিন্ন, ত্যক্ত, বিরক্ত। এইসব কাণ্ড দেখে অনেকে ধর্ম-কর্মই বাদ দিয়েছে, সুযোগ পেলেই এরা ধর্মকে, আল্লাহর রসুলকে গালাগালি করে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যাবতীয় অনৈক্য, দাঙ্গা ইত্যাদির পেছনে মূলতঃ রোয়েছে এই আলেমদের ফেতনা।

এই যে এসলামের যেকোনো বিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত মানতে না পারার কারণ, এরা আসলে এখন একটা জাতি নয়, উম্মাহ নয়, এদের কোনো কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ (Authurity) বা এমামাত নাই, আল্লাহ যে Chain of Command ঠিক কোরে দিয়েছেন তাতে নেই এই জনগোষ্ঠী। কাজেই এরা এখন বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত, বিভ্রান্ত, আল্লাহর লানৎ ও গজব প্রাপ্ত এক জনসংখ্যা মাত্র। এই অবস্থায় এদের দুনিয়াও শেষ, আখেরাতও শেষ।

সুতরাং জাতির এই অধঃপতনের জন্য কেবল বহিঃশত্রুই দায়ী নয়, তাদের চেয়ে বহুগুণ দায়ী ঘরের শত্রু বিভীষণ ধর্মজীবী আলেম মোল্লারা। তারা ১৩০০ বছরের অধিককাল ধোরে ধর্মীয় মতবাদের ভিত্তিতে শিয়া, সুন্নি, হানাফি, হাম্বলী, মালেকী, শাফেয়ী, মুতাজিলা, লা মজহাবী, আহলে সুন্নাহ, ওয়াহাবী, বাহায়ী, সালাফি ইত্যাদি অসংখ্য ভাগে, আধ্যাত্মিকভাবে নকশবন্দীয়া, চিশতীয়া, কাদেরিয়া, মোজাদ্দেদিয়া ইত্যাদি শত শত তরিকায় জাতিকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো কোরেছেন। শিয়া-সুন্নি আর ফেরকা মাজহাবের দাঙ্গায় গত ১৩০০ বছর ধোরে কত হাজার, লক্ষ মানুষ যে মারা গেছে তার কোনো গোনাগাঁথা হিসাব নেই। এখনও সিরিয়া, বাগদাদ, পাকিস্তানে এই সংঘাত চোলছে। আমাদের দেশেও ফেরকা-মাজহাবের ঝগড়া লাগিয়ে একই গ্রামে একাধিক মসজিদ নির্মাণ করার ঘটনা বহু ঘোটেছে। এ আত্মঘাতি কাজ সাধারণ জনগণ করে নি, কোরেছেন আলেমরাই। সাধারণ মানুষ জানে না, কী কোরলে সুন্নি হয়, কী কোরলে শিয়া হয়, ওয়াহাবী মতবাদ কি, সালাফী মতবাদ কি। তারা জানে, আশুরার দিনে মাতম করা, তাজিয়া সাজিয়ে মিছিল করা আর নিজ শরীর চাবুক মেরে ক্ষতবিক্ষত কোরলেই তারা শিয়া। কিন্তু ১৩০০ বছর আগে ঘটে যাওয়া একটা দুঃখজনক ঘটনাকে কেন্দ্র কোরে মাতম করা যে কোনো জীবন্ত জাতির কাজ নয়, এটা মৃত জাতির কাজ কিন্তু এই কাজটাকে সাধারণ মানুষদের বুঝতে দেওয়া হোল না বরং ধর্মের অনিবার্য কার্যে পরিণত কোরেছে এই শিয়া আলেমরাই। অন্যদিকে মহানবীর শুধুমাত্র ব্যক্তিগত অভ্যাস-অনভ্যাসগুলি নকল কোরে সুন্নি হোয়েছে সুন্নি আলেমরা। কাজেই সাধারণ মানুষ এটুকু কোরেই সুন্নি হোয়ে যায়। মহানবীর সাহাবাদের বলা হয় রাদিয়াল্লাহু আনহু অর্থাৎ আল্লাহ তাদের উপর রাজি, খুশি। কিন্তু কেন আল্লাহ তাদের উপর রাজি খুশি হোলেন? কারণ তাঁরা মানুষের জীবন থেকে সকল অশান্তি দূর কোরে শান্তি (এসলাম) প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন সম্পদ কোরবানী কোরেছেন, এটাই যে রসুলাল্লাহর প্রকৃত সুন্নাহ সেটা আর জনগণকে জানতে দেওয়া

হোল না। আজও যারা এই কাজ কোরবে তাদের উপরও আল্লাহ খুশি হবেন আর যারা দুনিয়াদারী সমস্ত রকম সমস্যা থেকে গা বাঁচিয়ে হুজরায়, খানকায় আর মসজিদের চার দেয়ালের মধ্যে বসে যিকির-আসগার কোরবে তাদের উপর আল্লাহ রাজি-খুশি তো হবেনই না বরং তারা যেমন আল্লাহর লানৎ পাচ্ছে তেমনই লানতের পাত্রই থেকে যাবেন। মানুষ যেন তওহীদ, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব গ্রহণ কোরে জীবন-সম্পদ কোরবানী কোরতে না পারে সেজন্য বিভিন্ন ফতোয়া দিয়ে নির্জীব, অন্তর্মুখী কোরে রাখে এই ধর্মব্যবসায়ী আলেমশ্রেণী।

মনে রাখতে হবে “আসমানের নীচে নিকৃষ্ট জীব উম্মাহর আলেম শ্রেণী, তারা ফেতনা সৃষ্টি কোরবে এবং সেই ফেতনা তাদের দিকেই ধাবিত হবে”- এই কথা কিন্তু আমাদের কথা না স্বয়ং আল্লাহর রসুলের কথা।

১৩০০ বছর ধোরে শিয়ারা সুন্নিদের কাফের বোলছে, সুন্নিরাও শিয়াদের কাফের বোলে গলা ফাটাচ্ছে, একে অপরের রক্তে হোলি খেলছে। বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যে যে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা, যুদ্ধ তা প্রায় পুরোটাই শিয়া-সুন্নি দ্বন্দ্ব। উভয়পক্ষকেই সমর্থন যুগিয়ে গেছেন জাঁদরেল আলেমরা, ফকীহ,

মোহাদ্দেস, মোফাসসেররা। ফলে যখন মোসলেম জাতি খ্রিস্টানদের গোলামে পরিণত হোল তখনও এই জাতির পক্ষে সম্ভব হোল না সকল বিভেদ ভুলে এক আল্লাহর বান্দা ও এক নবীর উম্মাহ হিসাবে ঐক্যবদ্ধ হওয়া। জাতি আজও এসলামের কোনো একটি বিষয় নিয়েও একমত হোতে পারে না,

আরবী উচ্চারণরীতির প্রভেদ যেমন দোয়াল্লীন হবে, না যোয়াল্লিন হবে, রসুলাল্লাহ নূরের তৈরি না মাটির তৈরি ছিলেন, তিনি হায়াতুন্নবী (চিরজীবি) নাকি এন্তেকাল কোরেছেন, মিলাদে কেয়াম কোরতে হবে না কেয়াম করা শেরক, মাইকে আযান দেওয়া জায়েজ, না নাজায়েজ, টেলিভিশন দেখা হারাম না হালাল ইত্যাদি অনর্থক বিষয় নিয়ে মারামারি, মতভেদ, ফতোয়া, বাহাস কারা সৃষ্টি কোরেছেন, এর পক্ষে বিপক্ষে ভলিউম ভলিউম বই লিখেছেন কারা? সাধারণ জনগণ না আলেম শ্রেণী? এভাবেই আলেম নামধারীরা এই উম্মাহর ধ্বংসের প্রধান কারণ।

রসুলাল্লাহ একদিন তাঁর আসহাবদেরকে জিজ্ঞেস কোরলেন, ‘তোমরা কি জান, এসলামকে কিসে ধ্বংস কোরবে? এই প্রশ্ন কোরে তিনি নিজেই জবাব দিচ্ছেন- শিক্ষিতদের ভুল, মোনাফেকদের

বিতর্ক এবং নেতাদের ভুল ফতোয়া (হাদীস- মেশকাত) । যে কাজ এসলামকেই ধ্বংস কোরে দেয় সে কাজের চেয়ে বড় গোনাহ আর কি হোতে পারে! আলেমরাই বিতর্ক সৃষ্টি কোরে এ জাতির ঐক্য ধ্বংস কোরে মোনাফেকি কোরেছেন এবং নেতাদের পক্ষে ভুল ফতোয়া প্রদান কোরে অন্যায়ের প্রসার ঘোটিয়েছেন। কিন্তু তারা সব সময় 'সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধাদানের' ওয়াজ-নসিহত কোরে থাকেন।

আল্লাহ কোর'আনের শত শত আয়াতে এটা পরিষ্কার কোরে দিয়েছেন যে, দল মাত্র দুইটি-আল্লাহর দল এবং এবলিসের দল (সুরা মুজাদালাহ ১৯-২২), আলো এবং আঁধার যেমন একসঙ্গে থাকতে পারে না তেমনি সত্য ও মিথ্যার সহাবস্থান সম্ভব নয় (বনী এসরাঈল ৮১), মানবজাতি দুই ভাগে বিভক্ত- হয় মো'মেন নয় কাফের (তাগাবুন-২), এর মধ্যে আর কোনো তৃতীয় পক্ষ নেই। কিন্তু কথিত আলেমরা মো'মেন এবং কাফেরের মধ্যে কোনো সুস্পষ্ট সীমারেখা না টেনে এই বিতর্ককে জিইয়ে রেখেছেন। জেহাদ কোরতে হোলে তো অবশ্যই দু'টি পক্ষ থাকতে হবে- অর্থাৎ মো'মেন বনাম কাফের। আল্লাহ পরিষ্কারভাবে বলেন, 'যারা আল্লাহর নাজেলকৃত বিধান দিয়ে হুকুম (শাসন, বিচার ফায়সালা) করে না, তারা কাফের, জালেম ও ফাসেক (সুরা মায়েদা- ৪৪, ৪৫, ৪৭)।' বর্তমানে কোথাও আল্লাহর সার্বভৌমত্ব নেই, আল্লাহর আইনের শাসনও নেই, মানবরচিত সংবিধান দিয়েই পরিচালিত হোচ্ছে সমগ্র মানবজাতি। কিন্তু আলেমদের চোখে কে কাফের কে মোশরেক তা বলা যায় না, তারা প্রচার করে যেহেতু এই জাতি মূর্তি পূজা করে না তাই এরা মোশরেক নয়; কিন্তু এই জাতি যে আল্লাহর হুকুম বাদ দিয়ে আল্লাহর ভাষায় কাফের হোয়ে গেছে তা সাধারণ জনতাকে বুঝতে দেয় না বরং তারা ঐ কাফের মোশরেক নেতৃত্বের মোসলমানিত্বের পক্ষে সাফাইসাক্ষীর কাজ কোরে থাকেন এই বোলে যে, অমুক নেতা প্রতিবছর হজ্ব করেন, ফজরের নামাজ পড়েন, ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন, ভোরবেলা কোর'আন পড়েন, ধর্মখাতে বিরাট বাজেট রাখেন ইত্যাদি। এসব সরকারী আলেমদের উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, ক্ষমতার ওম, ক্ষমতাসীনের নেকনজর ও উচ্ছিষ্ট হাসিল করা। অথচ আল্লাহ বোলেছেন, "যারা মো'মেন, তারা জেহাদ করে আল্লাহর পথে আর যারা কাফের তারা যুদ্ধ করে শয়তানের পথে (সুরা এমরান ৭৬)"। তাই যারা প্রকৃত আলেম তারা কখনও নিজের স্বার্থে দীনকে বিকৃত কোরতে পারে না, বিক্রিও কোরতে পারে না। এই আলেমরা মো'মেনের সংজ্ঞাতেও পড়েন না, কারণ আল্লাহ বলেন, 'মো'মেন শুধুমাত্র

তারাই যারা আল্লাহ এবং রসুলের উপর ঈমান আনার পর তাতে আর সন্দেহ পোষণ করে না অর্থাৎ দৃঢ় থাকে এবং আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ ও জীবন উৎসর্গ কোরে জেহাদ (সর্বাত্মক সংগ্রাম) করে। তারাই সত্যনিষ্ঠ (সুরা হুজরাত ১৫)। এই সংজ্ঞা ধর্মব্যবসায়ী আলেমদের পছন্দনীয় নয়, কারণ এই সংজ্ঞা মোতাবেক মো'মেন হোতে জান ও মালের কোরবানী প্রয়োজন হয় যা ধর্মব্যবসায়ী আলেমদের বড়ই না-পছন্দ। এর চেয়ে তারা আত্মার বিরুদ্ধে জেহাদ কোরতেই বেশি ভালবাসেন। একটু আগেও যেটা বোলেছি, আত্মার বিরুদ্ধে জেহাদ কোরলেও তো হোত অন্তত প্রভুর ভয়ে আত্মা পাপাচার কর্ম থেকে কিছুটা হোলেও বিরত হোত কিন্তু তাও তো পারে নাই, এদের অবস্থাও অনেকটা ইহুদি খ্রিস্টান আলেমদের মতোই। এই ইহুদি-খ্রিস্টান আলেম পণ্ডিতদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, "বৈরাগ্যবাদ তারা সৃষ্টি কোরেছে কিন্তু তাও তারা ভালোভাবে করে নাই" (সুরা আল হাদীদ- ২৭) কাজেই আত্মার বিরুদ্ধে জেহাদের কথা আল্লাহ বলে নি, আল্লাহ বলেছেন, "কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ কর আর এটিই হোল বড় জেহাদ অর্থাৎ জেহাদান কাবীর" (সুরা ফোরকান- ৫২)। এই আত্মার বিরুদ্ধে জেহাদ বের কোরেছে পলায়নপর, ভীরু-কাপুরুষ ধর্মজীবী আলেম মোল্লারা নিজেদেরকে সকল প্রকার বিপদ-আপদ থেকে বাঁচিয়ে ধর্মব্যবসায় চালিয়ে যাওয়ার জন্য কিন্তু এই আত্মার বিরুদ্ধে জেহাদটিও যদি চালিয়ে যেত তারা তবে তাদের আত্মার যে অধঃপতন হোয়েছে অর্থাৎ ধর্মকে দিয়ে ব্যবসা করা তা অন্তত হোত না, অথবা অনেক কম হোত।

তাদের একটি দল জনগণকে বলেন, গণতন্ত্র শেরক, রসুলাল্লাহ কখনও নির্বাচন করেন নাই- জেহাদ কোরেছেন, আর আরেকটি দল 'কেয়াস' কোরে বলেন, না, এসলামে গণতন্ত্র আছে, এসলামই গণতন্ত্রের উৎস, মিছিল, হরতাল আর নির্বাচনই এ যুগের জেহাদ, আরেকদল আলেম বলেন সমাজতন্ত্র কুফর, যারা সমাজতন্ত্রী তারা নাস্তিক, এদের বিখ্যাত বিখ্যাত ওয়াজ শিল্পীরা লক্ষ লক্ষ মানুষের সম্মেলনে সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়ে জনগণকে গণতন্ত্র খাইয়েছে, ভোট কোরেছে, সংসদে দাঁড়িয়ে গণতন্ত্রের সাফাই গেয়েছে আর ফতোয়া দিয়েছে এই ভোট দেওয়াই এখন জেহাদ। এইসব ফতোয়া কিন্তু সাধারণ মানুষ দেয় নি, দিয়েছেন এই মোফাস্সের আর আলেমরাই, হেকমতের দোহাই দিয়ে যাবতীয় নাজায়েজ কাজ তারা জায়েজ কোরেছেন। আবার অনেক আলেম সাহেবরাই সমাজতন্ত্রের পক্ষে সাফাই গেয়ে বলে থাকেন, এসলামের চেয়ে বড় কোনো সাম্যবাদ নেই, ওমর (রা:) সমাজতন্ত্রী ছিলেন, এসলামই সমাজতন্ত্রের উদ্গাতা। এক্ষেত্রে কোর'আনের বিশেষ

বিশেষ আয়াতগুলিকে প্রধান্য দেয়া হয়, যেগুলোতে আল্লাহ নিজেকে আসমান-জমীনের সব কিছুর মালিক বোলে ঘোষণা কোরছেন। বলা হয়, সব কিছুর মালিকানা যখন আল্লাহর তখন সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্রের মতো এসলামেও ব্যক্তি মালিকানা নেই। বিশ্বনবীর (দ:) লক্ষ সাহাবাদের মধ্য থেকে বেছে নেয়া হোল আবু যরকে (রা:) একমাত্র আদর্শ বোলে, কারণ, তাঁর ব্যক্তিগত মতামতের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের দর্শনের কিছুটা মিল ছিলো। তারা তাদের এই সব মতের উপরে মোটা মোটা অসংখ্য বই লিখেছেন। তাদের মতের উপরে ভিত্তি করে এসলামী গণতান্ত্রিক দল, এসলামী সমাজতান্ত্রিক দল কায়েম হয়। অথচ আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সত্যকে মিথ্যার সঙ্গে মিশ্রিত করবে না এবং তোমরা জেনেশুনে সত্য গোপন করবে না।' (সূরা: আল-বাকারা, আয়াত-৪২), অন্যত্র আল্লাহ সত্যগোপনকারীকে আগুন ভক্ষণকারী বোলেছেন (বাকারা ১৭৪)। তারা বোঝেন না যে এসলামে কোনো ভেজাল দেয়া যায় না, দিলে সেটা আর এসলাম থাকে না। তাদের এসলামী গণতন্ত্র যে প্রক্রিয়ায় এসলাম প্রতিষ্ঠা কোরতে চায় অর্থাৎ মিটিং, মিছিল, শ্লোগান, বক্তৃতা, জ্বালাও, পোড়াও, পিকেটিং এবং গায়রুল্লাহর প্রক্রিয়ায় নির্বাচন কোরে; সেটা সেই পাশ্চাত্যের সরকারী ক্ষমতা দখলের প্রক্রিয়া, আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রক্রিয়া নয়। এসলামকে প্রতিষ্ঠা কোরতে একমাত্র পথ বিশ্বনবীর (দ:) পথ, সে পথে মিটিং, মিছিল, শ্লোগান নেই, তিনি তা করেন নি। তিনি শুধু নিরবচ্ছিন্নভাবে আল্লাহর তওহীদের আহ্বান কোরেছেন। 'হেকমতের' সাথে কাজ করার যুক্তি দেয়ার পরিস্থিতি রসুলাল্লাহর (দ:) জীবনেও এসেছিলো। মক্কার মোশরেক নেতারা যখন তাঁকে আরবের বাদশাহ বানাতে প্রস্তাব দিয়েছিল এই শর্তে যে, তিনি (দ:) তাদের দেব-দেবীগুলোর বিরুদ্ধে কথা বোলবেন না, তখন তিনি 'হেকমতের' কথা চিন্তা কোরলে এই ভাবতে পারতেন যে, আরবের বাদশাহ হোলে আমি যা কোরতে চাই তা অনেক সহজ হোয়ে যাবে। কারণ তখনকার দিনের বাদশাহী আজকের দিনের বাদশাহদের মতো ছিলো না, তখনকার দিনের রাজা-বাদশাহরা ছিলেন সর্বেসর্বা, তাদের হুকুমই ছিলো আইন। মানুষের প্রাণের মালিক ছিলেন রাজা-বাদশাহরা। হাজার হাজার মানুষের মাথা কাটার হুকুম দিলেও তা বিনা প্রশ্নে কাটা হতো। মহানবী (দ:) ভাবতে পারতেন কিছুদিনের জন্য দেব-দেবীদের বিরুদ্ধে কথা বলা বন্ধ কোরে রাজশক্তি হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে সমাজকে বদলিয়ে তওহীদে পরিবর্তিত কোরলে তো খুব 'হেকমতের' সঙ্গে কাজ করা হয়, তাতে অনেক কম কষ্ট হবে, অনেক প্রাণ বেঁচে যাবে, আমার কাজও হোয়ে যাবে। তিনি তা ভাবেন

নি, করেনও নি। তিনি আপোসহীন সংগ্রাম ও বিপ্লবের পথ বেছে নিয়েছিলেন আর তাই তিনি (দ:) মানব ইতিহাসের বৃহত্তর বিপ্লব সৃষ্টি কোরেছিলেন।

যারা বলেন এসলাম তো গণতন্ত্রের মতোই, এসলাম তো সমাজ তন্ত্রের মতোই অথবা আরও বিভিন্ন তন্ত্র-মন্ত্রের সাথে এসলামের মিল খোঁজার চেষ্টা করেন তাদের উদ্দেশ্যে একটা উদাহরণ পেশ কোরছি। ধরুন আপনার একটা গাধা আছে, আপনার এক বন্ধু আপনার বাড়িতে বেড়াতে এসে গাধাটি দেখে বললো, "বন্ধু, গাধাটি তো ভারি সুন্দর। এটি দেখতে যেন তোমার মতোই।" তার কথার পেছনে যুক্তি হিসাবে সে বললো, "দেখ বন্ধু, তোমার জীবন আছে, গাধারও জীবন আছে, দেখার জন্য তোমার দু'টি চোখ আছে ঠিক একইভাবে গাধারও দু'টি চোখ আছে, গাধা তোমার মতোই হাঁটতে জানে, খেতে জানে; এমনই আরও অনেক মিল দেখানো যাবে।" তবে কি আপনি আপনার বন্ধুর কথা মেনে নিবেন? দু'টি প্রাণীর মধ্যে এতটুকু মিল থাকা স্বাভাবিক কিন্তু গাধা এবং মানুষ এক নয় বরং আসমান জমিন পার্থক্য, ঠিক একইভাবে দু'টি জীবনব্যবস্থার মধ্যে ঐটুকু মিল থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু এসলাম নিখুঁত, পরিপূর্ণ, শাশ্বত, চিরন্তন স্রষ্টা প্রদত্ত একটি জীবনব্যবস্থা আর গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র ইত্যাদি তন্ত্র-মন্ত্রগুলি মানবরচিত ফলে সাভাবিকভাবেই ত্রুটিযুক্ত, ব্যার্থ, বস্তুবাদী ব্যবস্থা অর্থাৎ দু'টি ব্যবস্থার মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যাবধান।

প্রকৃত এসলাম তেরশ' বছর আগে হারিয়ে গেছে। আজ 'মোসলেম' অমোসলেম সব জাতিগুলিই পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক, আইন-কানুন, দর্শনের প্রভাবাধীন। ইহুদি খ্রিস্টান সভ্যতার প্রচণ্ড প্রভাব সমস্ত পৃথিবীকে এমন আচ্ছন্ন কোরে ফেলেছে যে, পৃথিবীর সমস্ত জাতিগুলি ব্যক্তিজীবনে যাই বিশ্বাস কোরুক সমষ্টিগত জীবনে অন্ধভাবে ঐ সভ্যতার নকল কোরছে। শুধুমাত্র মোসলেম জাতির মধ্যে কতকগুলি সংগঠন ছাড়া অন্য কোনো জাতি ইহুদি-খ্রিস্টান সভ্যতার সমষ্টি জীবনের ব্যবস্থা অর্থাৎ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আইন-কানুন ইত্যাদি প্রত্যাখ্যান কোরে নিজস্ব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালাচ্ছে না। এই মোসলেম জাতির ভেতর যে সংগঠনগুলো সে চেষ্টা কোরছে; ওগুলো ছাড়া আরও ছোট-খাট অনেক আছে। কিন্তু ছোট বড় কোনটাই ঐ ইহুদি-খ্রিস্টান সভ্যতার জীবন-দর্শনের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সাম্যবাদ, অর্থাৎ কমিউনিজম যখন মহাপরাক্রমশালী, তখন এসলামকে প্রতিষ্ঠার জন্য যে সব

প্রচেষ্টা করা হোয়েছিল তাতে সাম্যবাদও সমাজতন্ত্রের সাথে এসলামের সাদৃশ্য প্রমাণ করার চেষ্টা করা হোত। ঐ প্রচেষ্টায় কোর'আনের বিশেষ বিশেষ আয়াতগুলিকে প্রধান্য দেয়া হোত, যেগুলোতে আল্লাহ নিজেকে আসমান-জমীনের সব কিছুর মালিক বোলে ঘোষণা কোরছেন। উদ্দেশ্য-সব কিছুর মালিকানা যখন আল্লাহর তখন সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্রের মতো এসলামেও ব্যক্তি মালিকানা নেই। বিশ্বনবীর (দ:) লক্ষ সাহাবাদের মধ্য থেকে বেছে নেয়া হোল আবু যরকে (রা:) একমাত্র আদর্শ বোলে, কারণ, তাঁর ব্যক্তিগত মতামতের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের দর্শনের কিছুটা মিল ছিলো। সমাজতন্ত্রের সাথে এসলামের এত যখন মিল তখন সৃষ্টি করা হোল এসলামিক সমাজতন্ত্র। প্রায় তিনটি মোসলেম সংখ্যাগরিষ্ট দেশেই এই এসলামিক সমাজতন্ত্রের সংগঠন হোয়েছিল এবং পাকিস্তানের যুলফিকার আলী ভুট্টোর এসলামিক সমাজতান্ত্রিক (পি.পি.পি) দলসহ কয়েকটি দেশে কিছু দিনের জন্য সরকারও গঠন কোরেছিল। তারপর সাম্যবাদ, সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতার কারণে যখন সেগুলো ম্লান হোয়ে গেলো তখন ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্র জোরদার হোয়ে উঠেছে। এখন চেষ্টা চোলছে প্রমাণ কোরতে যে এসলাম গণতান্ত্রিক, নাম দেয়া হোচ্ছে এসলামিক গণতন্ত্র। সেই আগের মতই কোর'আন থেকে বেছে বেছে আয়াত নেয়া হোচ্ছে। ইহুদি-খ্রিস্টান পদ্ধতির সঙ্গে আপোসকে অর্থাৎ শেরক ও কুফরের সঙ্গে আপোসকে যথার্থ প্রমাণের চেষ্টায় মহানবীর (দ:) মদীনায় ইহুদি ও মোশরেকদের সঙ্গে চুক্তির ঘটনা উপস্থিত করা হোচ্ছে। বলা হোচ্ছে প্রয়োজনে আল্লাহর রসুলও (দ:) মদীনার ইহুদি ও মোশরেকদের সঙ্গে আপোস কোরেছিলেন। এর নাম এরা দিয়েছেন হেকমত। যে গণতন্ত্রের সার্বভৌমত্ব আল্লাহ নয়, সংখ্যাগরিষ্ঠের, সেই গণতন্ত্রকে স্বীকার কোরে নিয়ে সেই পদ্ধতিতে রাজনীতি কোরে, মিটিং, মিছিল, শ্লোগান দিয়ে এবং সেই পদ্ধতির নির্বাচনে অংশ নিয়ে নিজেদের কাজকে সঠিক প্রমাণ করার চেষ্টায় এরা এমন অন্ধ হোয়েছেন যে, আপোস ও চুক্তির মধ্যে বিরাট তফাৎ দেখতে পান না। আকীদা বিকৃতির জন্য এসলামের প্রকৃত রূপ, অগ্রাধিকার এ সব এরা বোঝেন না বোলে বিশ্বনবীর (দ:) ইহুদি ও মোশরেকদের সঙ্গে চুক্তিকে তাদের নিজেদের শেরক ও কুফরের সাথে আপোসের সঙ্গে একই পর্যায়ে ফেলেছেন। আপোস হোল কিছু দেয়া কিছু নেয়া, বিরুদ্ধ পক্ষের কিছু দাবী মেনে নেয়া ও নিজেদের কিছু দাবী বিরুদ্ধ পক্ষকে মেনে নেয়ানো। মদীনার চুক্তিতে বিশ্বনবী (দ:) বিরুদ্ধ পক্ষের অর্থাৎ ইহুদি ও মোশরেকদের পদ্ধতির (System) একটি ক্ষুদ্রতম কিছুও মেনে নেন নি, এসলামের জীবন-ব্যবস্থার, দীনের সামান্য কিছুও তাদের

উপর চাপান নি। কারণ তিনি আপোস কোরছিলেন না। তিনি মদীনা রক্ষার জন্য শুধু একটি নিরাপত্তা চুক্তি (Security Treaty) কোরছিলেন। সম্পূর্ণ চুক্তিটির উদ্ধৃতি এখানে দিতে গেলে বই বড় হোয়ে যাবে, শুধু প্রধান প্রধান শর্তগুলো পেশ কোরছি। (ক) মদীনা শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হোলে ইহুদি ও মোশরেকরা মোসলেমদের সঙ্গে একত্র হোয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কোরবে। (খ) যুদ্ধে ইহুদি ও মোশরেকরা তাদের নিজেদের খরচ বহন কোরবে, মোসলেমরা নিজেদের খরচ বহন কোরবে, যত দিনই যুদ্ধ চোলুক। (গ) ইহুদি ও তাদের সমগোত্রের লোকজন রসুলাল্লাহর (দ:) অনুমতি ছাড়া কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধ কোরতে পারবে না। (ঘ) এই চুক্তির অধীন সমস্ত গোত্রগুলির মধ্যে যে কোনো প্রকার বিরোধ বা গণ্ডগোল যাই হোক না কেন সমস্ত বিচার মহানবীর (দ:) কাছে হোতে হবে। এই কয়টিই হোল মহানবীর (দ:) ও মদীনার ইহুদি-মোশরেকদের মধ্যে চুক্তির প্রধান প্রধান (Saliet) বিষয়, যে চুক্তিটাকে মদীনার সনদ বলা হয়। চুক্তির ঐ প্রধান প্রধান বিষয়গুলির দিকে মাত্র একবার নজর দিলেই এ কথায় কারো দ্বিমত থাকতে পারে না যে, বিন্দুমাত্র ত্যাগ স্বীকার না কোরেও মহানবী (দ:) এমন একটি চুক্তিতে ইহুদি ও মোশরেকদের আবদ্ধ কোরলেন- যে চুক্তির ফলে তিনি কার্যতঃ (De Facto) মদীনার ইহুদি ও মোশরেকদের নেতায় পরিণত হোলেন। তাদের নিজেদের যুদ্ধের খরচ নিজেরা বহন কোরে মহানবীর (দ:) অধীনে মোসলেমদের সঙ্গে একত্র হোয়ে যুদ্ধ করার, মহানবীর (দ:) বিনা অনুমতিতে কারো সঙ্গে যুদ্ধ না করার ও নিজেদের মধ্যেকার সমস্ত রকম বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারের ভার মহানবীর (দ:) হাতে ন্যস্ত করার শর্তে আবদ্ধ কোরে তিনি যে চুক্তি কোরলেন তা নিঃসন্দেহে একাধারে একটি রাজনৈতিক, কুটনৈতিক ও সামরিক বিজয়। মদীনা রক্ষার ব্যবস্থা তো হোলই, তার উপর তিনি কার্যতঃ মোসলেম-অমোসলেম সকলের নেতায় পরিণত হোলেন। যারা ‘হেকমতের’ দোহাই দিয়ে এসলামী বিপ্লবের পথ ‘জেহাদ’ ত্যাগ কোরে পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক পদ্ধতি গ্রহণ কোরে মিটিং, মিছিল, শ্লোগান দিয়ে, মানুষের সার্বভৌমত্বের সংগঠনের অধীনে নির্বাচনে অংশগ্রহণ কোরছেন, কিন্তু বিনিময়ে অপর পক্ষ থেকে বিন্দুমাত্র প্রতিদান বা ত্যাগস্বীকার পান নি, তারা কেমন কোরে তাদের ঐ শেরক ও কুফরের কাজকে বিশ্বনবীর (দ:) ঐ মহা বিজয়ের সঙ্গে একই পর্যায়ে ফেলে তাকে ছোট করেন তা বোঝা সত্যিই মুশকিল।

বিশ্বের কোথাও বর্তমানে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব নেই অথচ মোসলেম সংখ্যাগরিষ্ঠ অর্ধ-শতাধিক দেশের প্রায় প্রত্যেকটিতে ‘জাতীয় শরীয়াহ বোর্ড’ নামে একটি হাস্যকর সরকারী বোর্ড আছে সেখানে একজন প্রধান মুফতি (Grand Mufti) থাকেন, যার নেতৃত্বে ঐ শরীয়াহ বোর্ড তাগুত সরকারগুলির যা অভিপ্রেত তা জায়েজ করেন, আর যা অনভিপ্রেত তা হারাম করেন। ঠিক ইহুদি রাব্বাই সাদুসাই ফরিশিরা, হিন্দু ধর্মের ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা যা কোরতেন। এই চল শুরু হোয়েছে প্রকৃত এসলাম বিকৃত হোয়ে রাজতন্ত্রে পর্যবসিত হওয়ার অব্যবহিত পর থেকেই।

ধর্মের ধারক বাহক আলেম মাওলানা, মুফতি, মোহাদ্দেস, মোফাস্সের যারা আছেন ওয়াজ করেন, এমামতি করেন, যারা নিজেদের নায়েবে নবী বলে দাবী করেন, যারা বলেন তাদের সঙ্গে মুসাহফা করলে নাকি সগীরা গুনাহ মাফ হয়, যারা জান্নাতে যাবেনই যাবেন, তারা অনুগ্রহ কোরে আমার কয়েকটি সরল প্রশ্নের উত্তর দিবেন-

১. যারা তাদের জাতীয় জীবনে আল্লাহর বিধান অর্থাৎ কোর’আনের আইন মানে না, ইহুদি খ্রিস্টানদের তৈরি আইন কানুন মেনে চলে তারা মো’মেন মোসলেম থাকে কি না?

২. রসুলাল্লাহ যে সংগ্রাম করে আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠা কোরেছিলেন, তাঁর সাহাবীরা দুনিয়ার সমস্ত কিছু বিসর্জন দিয়ে সংগ্রাম চালিয়ে রসুলের উপর নাজেল হওয়া জীবনবিধান প্রতিষ্ঠা করে উম্মতে মোহাম্মদী হোয়েছিলেন, ঐ কাজ বাদ দিয়ে উম্মতে মোহাম্মদী হওয়া সম্ভব কিনা?

৩. আল্লাহ মো’মেনের সংজ্ঞা দিয়েছেন, ‘মো’মেন শুধুমাত্র তারাই যারা আল্লাহ এবং রসুলের উপর ঈমান আনার পর তাতে আর সন্দেহ পোষণ করে না অর্থাৎ দৃঢ় থাকে, এবং আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ ও জীবন উৎসর্গ কোরে জেহাদ (সর্বাত্মক সংগ্রাম) করে। তারাই সত্যনিষ্ঠ্য (সুরা হুজরাত ১৫) ।’ এই আয়াতের আলোকে এই জনসংখ্যাটি মো’মেন কিনা?

৪. আল্লাহ কোর’আনে বোলেছেন, তোমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে ধারণ কর (সুরা এমরান ১০৩)। রসুলাল্লাহ বোলেছেন - তোমরা মতভেদ কোর না, মতভেদ কুফর (হাদীস-আব্দাল্লাহ বিন আমর (রা:) থেকে- মোসলেম, মেশকাত) । আজ আটলান্টিকের তীর থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত অর্ধ পৃথিবীতে মুসলমান নামক এই জাতি ধর্মীয় মতবাদে শিয়া, সুন্নি, শাফি, হানাফী, আহলে হাদীস, আহলে সুন্নাহ ইত্যাদি, আধ্যাত্মিকভাবে নকশবন্দিয়া, মোজাদ্দেদিয়া, কাদেরিয়া, চিশতিয়া ইত্যাদি বহু তরিকায়, রাষ্ট্রীয়ভাবে ৫০টির বেশি ভূখণ্ডে বিভক্ত হোয়ে আছে। ইহুদি খ্রিস্টানদের নকল

কোরে তাদের রাজনৈতিক মতবাদ গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র ইত্যাদি হাজারো মতবাদে বিভক্ত। প্রতিটি ভাগের পক্ষেও আলেমদের অবস্থান রোয়েছে। আমার প্রশ্ন: মোসলেম জাতির মধ্যে এই যে বিভক্তি- এটা কুফর কিনা? উম্মাহর সংজ্ঞা মোতাবেক এই জাতি এত বিভক্তির পরেও এক উম্মাহ থাকে কিনা যেখানে আল্লাহর রসুল বোলেছেন, 'আমার উম্মাহ একটি দেহের ন্যায়'? (নুমান আল বশির (রা:) থেকে মোসলেম)

৫. আল্লাহ বোলেছেন যারা আল্লাহর বিধান মোতাবেক শাসন করে না তারা কাফের, যালেম, ফাসেক (সুরা- মায়েদা, ৪৪, ৪৫, ৪৭) । মোসলেম দাবিদার এই জাতি যারা তাদের জাতীয় জীবনে আল্লাহর বিধান অর্থাৎ কোর'আনের আইন মানে না, ইহুদি খ্রিস্টানদের তৈরি আইন কানুন মেনে চলে তারা এই আয়াত মোতাবেক মো'মেন বা মোসলেম থাকে কিনা?

৬. আল্লাহ কোরানে বোলেছেন- "নিশ্চয়ই আল্লাহ যে কেতাব নাযেল কোরেছেন, যারা তা গোপন রাখে ও বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করে, তারা নিজের পেটে আগুন ব্যতীত অন্য কিছুই পুরে না। [বাকারা-১৭৪]" যারা নামাজ পড়িয়ে, দোয়া কোরে, ওয়াজ কোরে আরও বহুভাবে ধর্মের বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করেন, তারা আগুন খাচ্ছেন কিনা? যারা আগুন ভক্ষণ করেন, ধর্মের বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করেন তারা কি মোসলেম থাকেন কি না?

৭. আল্লাহ ওয়াদা কোরেছেন- তোমরা যদি মো'মেন হও তবে পৃথিবীর কর্তৃত্ব তোমাদের হাতে দেবো যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে দিয়েছিলাম (সুরা নূর ৫৫) । তাঁর ওয়াদা যে সত্যতার প্রমাণ নিরক্ষর, চরম দরিদ্র, সংখ্যায় মাত্র পাঁচ লাখের উম্মতে মোহাম্মদীর হাতে তিনি বিশ্বের কর্তৃত্ব তুলে দিয়েছিলেন। প্রশ্ন হোচ্ছে, আল্লাহর ওয়াদা মোতাবেক এই জাতির হাতে আজ পৃথিবীর কর্তৃত্ব নেই কেন? কর্তৃত্ব দূরে থাক, এ জাতি আজ ফুটবলের মতো অন্যান্য সব জাতির লাথি খাচ্ছে। তাহোলে এই জাতি যদি নিজেদের মো'মেন বা ঈমানদার দাবি করে তবে তাদেরকে বোলতে হবে যে, আল্লাহ ওয়াদা ভঙ্গ কোরেছেন (নাউযোবেল্লাহ) । আর আল্লাহ যদি মিথ্যা না বোলে থাকেন তবে এই জাতি তার সমস্ত নামাজ, যাকাত, হজ্ব রোজা সব সুদ্ধ বেঈমান অর্থাৎ কাফের, মোশরেক। আর কোনো সিদ্ধান্ত আছে কি?

৮. আল্লাহ মোসলেমদেরকে উদ্দেশ্য কোরে বোললেন তোমরা সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি (আল এমরান ১১০) । আজ জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, সামরিক শক্তিতে অর্থাৎ প্রতিটি ক্ষেত্রে সর্বনিকৃষ্ট হওয়ার পরও, সকল

জাতির মার খেয়েও, সকল জাতির গোলামী করার পরও মোসলেম দাবিদার জাতিটি সর্বশ্রেষ্ঠ? নাকি এরা আল্লাহর দৃষ্টিতে মোসলেম নয়?

৯. আল্লাহ বোলেছেন - তিনি মো'মেনদের ওয়ালী (বাকারা ২৫৭)। ওয়ালী অর্থ- অভিভাবক, বন্ধু, রক্ষক ইত্যাদি। আল্লাহ যাদের ওয়ালী তারা কোনোদিন শত্রুর কাছে পরাজিত হোতে পারে? তারা কোনোদিন পৃথিবীর সর্বত্র অন্য সমস্ত জাতির কাছে লাঞ্ছিত, অপমানিত হোতে পারে? তাদের মা-বোনরা শত্রুদের দ্বারা ধর্ষিতা হোতে পারে? আল্লাহ কি এই জাতিকে রক্ষা কোরতে অসমর্থ?

১০. রসুলাল্লাহ বোলেছেন, 'আল্লাহ আমাকে পাঁচটি কাজের আদেশ কোরেছেন। আমি সেগুলি করার জন্য তোমাদেরকে আদেশ কোরছি। সেগুলো হোল :

(১) ঐক্যবদ্ধ হও।

(২) (নেতার আদেশ) শোন।

(৩) (নেতার ঐ আদেশ) পালন করো।

(৪) হেজরত করো।

(৫) (এই দীনুল হক কে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার জন্য) আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করো।

যে ব্যক্তি (কর্মসূচির) এই ঐক্যবন্ধনী থেকে এক বিঘত পরিমাণও বহির্গত হোল, সে নিশ্চয় তার গলা থেকে এসলামের রজ্জু (বন্ধন) খুলে ফেললো- যদি না সে আবার ফিরে আসে (তওবা করে) এবং যে ব্যক্তি অজ্ঞানতার যুগের (কোনও কিছুর) দিকে আহ্বান কোরলো, সে নিজেকে মোসলেম বোলে বিশ্বাস কোরলেও, নামাজ পোড়লেও এবং রোজা রাখলেও নিশ্চয়ই সে জাহান্নামের জ্বালানী পাথর হবে [আল হারিস আল আশয়ারী (রাঃ) থেকে আহমদ, তিরমিযি, বাব উল এমারাত, মেশকাত]।

এই হাদীস মোতাবেক জাতিটি ঐক্যবদ্ধ না হোয়ে, নেতার আদেশ না শুনে, পালন না কোরে, হেজরত না কোরে এবং জেহাদ না কোরে নিজেদের গলদেশ থেকে এসলামের বন্ধন খুলে ফেলেছে কি না এবং জাহান্নামের জ্বালানী পাথর কি না?

আমি জানি, মাদ্রাসায় পড়ে 'নায়েবে নবী' হওয়ার তীব্র অহংবোধের কারণেই হোক আর ধর্মব্যবসায় ক্ষতির আশঙ্কা থেকেই হোক, এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়ার সৎসাহস অধিকাংশ

আলেম দাবিদারদেরই হবে না। তবু প্রশ্নগুলি রাখলাম কারণ এগুলি থেকে হয়তো কোনো সত্যান্বেষী মন এগুলির সঠিক উত্তর খুঁজে নেবেন। আমরা জানি, সত্য আপনাদেরকে গোপন কোরতে হয় পেশাগত কারণেই, সহজ রোজগারের পথটি আপনারা বন্ধ কোরতে চান না। মাদ্রাসায় পড়েন এবং পড়ান, সেই সূত্রে কিছু ব্যক্তিগত বিষয়ের মাসলা মাসায়েল জানেন বোলে আপনারা যারা নিজেদের অতি উৎকৃষ্ট মোসলেম বোলে মনে কোরেছেন তারা যে কুয়োর ব্যাঙ ছিলেন, সেই কুয়োর ব্যাঙই আছেন। যার যার খানকা, মাদ্রাসা, মক্তব, ইমামতি মসজিদের চার দেয়ালের অভ্যন্তরের জীবন যাপন অর্থাৎ হুজরাখানাকেই দুনিয়া বোলে ভাবছেন, জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার বিন্দুমাত্র চেষ্টাও আপনাদের মধ্যে নেই। বরং মাথার উপর তাগুতের, দাজ্জালের সার্বভৌমত্ব নিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে যাচ্ছেন, এমনকি তাহাজ্জুদও পড়ছেন কিন্তু আপনাদের এই অবস্থা আখেরী নবী পূর্বেই অবগত হোয়েছিলেন বোলেই তিনি ভবিষ্যদ্বাণী কোরেছেন তাদের রোজা রাখা হবে না খেয়ে থাকা আর তাহাজ্জুদ হবে ঘুম নষ্ট করা। কারণ তওহীদহীন আমল আল্লাহ কবুল করেন না। আর অপনাদের এই এসলাম আল্লাহ-রসুলের এসলাম নয়, দু'টি সম্পূর্ণ বিপরীত ও ভিন্ন জিনিস।

রসুলাল্লাহর এসলাম যারা গ্রহণ কোরেছিলেন তারা প্রথমে আরবে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা কোরেছিলেন এবং পরবর্তীতে তারা অর্ধেক পৃথিবীতে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা কোরেছিলেন। আর আপনারা যাদের তাফসীর, ব্যাখ্যা, মাসলা মাসায়েল মুখস্থ কোরে নিজেরা তর্কাতর্কি করেন, ঐ সমস্ত ফকিহ মোফাসসেরদের এবং বিকৃত সুফিদের অর্ন্তমুখী এসলাম লাখো শহীদ ও মোজাহেদের রক্তে অর্জিত সেই খেলাফত শত্রুর হাতে তুলে দিয়েছিলো। সমস্ত মোসলেম দুনিয়া আজ আল্লাহ ও রসুলের শত্রুদের হাতে, তথ্য-প্রযুক্তি তথা টিভি, রেডিও, ইন্টারনেট, পত্র-পত্রিকা এবং শিক্ষাব্যবস্থা সবই তাদের হাতে। তারা তাদের মতবাদ, সংস্কৃতি এসব বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবীর উপরে চাপিয়ে দেবে আর আপনারা আলেমরা খানকায়, মক্তবে, মাদ্রাসায় বোসে বোসে ফতোয়া প্রদান কোরবেন যে টিভি দেখা না-জায়েজ। কারণ এও আপনাদের অজানা যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার আজকের যে প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, সেটার ভিত্তি স্থাপন কোরেছিলেন মোসলেমরাই।

ইতোপূর্বেই বোলেছি, এই উপমহাদেশের ধর্মজীবী আলেমরা খ্রিস্টান-শাসনকে, তাদের অধীনে জুম'আ, ঈদ, কোরবানী, হজ্ব ইত্যাদি স্বাধীন এবাদতগুলিকে জায়েজ কোরেছেন, একই ঘটনা ঘোটেছে খ্রিস্টানদের অন্যান্য উপনিবেশগুলিতেও। মধ্যপ্রাচ্যের শেখতন্ত্র (আমীরাত), রাজতন্ত্র (মুলকিয়াত), বাদশাহীকে (সালতানাত) বহাল-তবিয়তে টিকিয়ে রাখতে এবং 'মোসলেমদের' কাছে তাদের গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ কোরতে আকর্ষণীয় ফতোয়া ও যুক্তি তর্ক উপস্থাপন কোরে যাচ্ছেন এই অর্থলোভী আলেমরাই। আরবীয় আলেমদেরকে বাকী দুনিয়ার আলেমরা ওহাবী, সালাফী ইত্যাদি বোলে গালিগালাজ কোরে থাকেন। ক্ষমতাধরের চাটুকার-স্তাবকের ভূমিকায় তারা অবতীর্ণ হোয়েছেন রসুলাল্লাহর বিদায়ের ৬০/৭০ বছর পরেই। যখন খেলাফত শেষ হোয়ে পরিবারতন্ত্র আরম্ভ হোল যা ক্রমে রাজতন্ত্রে পর্যবসিত হয়, তখন সেই রাজা বা সুলতানদের নামে খোতবা রচনা কোরলেন এই আলেমরা, জাল হাদীস রচনা কোরলেন "আস-সুলতানু জিল্লুল্লাহ" বা বাদশাহ আল্লাহর ছায়া, যে খোতবা আজও জু'মার দিনে সকল মসজিদের বেতনভোগী এমাম সাহেব ও খতিবরা নিয়মিত পাঠ কোরে থাকেন।

গত কয়েক শতাব্দীতে এসলামের কোনো একটি ইস্যুতে এই আলেম মোল্লা মুফতি মোফাসসের শ্রেণী একমত হোতে পারেন নি। এর প্রধান কারণ হোল তারা যে এসলামটিকে ধারণ কোরে আছেন, যেটাকে বিক্রি কোরে জীবন ধারণ কোরছেন সেটা আল্লাহ ও রসুলের প্রকৃত এসলাম নয়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে গত কয়েক শতাব্দীতে তাদের মন মগজে শিক্ষার মাধ্যমে যে এসলামটা গেঁড়ে দেওয়া হোয়েছে তার মূলেই এই অনৈক্যের বীজ রোপিত আছে। সুতরাং এই বিকৃত এসলামের কোনো একটি বিষয় নিয়েও আলেম মোল্লারা কোনোদিনও একমত হোতে পারবেন না। তাদের অবস্থা সেই পাঁচ অন্ধের হস্তিদর্শনের মত, যাদের একজন হাতির শুঁড় ধোরে বোলছেন, হাতি অজগরের মত, আরেকজন পা ধোরে বোলছেন হাতি থামের মতো ইত্যাদি। এই বিকৃত এসলামের আলেমরা এসলামের আকীদা সম্পর্কে অন্ধ থাকায় একেকজন এসলামের একেকটি বিষয়কে ধোরে সেটাকেই এসলামের আসল কাজ বোলে ঘোষণা কোরছেন এবং সেটা চুলচেরা বিশ্লেষণ কোরে মাকড়সার জালের ন্যায় জটিল, দুর্বোধ্য কোরে ফেলেছেন। তারা আজীবন কঠিন পরিশ্রম কোরে আল্লাহর আদেশ নিষেধগুলি ও বিশ্বনবীর কাজ ও কথাগুলিকে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতম বিশ্লেষণ কোরতে কোরতে এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছেন যে, সাধারণ মানুষের পক্ষে তা পূর্ণভাবে পালন করা প্রায় অসম্ভব এবং কেউ চেষ্টা কোরলে তার জীবনে অন্য আর কোনো কাজ করা সম্ভব হবে না, এ

দীনকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের তো প্রশ্নই আসে না। কারণ ফকীহরা তাদের ক্ষুরধার প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে প্রত্যেকে হাজার হাজার মসলা-মাসয়েল সৃষ্টি কোরেছেন। প্রধান প্রধানগণের এক এক জনের সিদ্ধান্তের সংখ্যা কয়েক লক্ষ। জাতি ঐ মসলা-মাসায়েলের মাকড়সার জালে জড়িয়ে পক্ষাঘাতগ্রস্থ হোয়ে গেছে, স্থবির হোয়ে গেছে। আলেমদের এই মতপার্থক্য, পারস্পরিক বিদ্বেষ অত্যন্ত গভীর যা কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুঃখজনক। পাকিস্তান আমলে যখন মাওলানা মওদুদী কাদিয়ানীদেরকে কাফের বোলে ফতোয়া দিলেন এবং তাদের বিরুদ্ধে কঠিন জনমত গড়ে তুললেন, তখন সরকার দেশের সেরা আলেমদের নিয়ে একটি ওলামা পরিষদ তৈরি করেন যাদের উপরে কাফেরের সংজ্ঞা নিরুপণ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু মজার বিষয় হোল, সেই আলেমরা বহু গবেষণা কোরে, বহু সময়ক্ষেপণ কোরেও কাদেরকে কাফের বলা যাবে তা নিয়ে ঐক্যমত্যে পৌঁছাতে পারেন নি। এদিকে উপমহাদেশের বহু সংখ্যক আলেম মওদুদীকে কাফের বোলে এবং মওদুদীর মতবাদকে ফেতনা বোলে আখ্যায়িত কোরেছেন, এখনও কোরছেন। এটাই সারা দুনিয়ার আলেমদের চিত্র। এইভাবে সারা দুনিয়ার আলেমরা একে অপরের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছেটান এবং তাদের প্রত্যেকের অনুসারীরা অপরের অনুসারীদের প্রতি ঘৃণার ভাব পোষণ করেন, সেই ঘৃণা থেকে বিদ্বেষ আর বিদ্বেষ থেকেই দাঙ্গা, হাঙ্গামা, রক্তপাত ইত্যাদি শুরু হয়।

তারা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, রসুলের সংগ্রামের উদ্দেশ্যের চেয়ে, সত্য প্রকাশের চেয়ে যার যার গদি, খানকা, মাদ্রাসার হেড মোহতামীম, মসজিদের এমামতি, গ্র্যান্ড মুফতি, খতিব ইত্যাদি পদ তাদের কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঠিক যেমন আরব রাষ্ট্রের অহঙ্কারী শেখ, আমীর, রাজা, বাদশাহদের কাছে আল্লাহর রসুলের এসলাম, মোসলেম উম্মাহ, মোসলেমদের স্বার্থ, এ জাতির ঐক্য ইত্যাদির চেয়ে যার যার আমীরত্ব, বাদশাহী ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ।

আল্লাহ এ জাতিকে মানবজাতির মধ্যে সর্বোত্তম জাতি হিসাবে ঘোষণা কোরেছেন কারণ তিনি এই জাতির উত্থান ঘোটিয়েছেন এই জন্য যে, তারা মানবজাতিকে ন্যায়ের নির্দেশ দেবে ও অন্যায় প্রতিহত কোরবে (সুরা এমরান ১১০)। স্বভাবতই, জাতি যদি এই কাজ জাতিগতভাবে ত্যাগ করে তবে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব থাকবে না। যখন আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় সুদভিত্তিক অর্থনীতি প্রচলন করা হয় তখন একদল আলেম সেটাকে হারাম বোলে ওয়াজ করেন, আরেকদল আলেম বহু হেকমত খাটিয়ে সেটাকে জায়েজ করেন। সাধারণ মানুষ ধর্মীয় গূঢ়তত্ত্ব বুঝতে না পেরে বিভ্রান্ত হয়। এসবের ফলে

একটি ধারণা সাধারণের মনে বদ্ধমূল হোয়ে গেছে যে, এসলাম সাধারণ মানুষের বোঝা সম্ভব নয়, সাধারণ মানুষের এসলাম সম্পর্কে কথা বলার কোনো এখতিয়ার নেই। এসলাম বুঝতে হোলে মাদ্রাসায় পড়াশুনা কোরে আগে আলেমের তকমা গায়ে চাপাতে হবে। এখন কোনো ব্যক্তি যদি এসলামের প্রকৃত আকীদা বুঝতে পারেন, আল্লাহর সর্বব্যাপী তওহীদ উপলব্ধি কোরে তার ভিত্তিতে শতধাবিচ্ছিন্ন এই জনসংখ্যাটিকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেন এবং আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ব্রতী হন, তখন কিন্তু এই আলেম দাবিদাররাই ফতোয়া জারি কোরে সাধারণ মানুষকে তার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলেন এই বোলে যে, ও এসলামের কি বোঝে, ও কি মাদ্রাসায় পড়েছে, ওর কি দাড়ি আছে, সুন্নতি লেবাস আছে ইত্যাদি ইত্যাদি। ব্যাস, ওমনি সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি অবাঞ্ছিত হোয়ে যান, কাফের সাব্যস্ত হোয়ে যান, তাকে মারধোর কোরে তাড়িয়ে দেয়া হয়, তার কোনো কথাই শোনা হয় না। এই পরিস্থিতি মোকাবেলা কোরেছে হেযবুত তওহীদ এর প্রতিষ্ঠার ১৭ বছর ধোরে। যখনই আমাদের কর্মীরা মানুষের কাছে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের আহ্বান নিয়ে গেছেন, আলেম-মোল্লা শ্রেণী তাদের তীব্র বিরোধিতায় অবতীর্ণ হোয়েছেন। তারা সাধারণ মানুষকে উসকে দিয়েছেন এই বোলে যে, হেযবুত তওহীদ খ্রিস্টানদের চর, খ্রিস্টান, তারা পূর্ব দিকে মুখ কোরে নামাজ পড়ে ইত্যাদি। তারা ফতোয়া দিয়েছেন যে, হেযবুত তওহীদের সদস্যদেরকে হত্যা করা তাদের সম্পদ লুট করা জায়েজ আছে। এসব অপপ্রচারের কারণে আমাদের শত-শত কর্মী বহুস্থানে অপমানিত হোয়েছেন, নির্যাতন- নিপীড়নের শিকার হোয়েছেন। অনেক কর্মীকে তাদের পৈত্রিক ভিটা থেকে উচ্ছেদ কোরে দেওয়া হোয়েছে, অনেকের সহায়-সম্পত্তি লুট-পাট করা হোয়েছে, বাড়ি ঘর আগুন দিয়ে ভস্মীভূত কোরে দেওয়া হোয়েছে, শত-শত কর্মীর ব্যবসা বাণিজ্য নষ্ট হোয়েছে, অনেকে তাদের চাকরি হারিয়েছেন, তাদের পরিবার মাসের পর মাস, বছরের পর বছর অবর্ণনীয় আর্থিক কষ্টে জীবন অতিবাহিত কোরেছেন এবং কোরছেন। হেযবুত তওহীদের প্রতি আলেমদের এত গোস্সা, তার কারণ এ যামানার এমাম জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী কিছু মহাসত্য মানবজাতির সামনে প্রকাশ কোরেছেন যে সত্যগুলি আলেম সাহেবরা গোপন রাখতে চান। যেমন:

(১) তারা যে মাদ্রাসাগুলিতে পড়াশুনো কোরে আলেম হোয়েছেন সে মাদ্রাসাগুলি খ্রিস্টানদের প্রতিষ্ঠিত এবং সেখানে যে এসলামটি শেখানো হয়, সেটাও খ্রিস্টানদের রচিত।

(২) তারা এসলামের বিভিন্ন কাজ যেমন নামাজ পড়িয়ে, কোর'আন খতম দিয়ে, মিলাদ পড়িয়ে, ওয়াজ কোরে অর্থ উপার্জন করেন, তাদের এই জীবিকার পথটি আল্লাহ হারাম কোরেছেন।

(৩) তারা এসলামকে নিজেদের কুক্ষিগত কোরে রাখতে চান। তারা প্রচার করেন যে, এসলাম শিখতে গেলে মাদ্রাসায় পড়তে হবে, নয়তো মাদ্রাসা শিক্ষিতদের কাছে যেতে হবে। কিন্তু এমামুয্যামান নিজেই মাদ্রাসা শিক্ষিত নন। এটা আলেমদের অহঙ্কারে প্রচণ্ড আঘাত হানে যে, একজন মানুষ মাদ্রাসায় না পড়ে, আরবী না জেনে এসলামের কথা বলে! এই অহংবোধ থেকে তারা হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে অবতীর্ণ হয়। তবে তাদের দৌঁড় নিজেদের এলাকাতেই সীমাবদ্ধ।

কিন্তু সত্য কখনও বিভক্ত নয়, সত্য এক, মিথ্যা অজস্র। সুতরাং আল্লাহর নাযেলকৃত এসলামও একটি, তাই সত্য এসলাম নিয়ে একাধিক দল-মত থাকা সম্ভব নয়। এটা জেনে বুঝেও যে আলেম নামধারীরা সত্যকথন থেকে বিরত আছেন, এমন কি অনেকে মিথ্যার পক্ষে বহু ফতোয়া, হেকমত সরবরাহ কোরছেন তাদের নীরবতা ও অন্যায়ের সঙ্গে আপোসের ফলে আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয় সমাজে অবাধ বিস্তার লাভ কোরছে। আল্লাহ যা নিষিদ্ধ কোরেছেন, যা মিথ্যা তার পরিণাম কি কখনও শুভ হোতে পারে, তার কুফল কি জাতি এড়াতে পারবে? কখনওই নয়। এটা প্রাকৃতিক নিয়ম যে, যারা অন্যায়কে সহ্য করে, প্রশ্রয় দেয়, সেই অন্যায় একদিন তাদেরকেই গ্রাস কোরে নেয়। আল্লাহর রসুল বোলেছিলেন, "আমার উম্মতের মধ্যে কতক লোক অতি শীঘ্রই ধর্মে অভিজ্ঞ হবে এবং কোর'আন আয়ত্ত করবে এবং বোলবে, আমরা শাসনকর্তাদের নিকট গিয়ে পার্থিব বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ কোরব এবং তাদেরকে আমাদের ধর্ম থেকে পৃথক করে দিব। কিন্তু তা হবে না। কাঁটাযুক্ত বৃক্ষ থেকে যেমন কাঁটা ছাড়া অন্য কিছু পাওয়া যায় না, তেমনি তাহাদের (শাসকদের) সাথে বসবাসে কিছুই লাভ হবে না (এবনে আব্বাস রা. থেকে এবনে মাযাহ)।" একইভাবে "ওলামাদের সৃষ্ট ফেতনা তাদের দিকেই ফিরে যাবে," রসুলাল্লাহর এই উচ্চারণ প্রাকৃতিক এই নিয়মটির প্রতিধ্বনি। আজ সারা দুনিয়ায় রসুলাল্লাহর এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হোচ্ছে, আলেমদের এই প্রতারণার মুখোস উন্মোচিত হোতে আরম্ভ কোরেছে, প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়ায় শাসকবর্গও আস্তাকুড়ে ছুঁড়ে ফেলতে আরম্ভ কোরেছে এই পরান্নভোজী সম্প্রদায়কে। তারা আজ

নির্মূল হোচ্ছেন সেইসব ‘ফ্রাঙ্কেনস্টাইন’দের হাতেই যাদেরকে প্রতিষ্ঠা কোরতে, যাদের অপকর্ম ঢাকতে এবং যাদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে একদিন তারা মিথ্যে ফতোয়ার পদাবলী রচনা কোরেছিলেন।

প্রচলিত 'এসলাম' এসলাম নয় কেন?

বর্তমানে সারা দুনিয়াতে এসলামের যে বিভিন্ন রকম রূপ আমরা দেখছি তার কোনটিই আল্লাহর প্রেরিত এসলাম নয়। এর সবগুলিই বিকৃত। কিভাবে এই বিপুল বিকৃতি সাধিত হোল সেই ব্যাপক আলোচনা আমার আলোচ্য নয়, এটা যে আল্লাহ ও রসুলের প্রকৃত এসলাম নয় তা সন্দেহাতীতভাবে এবং অকাট্যভাবে (Irrefutably) তুলে ধরাই আমার আলোচনার পরিসীমা। এটা সহজ সূত্র যে, এসলামের অনুসারীই হোচ্ছে মোসলেম, সুতরাং আমি যদি এটা প্রমাণ কোরতে সক্ষম হোই যে, বর্তমানে প্রচলিত এসলাম আল্লাহর নাযেলকৃত 'এসলাম' নয়, তাহোলে এটাও স্বতঃপ্রমাণিত হবে যে, বর্তমান প্রচলিত 'এসলাম'-এর যারা অনুসারী তারাও প্রকৃত মোসলেম নয়, প্রকৃত মো'মেনও নয়। আসুন, একটি চূড়ান্ত সত্যের উদ্ঘাটনে যাত্রা শুরু কোরি।

১. ফলেন পরিচয়তেঃ

আপনি একটি গাছের চারা রোপণ কোরলেন। আপনি সবাইকে বোললেন যে, এটি একটি আমগাছ। কিন্তু সবাই বোলল, এটা আমগাছ না, কাঁঠাল গাছ। আপনি কিছুতেই মানতে রাজি নন। এই নিয়ে তর্ক বিতর্ক চোলতে লাগলো। এই তর্কের সমাপ্তি কবে হবে? হ্যাঁ, যেদিন গাছটিতে ফল ধোরবে সেদিনই সব কথা শেষ হোয়ে যাবে। কয়েক বছর পরে দেখা গেল, আপনার গাছটিতে একটি কাঁঠাল ধোরে আছে।

আল্লাহ তাঁর নাযেলকৃত জীবনব্যবস্থা বা দীনটির নাম দিয়েছেন 'এসলাম'। এসলাম আরবি শব্দ, এর বাংলা হোচ্ছে 'শান্তি'। সুতরাং এসলাম যদি গাছ হয় তার ফল হোচ্ছে শান্তি। আজ ১৬০ কোটির এই মোসলেম দাবিদার জনসংখ্যা কতটা শান্তিতে দিনাতিপাত কোরছে তা নিশ্চয়ই আপনাকে বোলে দিতে হবে না। যারা দুনিয়ার কিছুমাত্র খবরও রাখেন তাদের বোলতে হবে না যে, এই পৃথিবীতে মোসলেম বোলে পরিচিত ১৬০ কোটির এই জনসংখ্যাটির কী করুণ অবস্থা। পৃথিবীর অন্য সব জাতিগুলি এই জনসংখ্যাকে পৃথিবীর সর্বত্র ও সর্বক্ষেত্রে পরাজিত কোরছে, হত্যা কোরছে, অপমানিত কোরছে, লাঞ্ছিত কোরছে, তাদের মসজিদগুলি ভেংগে চুরমার কোরে দিচ্ছে

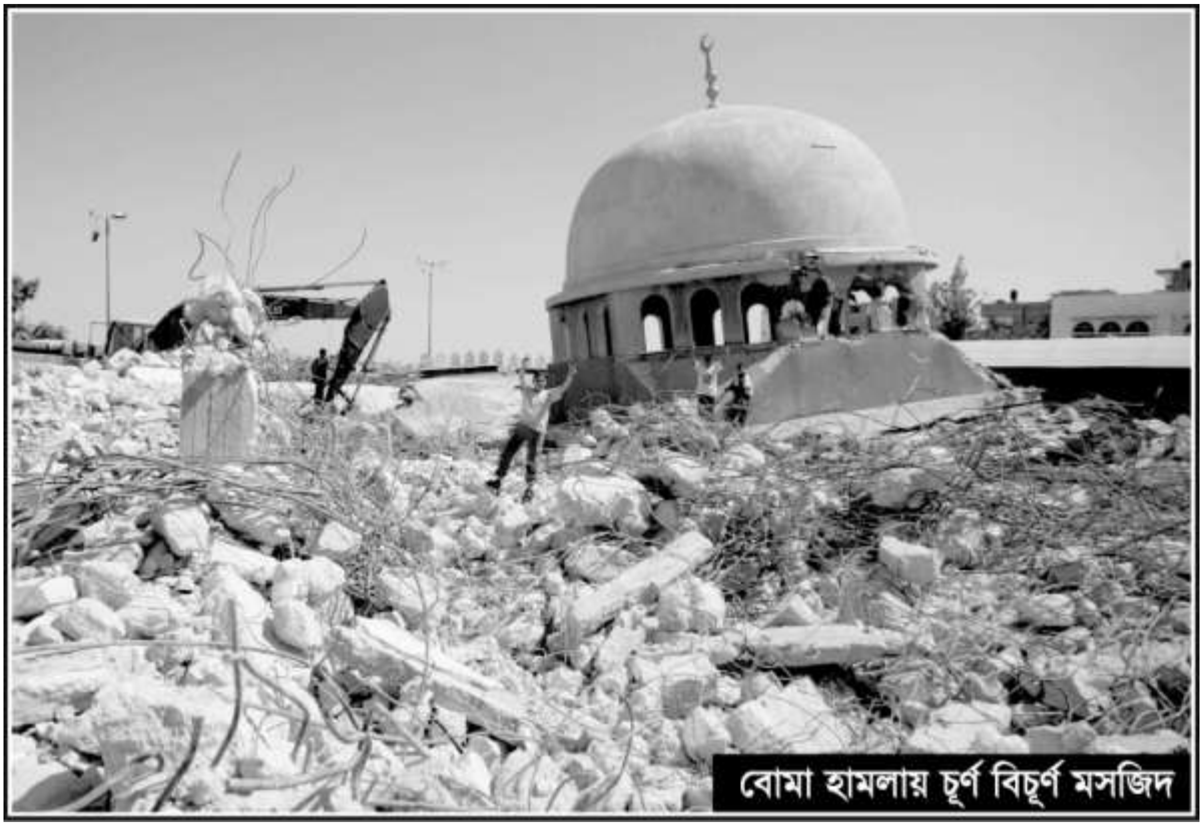

বোমা হামলায় চূর্ণ বিচূর্ণ মসজিদ

অথবা সেগুলিকে অফিস বা ক্লাবে পরিণত কোরছে। এই জাতির মা-বোনদের তারা ধর্ষণ কোরে হত্যা কোরছে। কয়েক শতাব্দী আগে আল্লাহ ইউরোপের খ্রিস্টান রাষ্ট্রগুলিকে দিয়ে মোসলেম বোলে পরিচিত এই জাতিটিকে সামরিকভাবে পরাজিত কোরে তাদের গোলাম, দাস বানিয়ে দিয়েছেন। এটা ছিল আল্লাহর গজব। এই সামরিক পরাজয়ের সময় তারা লক্ষ লক্ষ মোসলেমকে ট্যাংকের তলায় পিষে, জীবন্ত কবর দিয়ে, পুড়িয়ে, গুলি কোরে, বেয়নেট, তলোয়ার দিয়ে হত্যা কোরেছে, তাদের বাড়ি-ঘর আগুনে জ্বালিয়ে দিয়েছে, লক্ষ লক্ষ মোসলেম মা-বোনদের ধরে নিয়ে ইউরোপের, আফ্রিকার বেশ্যালয়ে বিক্রি কোরেছে। আল্লাহর ঐ গযব আজ পর্যন্ত চোলছে। বর্তমানে খ্রিস্টানরা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে, ইউরোপের বসনিয়া-হারযেগোভিনায়, আলবেনিয়া, কসভো, চেকোশ্লাভাকিয়া, চেচনিয়ায়, ইউরোপের বাইরে ইরাকে, আফগানিস্তানে, সুদানে, ইরিত্রিয়ায়, ফিলিপাইনে, ইহুদিরা প্যালেস্টাইন, লেবাননে; হিন্দুরা ভারতের সর্বত্র, বিশেষ কোরে কাশ্মীরে; বৌদ্ধরা আরাকানে, থাইল্যান্ডে, ভিয়েতনামে, কামপুচিয়ায়, চীনের জিংজিয়াং-এ (সিংকিয়াং) মোসলেম নামধারী এই জাতিটাকে যে যেভাবে পারছে পদদলিত, পরাজিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত কোরছে। মোসলেম হিসাবে মাথা তুলতে গেলেই তাদের গ্রেফতার, কারাবদ্ধ কোরছে, পাশবিক

নির্যাতন কোরছে, ফাঁসি দিচ্ছে। বসনিয়ায় খ্রিস্টান চেক-স্লাভরা হাজার হাজার মোসলেম গণহত্যার পর দুই লক্ষ মোসলেম মেয়েকে ধর্ষণ কোরে গর্ভবতী করে এবং ঐ গর্ভবতী মেয়েরা খ্রিস্টানদের ঔরসজাত ঐ ভ্রূণ যাতে গর্ভপাত না কোরতে পারে সেজন্য ঐ মেয়েদের তারা আটকিয়ে রাখে। পরে ঐ দুই লক্ষ মোসলেম মেয়ে খ্রিস্টানদের ঔরসজাত সন্তান জন্ম দিতে বাধ্য হয়। মানব জাতির ইতিহাসে কোনো জাতি এমনভাবে অপমানিত হয় নাই। যদি প্রশ্ন করা হয়,

পৃথিবীতে দৈনিক অন্য জাতির হাতে নিহত হোচ্ছে কোনো জাতি? নিজ পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি এমন কি জন্মভূমি থেকে ছিন্নমূল হোয়ে এখানে সেখানে পাহাড়ে জঙ্গলে নো ম্যনস ল্যান্ডে লাখে লাখে উদ্বাস্তু জীবন কাটাচ্ছে কারা? সেই শরণার্থী শিবিরে গিয়ে আবার যাদেরকে গণহত্যা ও মেয়েদেরকে গণধর্ষণ করা হোচ্ছে তারা কোনো হতভাগা জাতির সদস্য? এ সবকটি প্রশ্নের উত্তরে প্রত্যেকেই একবাক্যে বোলবেন মোসলেম নামক এই জাতি। অথচ বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে পরাজিত, অপমানিত, লাঞ্ছিত জাতি হোয়েও মোসলেম নামে পরিচিত এই জাতির অপমানবোধ নেই, তারা নির্বিকারভাবে খাচ্ছে-দাচ্ছে, চাকরি কোরছে, ব্যবসা-বাণিজ্য কোরছে, যেন কিছুই হয় নাই, সব স্বাভাবিক আছে; ঐ পরাজয়, অপমান, লাঞ্ছনাই যেন তাদের জন্য স্বাভাবিক। এতো গেল বহিঃশত্রুর হাতে মার খাওয়ার চিত্র, নিজেদের মধ্যেও এই জাতিটি ধর্মীয় মতবাদ, রাজনৈতিক

মতবাদ নিয়ে নিরন্তর হানাহানি, মারামারি, যুদ্ধ, রক্তপাতে লিপ্ত, ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অশিক্ষা-কুশিক্ষা, কুসংস্কার, হীনমন্যতা ইত্যাদিতে জর্জরিত।

এই হোচ্ছে বর্তমানের 'এসলাম' নামক বৃক্ষের উৎপন্ন করা বিষময় ফল। সুতরাং যে দীন অনুসরণ কোরেও মানুষ এমন অন্যায় ও অশান্তির অগ্নিকুণ্ডে প্রজ্জ্বলিত হয়, সেটা কখনও আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থা হোতে পারে না। এর প্রমাণ ইতিহাস। শেষ নবী মোহাম্মদের (দ:) মাধ্যমে যে শেষ জীবন বিধান স্রষ্টা প্রেরণ কোরেছিলেন তা মানবজাতির একাংশ গ্রহণ ও সমষ্টিগত জীবনে কার্যকরী করার ফলে জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দু'টি অংশ অর্থাৎ নিরাপত্তা ও অর্থনীতিতে কী ফল হোয়েছিল তা ইতিহাস। নিরাপত্তার ক্ষেত্রে পূর্ণ নিরাপত্তা যাকে বলে তা প্রতিষ্ঠিত হোয়েছিল। মানুষ রাতে শোয়ার সময় ঘরের দরজা বন্ধ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব কোরত না, রাস্তায় ধনসম্পদ ফেলে রাখলেও তা পরে যেয়ে যথাস্থানে পাওয়া যেত, চুরি, ডাকাতি, হত্যা, রাহাজানি প্রায় নির্মূল হোয়ে গিয়েছিল, আদালতে মাসের পর মাস কোনো অপরাধ সংক্রান্ত মামলা আসতো না; আর অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রতিটি মানুষ স্বচ্ছল হোয়ে গিয়েছিল। এই স্বচ্ছলতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, মানুষ যাকাত ও সদকা দেওয়ার জন্য টাকা পয়সা নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতো কিন্তু সেই টাকা গ্রহণ করার মতো লোক পাওয়া যেত না। শহরে নগরে লোক না পেয়ে মানুষ মরুভূমির অভ্যন্তরে যাকাত দেওয়ার জন্য ঘুরে বেড়াতো। এটি ইতিহাস। এক কথায় আল্লাহর দেওয়া সত্যিকার জীবনব্যবস্থার ফল হবে ন্যায়, সুবিচার, গৌরব, সম্মান, শ্রেষ্ঠত্ব, উন্নতি, প্রগতি, ঐক্য-- এক কথায় শান্তি আর শান্তি। এজন্যই এই দীনের নাম এসলাম।

সুতরাং বর্তমানে যেটাকে এসলাম হিসাবে সর্বত্র মানা হোচ্ছে এবং শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হোচ্ছে সেটাকে এসলাম হিসাবে বিশ্বাস করা আর তিক্ত মাকাল ফলকে সুমিষ্ট আম বোলে বিশ্বাস করার মতই নির্বুদ্ধিতা। অথচ এই বিকৃত বিপরীতমুখী এসলামটিকেই ধর্মব্যবসায়ী আলেম, মোল্লা, পীর, মাশায়েখ শ্রেণী বিক্রি কোরে খাচ্ছে। এটা আল্লাহর দেওয়া এসলাম নয় তাই এর অনুসারীরাও মোসলেম নয়।

২. দীনের ভিত্তিই যখন অদৃশ্য।

আদম (আ:) থেকে মোহাম্মদ (দ:) পর্যন্ত প্রত্যেক নবীর সময় এই দীনের মূলমন্ত্র রাখা হোয়েছে- একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কোনো এলাহ নেই (লা এলাহা এল্লাল্লাহ) - এবং পরে যোগ হোয়েছে তদানীন্তন নবীর নাম। এই কলেমার মূলমন্ত্রে কখনো এই এলাহ শব্দ ছাড়া অন্য কোনো শব্দ স্রষ্টা ব্যবহার করেন নি। এটা এই জন্য যে তিনি 'একমাত্র' হুকুমদাতা, একমাত্র সার্বভৌমত্বের মালিক যার আদেশ নিষেধ ছাড়া আর কারো আদেশ নিষেধ গ্রাহ্য নয়, যার বিধান এবং নির্দেশ জীবনের

প্রচলিত এসলামের অবস্থা এই বাড়িটির মত। তওহীদ অর্থাৎ আল্লাহর সার্বভৌমত্ব হোচ্ছে এই দীনের ভিত্তি, খুঁটি হোচ্ছে সালাহ আর ছাদ হোচ্ছে জেহাদ (হাদীস)। আজ এসলাম নামক ঘরের ভিত্তি ভেঙ্গে চুরমার হোয়ে গেছে, ছাদ ধ্বসে পড়েছে, কেবল ভগ্নদশায় দাঁড়িয়ে আছে দুর্বল কিছু খুঁটি। এই ঘরটি যেমন মানুষকে নিরাপত্তা দিতে পারবে না, তেমনি বর্তমান এসলামও মানুষকে শান্তি দিতে পারছে না।

প্রতি ক্ষেত্রে, প্রতি ব্যাপারে অলংঘনীয়। কলেমার এই ঘোষণামতে কেউ যদি তাঁর কতগুলি আদেশ নির্দেশ মেনে নিলো কিন্তু অন্য কতকগুলি অস্বীকার কোরল, তবে তিনি আর তার 'একমাত্র' এলাহ

রোইলেন না। সংক্ষেপে এই দীনের ভিত্তি তওহীদের মর্মার্থ হোচ্ছে আমি জীবনের প্রতিটি বিষয়ে যেখানেই আল্লাহ ও তাঁর রসুলের কোনো বক্তব্য আছে সেটা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আইন-কানুন, দণ্ডবিধি যে বিভাগেই হোক না কেন, সেই ব্যাপারে আমি আর কারও কোনো বক্তব্য, নির্দেশ মানি না। যে বিষয়ে আল্লাহ অথবা তাঁর রসুলের কোনো বক্তব্য নেই সে বিষয়ে আমরা স্বাধীনভাবে যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি। এর ঠিক বিপরীত হোচ্ছে শেরক। সেটা হোচ্ছে, জীবনের যেখানে, যে বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের কোনো বক্তব্য বা বিধান আছে, সেখানে তাদের সেই বিধানকে অমান্য কোরে অন্য কারও তৈরি বিধান মানা। আজ এই শেরকে পুরো মানবজাতি আকণ্ঠ নিমজ্জিত হোয়ে আছে। অথচ যে বা যারা আল্লাহর তওহীদে থাকবেনা, যারা তাদের ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত জীবনের যে কোনো একটি ভাগে, অঙ্গনে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বা নিজেদের তৈরি আইন-কানুন, রীতি-নীতি গ্রহণ বা প্রয়োগ কোরবে তাকে বা তাদের আল্লাহ মাফ না করার অঙ্গীকার কোরেছেন (সুরা নেসা ৪৮)। তাদের কোনো আমলই আল্লাহ গ্রহণ কোরবেন না।

আল্লাহর এই সুস্পষ্ট ঘোষণা সত্ত্বেও অনেকে বোলতে পারেন আমরা কিভাবে কাফের মোশরেক হোলাম, আমরা তো নামাজ পড়ি, রোজা রাখি, হজ্ব কোরি। তাদের এই মনোভাবের জবাবে বোলতে চাই মক্কার কাফের মোশরেকরা রসুল (স:) কে এই কথাই বলতো। রসুলাল্লাহর সমসাময়িক সময়ের যাদেরকে আমরা কাফের মোশরেক বোলে জানি, অর্থাৎ আবু জেহেল, আবু লাহাব, ওতবা, শায়েবা, তাদের ধর্মীয় অবস্থা বর্তমান মোসলেম দাবীদারদের থেকে মোটেই আলাদা নয়। আমাদের মাঝে একটা ভুল ধারণা আছে যে তারা আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখতো না, আল্লাহকে আল্লাহ বোলে মানতো না ইত্যাদি ইত্যাদি। আল্লাহর কোর'আন এবং ইতিহাস কিন্তু বলছে অন্য কথা। ঐ আরবরা আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা বোলে, পালনকারী বোলে বিশ্বাস কোরত, নামাজ পড়তো, কাবা শরীফকে আল্লাহর ঘর বোলে বিশ্বাস কোরত, ঐ কাবাকে কেন্দ্র করে বাৎসরিক হজ্ব কোরত, কোরবানী কোরত, রোজা রাখতো, আল্লাহর নামে কসম কোরত, আমাদের মতই এব্রাহীম (আ:)-তারা জাতির পিতা বোলে বিশ্বাস কোরত, এব্রাহীম (আ:)-কে তাদের নবী হিসাবে মানতো। শুধু তাই নয়, প্রয়োজনীয় দলিল, বিয়ে-শাদির কাবিন ইত্যাদি সমস্ত কিছু লেখার আগে আল্লাহর নাম লিখতো। তারা লিখতো বেস্মেকা আল্লাহুম্মা, অর্থাৎ তোমার নাম

নিয়ে (আরম্ভ কোরছি) হে আল্লাহ। আরবের মোশরেকরা আল্লাহয় বিশ্বাসী ছিলো এ কথায় সাক্ষী স্বয়ং আল্লাহ। কোর'আনে তিনি তাঁর রসুলকে বোলছেন- তুমি যদি তাদের (আরবের মোশরেক, কাফের অধিবাসীদের) জিজ্ঞাসা করো, আসমান ও যমীন কে সৃষ্টি কোরেছেন? তবে তারা অবশ্যই জবাব দেবে- সেই সর্বশক্তিমান, মহাজ্ঞানী (আল্লাহ) (কোর'আন- সুরা যুখরুফ- ৯)। এমন আয়াত আরও আছে। ইতিহাস ও আল্লাহর সাক্ষ্য, দু'টো থেকেই দেখা যায় যে, যে মোশরেকদের মধ্যে আল্লাহর রসুল প্রেরিত হোলেন তারা আল্লাহকে গভীরভাবে বিশ্বাস কোরত। তারা হাবল লা'ত, মানাতের পূজা কোরত ঠিকই কিন্তু ওগুলোকে তারা আল্লাহ বোলে বিশ্বাস কোরত না, ওগুলোকে স্রষ্টা বোলেও মানতো না। তারা বিশ্বাস কোরত যে হাবল, লা'ত, মানাত, ওজ্জা এরা দেব-দেবী, যারা ওগুলোকে মানবে, পূজা কোরবে তাদের জন্য ঐ দেব-দেবীরা সেই আল্লাহর কাছেই সুপারিশ কোরবে (কোর'আন- সুরা ইউনুস- ১৮, সুরা যুমার ৩)। ঠিক যেমন আজকে পীরদের ব্যাপারে মানুষ ধারণা কোরে থাকে।

আজকে মোসলেম নামক এই জাতি যে অবস্থায় আছে তাদের চাইতে কোনো অংশে কম নয়। এরাও আল্লাহ বিশ্বাস করে, নিজেদেরকে মোহাম্মদ (দ:) এর উম্মাহ বোলে বিশ্বাস করে, হজ্ব করে, কোরবানী করে, খাতনা করে। মক্কার ঐ লোকগুলো ব্যক্তি জীবনে এত কিছু করার পরও তাদেরকে আল্লাহ কাফের মোশরেক বোললেন কেন? কারণ তারা আল্লাহর তওহীদ মানতো না, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মানতো না, তাদের জাতীয়, সমষ্টিগত জীবন পরিচালিত কোরত নিজেদের সমাজপতিদের তৈরি করা আইন বিধান দ্বারা। এজন্য আল্লাহর রসুল এসে প্রথমেই তাদেরকে অন্য কোনো কিছু না বোলে কেবলমাত্র তওহীদ মেনে নেওয়ার আহ্বান জানালেন এবং প্রচণ্ড বাধা ও বিরোধিতা সত্ত্বেও নিরবচ্ছিন্নভাবে কালেমার বালাগ চালিয়ে গেলেন। নবুয়্যতের প্রথম ১৩ বছর তিনি অন্য কোনো কিছুর দিকে আহ্বান করেন নি। তিনি বলেন নি যে, তোমাদের হজ্ব হয় না, হজ্ব ঠিক করে নাও, নামাজ হয় না নামাজ ঠিক করে নাও, কোরবানী হয় না ইত্যাদি ঠিক করে নাও। এমন কি সমাজে তাঁর চোখের সামনে যে অবিচার হোত তিনি সেগুলোরও কোনো প্রতিবাদ করেন নি। শুধু মাত্র নিরবচ্ছিন্নভাবে তওহীদের ডাক দিয়ে গেছেন, কারণ তিনি জানতেন তওহীদ অর্থাৎ আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা হলে সমাজ থেকে সর্বরকম অন্যায়, অবিচার অর্থাৎ অশান্তি দূর হয়ে যাবে।

বর্তমান দুনিয়াতে যে এসলামটি চালু আছে তাতে এই তওহীদ নেই, সর্বত্র আল্লাহকে কেবল উপাস্য বা মা'বুদ হিসাবে মানা হোচ্ছে, কিন্তু এলাহ বা সার্বভৌমত্বের আসনে আল্লাহ নেই। তওহীদহীন এসলাম মানেই প্রাণহীন, আত্মাহীন জড়বস্তু। মানুষ নিজেই এখন নিজের জীবনব্যবস্থা তৈরি করে সেই মোতাবেক জীবন চালাচ্ছে, মানুষ নিজেই এলাহ অর্থাৎ বিধাতার আসনে আসীন। মানুষের তৈরি জীবন-ব্যবস্থাগুলিকেই (দীন) মানবজীবনের সকল সমস্যার যুগোপযোগী সমাধান হিসাবে মনে করা হোচ্ছে যদিও সেগুলির সবই মানুষকে শান্তি দিতে চরমভাবে ব্যর্থ। মানুষের এলাহর আসন থেকে আল্লাহকে সোরিয়ে (Dethroning) দিয়ে সেখানে পাশ্চাত্য 'সভ্যতা'-কে অর্থাৎ মানুষকে বোসিয়ে (Replacement) যে ধর্ম পালন করা হোচ্ছে তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা আমাদের বৃহত্তর ও সমষ্টিগত জীবনে গায়রুল্লাহর সার্বভৌমত্বকে স্বীকার ও গ্রহণ কোরে নিয়ে শুধুমাত্র ব্যক্তিজীবনের সার্বভৌমত্বটুকু আমরা আল্লাহর জন্য রেখেছি। সেই জাল্লে-জালাল, আযিজুল জব্বার, স্রষ্টা ভিক্ষুক নন যে তিনি এই ক্ষুদ্র তওহীদ গ্রহণ কোরবেন। তাছাড়া ওটা তওহীদই নয়, ওটা শেরক ও কুফর। পরিষ্কার কোরে উপস্থাপন কোরতে গেলে এমনি কোরে কোরতে হয়:

ব্যবস্থা (System)	সার্বভৌমত্ব (Sovereignty)
রাজতন্ত্র	রাজা, বাদশাহ, সম্রাট
গণতন্ত্র	জনসাধারণের সংখ্যাগরিষ্ঠতার
সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ	জনসাধারণের একটি বিশেষ শ্রেণী
ফ্যাসিবাদ	এক নায়ক, ডিকটেটর
এসলাম	আল্লাহ্ ।

এই বিন্যাসই এ কথা পরিষ্কার কোরে দিচ্ছে যে সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে কোনো আপোস সম্ভব নয়। ওপরের যে কোনো একটাকে গ্রহণ কোরতে হবে। আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে বাদ দিয়ে অন্য যে কোনটি স্বীকার, গ্রহণ কোরে নিলে সে আর মোসলেম বা মো'মেন থাকতে পারে না। কোনো লোক

যদি ব্যক্তিগত জীবনে আল্লাহ বিশ্বাসী এবং জাতীয় জীবনের আল্লাহ ছাড়া ওপরের যে কোনটায় বিশ্বাসী হয় তবে সে মোশরেক। আর উভয় জীবনেই কোনো লোক যদি আল্লাহ ছাড়া ঐগুলির যে কোনটায় বিশ্বাস করে তবে সে কাফের। তাই এই মোসলেম দাবিদার জনসংখ্যাটি তাদের জাতীয় জীবনে কেউ গণতন্ত্র, কেউ সমাজতন্ত্র, কেউ রাজতন্ত্র, কেউ একনায়কতন্ত্র ইত্যাদি তন্ত্র-মন্ত্র, ism, cracy ইত্যাদি মেনে চোলছে অর্থাৎ আল্লাহর সার্বভৌমত্ব বাদ দিয়ে ঐ সমস্ত তন্ত্রমন্ত্রের সার্বভৌমত্ব মানছে, এভাবে তারাও কার্যতঃ (Defacto) মোশরেক ও কাফেরে পরিণত হোয়েছে।

৩. আল্লাহর ওয়াদা: মো'মেনরা দুনিয়ার কর্তৃত্ব পাবে

মহান আল্লাহ আমাদেরকে অর্থাৎ যারা নিজেদেরকে মো'মেন মোসলেম বোলে দাবি কোরে থাকে তাদেরকে ওয়াদা দিচ্ছেন, "তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও আমলে সালেহ করে, আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসনকর্তৃত্ব দান কোরবেন।

আজ এই জাতির অবস্থা আল্লাহর ওয়াদার ঠিক বিপরীত। তারা সারা পৃথিবীতে অন্য সকল জাতির অপমান ও ঘৃণার পাত্র। বহু দেশে তাদের ছেলেদেরকে গ্রেফতার কোরে নিয়ে নির্মম নির্যাতন করা হয়, মেয়েদেরকে ধর্ষণ করা হয়। এই অবস্থা প্রমাণ করে যে তারা আল্লাহর দৃষ্টিতে মো'মেন নেই।

যেমন তিনি শাসনকর্তৃত্ব দান কোরেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় কোরবেন তাদের দীনকে, যা তিনি তাদের জন্যে পছন্দ কোরেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তা দান কোরবেন (সুরা নূর ৫৫)।" এই আয়াতে মো'মেনদের প্রতি আল্লাহর ওয়াদা হোচ্ছে: (১) তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে খেলাফত, কর্তৃত্ব (Power) দান করা হবে। (২) তাদের দীনকে সু-প্রতিষ্ঠিত করা হবে। (৩) ভয়-ভীতির পরিবর্তে নিরাপত্তা (Security & Peace) প্রদান করা হবে। এখন বর্তমানের এই মো'মেনের দাবিদার জনসংখ্যার প্রতি আমার প্রশ্ন, আপনাদের হাতে কি এই পৃথিবীর কর্তৃত্ব আছে? রূঢ় বাস্তবতা হোচ্ছে এই যে, পৃথিবীর কর্তৃত্ব তো দূরের কথা আপনারা পৃথিবীর সর্বত্র অন্য সব জাতি দ্বারা পরাজিত, অপমানিত, অবহেলিত, নিগৃহীত এবং প্রতিটি জাতির লাথি খাচ্ছেন, সব জাতি আপনাদেরকে ঘৃণার চোখে দেখছে, আপনাদের রাষ্ট্রগুলি আক্রমণ কোরে দখল কোরে নিচ্ছে (যদিও প্রকৃত এসলামে ভৌগোলিক জাতি রাষ্ট্রের কোনো ধারণা নেই, সুতরাং তা শেরক)। ইহুদি খ্রিস্টান 'সভ্যতা' তথা দাজ্জালের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত পুরো মোসলেম নামক এই জাতি, আরব অনারব নির্বিশেষে সকলে ভয়ে তাদের পায়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে। মো'মেন এর প্রতি আল্লাহর উল্লেখিত অঙ্গীকার থেকে বাস্তবতার দূরত্ব লক্ষ যোজন। সুতরাং যদি আল্লাহ সত্যি অঙ্গীকার রক্ষাকারী হোয়ে থাকেন, তাহোলে আপনারা মো'মেন হোতে পারেন না এবং মো'মেন না হওয়ার মানেই মোশরেক এবং কাফের হওয়া। কারণ আল্লাহ মানুষ সৃষ্টিই কোরেছেন দুই রকম: মো'মেন ও কাফের (সুরা তাগাবুন ২)। আর যদি আপনাদের দাবি অনুযায়ী আপনারা মো'মেন ও মোসলেম হোয়ে থাকেন, তাহোলে অনিবার্যভাবে আল্লাহই ওয়াদা খেলাফকারী সাব্যস্ত হন (নাউযুবেল্লাহ)। কিন্তু আল্লাহর ওয়াদা যে অনিবার্য সত্য তার প্রমাণ- ইতিহাস এবং আল্লাহর ঐ কথা, "যেমন খেলাফত দান কোরেছিলাম তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে"। একটি নিরক্ষর, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, বাইরের দুনিয়া সম্পর্কে অজ্ঞ এবং বিশ্বের মধ্যে দরিদ্রতম আরব জাতি যখন আখেরী নবী মোহাম্মদ (দ:) এর অনুসারী হোয়ে মো'মেনে রূপান্তরিত হোলেন, আল্লাহ ছাড়া সকল কর্তৃত্ব, সকল সার্বভৌমত্বের দাবিদারদের অস্বীকার কোরলেন, ওয়াদা রক্ষাকারী আল্লাহ তাদেরকে পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাধর জাতি বানিয়ে দিলেন, তাদের সামনে সারা দুনিয়া সভয়-সম্ভ্রমে লুটিয়ে পড়লো। জ্ঞানে বিজ্ঞানে, শিক্ষায়, নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে, সামরিক শক্তিতে এক কথায় সর্বদিক দিয়ে পৃথিবীর সকল জাতির শিক্ষকের আসনে আসীন হোয়েছিল। আর আজ ঐ অবস্থার ঠিক বিপরীত। **এখন**

আপনারাই বোলুন কোনটি সত্য, আপনাদের দাবি না আল্লাহর ওয়াদা? আপনাদের মো'মেন হওয়ার দাবির অর্থই হোচ্ছে আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ কোরেছেন অথবা তিনি তা পূরণ কোরতে অক্ষম (নাউযুবেল্লাহ)। নতুবা এই জনসংখ্যা মো'মেন নয়, মোসলেম নয়, অন্য কোনো সিদ্ধান্ত অসম্ভব।

৪. মোসলেম দাবিদার জনসংখ্যা কর্তৃক কাফেরের সংজ্ঞাপূরণ

আল্লাহ বোলছেন, 'আল্লাহ যা নাযেল কোরেছেন সে অনুযায়ী যারা হুকুম (বিচার ফায়সালা) করে না তারা কাফের, জালেম, ফাসেক (সুরা মায়েদা ৪৪, ৪৫, ৪৭)। এই আয়াতগুলিতে 'হুকুম' শব্দটি দিয়ে কেবল আদালতের বিচারকার্যই বোঝায় না, ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক অর্থাৎ সামগ্রিক জীবন তাঁর নাযেল করা বিধান অর্থাৎ কোর'আন (এবং সুন্নাহ) মোতাবেক পরিচালনা করাকেও বোঝায়। মো'মেন মোসলেম হবার দাবিদারগণ এখন আর একটি সু-সংহত উম্মাহরূপে নেই, তারা ভৌগোলিকভাবে পঞ্চাশটিরও বেশি জাতিরাষ্ট্রে বিভক্ত হোয়ে ইউরোপীয় খ্রিস্টান, ইহুদি ও পৌত্তলিকদের দাসে পরিণত হোয়েছে, তাই তারা তাদের সামষ্টিক কার্যাবলী আল্লাহর নাযেলকৃত বিধান দিয়ে ফায়সালা করে না। ফলশ্রুতিতে তারা ফাসেক (অবাধ্য), জালেম (অন্যায়কারী) এবং কাফেরে (প্রত্যাখ্যানকারী) পরিণত হোয়েছে। আল্লাহ প্রদত্ত বিধানগুলিকে অপাংক্তেয় কোরে রেখে তারা ইহুদি-খ্রিস্টানদের আইন, কানুনগুলি নিজেদের দেশে প্রবর্তন কোরে তা দিয়ে সামষ্টিক কার্যাবলী পরিচালনা কোরছে।

পৃথিবীর কোথাও, একটি রাষ্ট্রেও আল্লাহর বিধান দিয়ে শাসনকার্য করা হয় না অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্য করা হয় না। একমাত্র ব্যতিক্রম পশ্চিম এশিয়ার সৌদী আরব, সেখানে কিছু অপরাধের সাজা শরিয়াহ্র আইন দিয়ে করা হয়। তবে যতদূর জানা যায় সেখানেও আইন সকলের জন্য সমান নয় এবং তাদের রাজা-বাদশাহ-আমীররা পশ্চিমা সভ্যতা দাজ্জালের নিকৃষ্ট গোলামীতে নিয়োজিত এবং দাজ্জালের কথায় ওঠে আর বসে। মো'মেন হওয়ার জন্য যে পূর্বশর্ত আল্লাহ দিয়েছেন সেই শর্ত তাদের মধ্যেও অনুপস্থিত।

৫. কাফেরদের কোনো রক্ষাকারী নাই, কোনো অভিভাবক নাই

আল্লাহ তাঁর কোর'আনে বোলেছেন, "কাফেরদের সাথে তোমাদের যুদ্ধ হোলে অবশ্যই তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন কোরবে (অর্থাৎ পলায়ন কোরবে বা পরাজিত হবে)।" এর কারণ হিসাবে তিনি বোলছেন, কাফেরদের কোনো ওয়ালী (অভিভাবক বা সাহায্যকারী) নেই, কেননা আল্লাহ নিজেই ওয়ালী হিসাবে মো'মেনদের পক্ষে থাকবেন। যখনই এবং যতবারই মো'মেন ও কাফেরদের মধ্যে সংঘর্ষ হবে ততবারই এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে অর্থাৎ মো'মেনরা বিজয়ী হবেন। এ কথা আল্লাহ পরের আয়াতেই জানিয়ে দিয়েছেন, "এটি তাঁর সুন্নাহ (নীতি, রীতি) যা পূর্ব থেকে চোলে আসছে এবং যা অপরিবর্তনীয়" (সুরা ফাতাহ ২৩)। এই উম্মাহর প্রথম ৬০-৭০ বছরের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত কোরলেই আমরা আল্লাহ সুন্নাহর বাস্তবায়ন দেখতে পাই। নিত্য-উপবাসী, অস্ত্র-শস্ত্রে দুর্বল, শিক্ষা-দীক্ষাহীন মাত্র কয়েক হাজার মো'মেন তদানীন্তন বিশ্ব-শক্তিগুলির হাজার বছরের অহঙ্কার চুরমার কোরে দিয়েছিল, সেই সব বিশ্বশক্তিগুলির বহুগুণ বড়, বহু শক্তিশালী, উন্নত সমরাস্ত্রে সজ্জিত, সু-প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনীকে একই সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত ও বিধ্বস্ত কোরে দিয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, **মো'মেন হওয়ার দাবীদার এই জনসংখ্যাটি সেই**

সিরিয়ায় গত কয়েক বছর ধোরে ভ্রাতৃঘাতি সংঘাতে এভাবেই মোসলেম দাবিদারদের রক্ত প্রবাহিত হোচ্ছে। একই অবস্থা বিশ্বের বহু মোসলেম দেশে। আর কত রক্ত ঝরলে এই জাতি বুঝবে যে তারা মো'মেনের সংজ্ঞা থেকে বহিস্কৃত হোয়ে গেছে, আজ তারা আল্লাহর লানতের পাত্র?

একদা পরাজিত জাতিগুলির হাতেই একের পর এক যুদ্ধে পরাজিত হোচ্ছে এবং তাদের পদানত গোলামে পরিণত হোচ্ছে, তাদের দ্বারা শাসিত এবং শোষিত হোচ্ছে, লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত হোচ্ছে। অথচ এদের সংখ্যা এখন কোটি কোটি। গত হাজার বছরে এই মোসলেম জনসংখ্যাটির দ্বারা ঐ জাতিগুলির বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধেও বিজয় লাভের ঘটনা আমরা দেখি না; তাদের ধারাবাহিক পরাজয়ের চলমান উদাহরণ আফগানিস্তান ও ইরাক। এখন প্রশ্ন হোচ্ছে, মো'মেন জাতির বিজয়কে আল্লাহ তাঁর নিজের সুন্নাহ হিসাবে ঘোষণা কোরেছেন, এবং তাঁর কথা মতই যদি এই সুন্নাহ অপরিবর্তনীয় হোয়ে থাকে, তাহোলে অবধারিত সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় - "এই জনসংখ্যাটি তাঁর দৃষ্টিতে মো'মেন নয়, এবং তিনি তাদের অভিভাবক নেই, তাদের পক্ষেও নেই।"

সুতরাং ১৫০ কোটির এই জনসংখ্যাটি যারা নিজেদেরকে কেবল মো'মেন, মোসলেমই নয় একেবারে উম্মতে মোহাম্মদী বোলে দাবি কোরে থাকে তারা যে কার্যত কাফের ও মোশরেক তা আমার কথা নয়, এ কথা স্বয়ং আল্লাহর, আমি কেবলমাত্র সেদিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ কোরছি।

আল্লাহর ওয়াদা যে ধ্রু"ব সত্য তা ইতঃপূর্বেই বোলে এসেছি। আল্লাহ বোলছেন, "আল্লাহ মো'মেনদের রক্ষাকারী (ওয়ালী)" (সুরা বাকারা ২৫৭)। আবারও একই প্রশ্ন চোলে আসে, কোথায় ছিল তাঁর এই সুরার প্রতিশ্রুতি যখন তাঁর ঘোষিত 'মানবজাতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মাহ' (সুরা আল এমরান ১১০) সামরিকভাবে পরাজিত হোয়ে ইহুদি খ্রিস্টান 'সভ্যতা' অর্থাৎ দাজ্জালের দাসে পরিণত হোল, তাদেরকে নৃশংসভাবে হত্যা করা করা হোল, তাদের নারীদেরকে গণধর্ষণ করা হোল, তাদের বাড়িঘর ভস্মীভূত কোরে ফেলা হোল, তাদের মসজিদগুলি ধ্বংস করা হোল, অফিস ও নাচগানের আস্তানায় পরিণত করা হোল? এ হোচ্ছে অতীত, বর্তমান পরিস্থিতি এর চেয়ে ভয়াবহ। কোথায় থাকে আল্লাহর কর্তব্য বোলে ঘোষিত সেই মহাশক্তিশালী সাহায্য এবং অভেদ্য বর্ম যখন উম্মতে মোহাম্মদী হওয়ার দাবিদারদের দেশগুলির উপর বোমাবর্ষণ করা হয়, তারা অমানবিক নির্যাতনের শিকার হয়, তাদের যুবকদের ধোরে নিয়ে যাওয়া হয় লোকচক্ষুর অন্তরালের বন্দীশালায় যেখানে তাদের উপর করা হয় ঘৃণ্য অকথ্য নির্যাতন, তাদেরকে উলঙ্গ কোরে রাখা, নিজেদের মধ্যে বিকৃত যৌনাচারে বাধ্য করা থেকে শুরু কোরে আরও ভয়াবহ, বর্ণনার অযোগ্য অপমানকর কার্যে লিপ্ত হোতে বাধ্য করা হয়? যদি এই জনসংখ্যাটি মো'মেন ও

মোসলেম হোয়ে থাকে, তাহোলে বোলতেই হয় আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা কোরতে অসমর্থ (নাউযুবেল্লাহ)! সুতরাং এই জাতি মো'মেন নয় এবং এরা যেটাকে এসলাম বোলে মানছে সেটাও এসলাম নয়।

৬. মো'মেনদেরকে সাহায্য করা আল্লাহর কর্তব্য

আল্লাহ আমাদেরকে উদ্দেশ্য কোরে তাঁর কেতাবে বোলছেন, "তোমরা হীনবল হোয়ো না, সাহস হারিও না, তোমরাই বিজয়ী হবে, যদি তোমরা মো'মেন হও" (সুরা এমরান ১৩৯) । কিন্তু আমরা বিগত কয়েক শতাব্দীতে কোনো যুদ্ধেই বিজয়ী হোতে পারি নাই। সুতরাং আল্লাহর কালাম যদি সত্য হোয়ে থাকে, তাহোলে অবশ্যই আমাদের মো'মেন হওয়ার দাবি মিথ্যা? আর আমরা মো'মেন নই মানেই আমরা কাফের কিংবা মোশরেক কারণ আল্লাহ বলেছেন আমি মানুষকে সৃষ্টি কোরেছি তাদের মধ্যে হয় কেউ কাফের অথবা কেউ মো'মেন (সুরা তাগাবুন- ২) অর্থাৎ এর মাঝখানে থাকার কোনো সুযোগ নেই। এ জন্য পরিণতি হবে দু'টি হয় জান্নাত না হয় জাহান্নাম।

এভাবে দাজ্জালের আক্রমনে ধ্বংস হোয়ে যাচ্ছে এ জাতির শহর এবং মসজিদগুলো কিন্তু আল্লাহ ঐ সব এলাকার নামধারী মোসলেমদের সাহায্য করার জন্য একটি আঙ্গুলও তোলেন না কারণ আল্লাহর সাহায্য মো'মেনদের জন্য যারা আল্লাহর তওহীদ, সার্বভৌমত্ব প্রত্যাখ্যান কোরেছে তাদের জন্য নয়।

আল্লাহ নিশ্চয়তা দিচ্ছেন যে মো'মেনদেরকে সাহায্য করা তাঁর কর্তব্যস্বরূপ (হক্) (সূর রূম ৪৭)। কিন্তু যখন ইউরোপীয় খ্রিস্টান জাতিগুলি সামরিকভাবে 'মোসলেম' দুনিয়ার উপর আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে পদানত গোলামে পরিণত কোরল, যারা তখনও নিজেদেরকে অতি পরহেজগার মো'মেন, মোসলেম ও উম্মতে মোহাম্মদী বোলে বিশ্বাস কোরত, তখন কোথায় ছিল আল্লাহর সেই সাহায্য যা তিনি নিজের অবশ্যপালনীয় কর্তব্য (হক্) বোলে ঘোষণা দিয়েছেন?

তবে কি তিনি মিথ্যা আশ্বাস দিয়েছেন। না, এটা অচিন্ত্যনীয়। সুতরাং এর কারণ অতি সরল, তাঁর এই আশ্বাস মো'মেনদের জন্য, মোশরেক এবং কাফেরদের জন্য নয়। মোসলেম নামধারী হোলেও যারা কার্যত কাফের, তাদের সাহায্য করা নিশ্চয়ই আল্লাহর দায়িত্ব হোতে পারে না।

৭. এ জনসংখ্যা মো'মেনের সংজ্ঞা থেকে বহিষ্কৃত

মো'মেন শব্দটি এসেছে ঈমান অর্থাৎ বিশ্বাস থেকে। পবিত্র কোর'আনে আল্লাহ মো'মেনের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে, "তারাই মো'মেন যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের উপর ঈমান আনার পর আর কোনো সন্দেহ পোষণ করে না এবং জীবন ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করে। তারাই সত্যনিষ্ঠ্য (সুরা হুজরাত ১৫)। আল্লাহর দেয়া প্রকৃত মো'মেনের এই সংজ্ঞাটা ঠিক ভাবে বুঝতে গেলে আমাদের বুঝতে হবে "যারা আল্লাহর ওপর ঈমানে"র অর্থ শুধু আল্লাহর অস্তিত্বে ও একত্বের ওপর ঈমান নয়, তাঁর উলুহিয়াতের ওপর, সার্বভৌমত্বের ওপর (Sovereignty) ঈমান, লা এলাহা এল্লা আল্লাহ, অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোনো আদেশদাতা, হুকুমদাতা নেই এই বিশ্বাস করা অর্থাৎ তওহীদ। আল্লাহর দেয়া মো'মেনের এই সংজ্ঞার দ্বিতীয় ভাগ হোল প্রাণ ও সম্পদ দিয়ে জেহাদ করা। কি জন্য জেহাদ করা? আল্লাহর তওহীদের, সার্বভৌমত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত দীনটি যদি মানুষের জীবনে প্রতিষ্ঠা, কার্যকর না হয় তবে ওটা অর্থহীন। কাজেই আল্লাহর তওহীদ ভিত্তিক ঐ দীনুল হক, সত্য জীবন-ব্যবস্থাটা মানব জীবনে প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা, জেহাদ। এই দু'টি একত্রে প্রকৃত মো'মেনের সংজ্ঞা। এই দু'টি যার বা যাদের মধ্যে আছে, আল্লাহর দেয়া সংজ্ঞা মোতাবেক সে বা তারা প্রকৃত মো'মেন। এই সংজ্ঞায় আল্লাহ বলেন নাই যে, যে সালাহ পড়বে সে মো'মেন, বা যে রোজা রাখবে সে মো'মেন, বা যে হজ্ব কোরবে, বা অন্য যে কোনো পুণ্য, সওয়াবের কাজ কোরবে সে মো'মেন। এ সংজ্ঞায় শুধু আল্লাহ ছাড়া আর সমস্ত রকম প্রভুত্ব,

সার্বভৌমত্ব অস্বীকার ও আল্লাহর পথে জেহাদ। এর ঠিক বিপরীতে তিনি এ সতর্কবাণীও বোলেছেন যে এ **তওহীদে যে বা যারা থাকবে না, যারা তাদের ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত জীবনের যে কোনো একটি ভাগে, অঙ্গনে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বা নিজেদের তৈরি আইন-কানুন, রীতি-নীতি গ্রহণ বা প্রয়োগ কোরবে, আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে এলাহ বা সার্বভৌম হুকুমদাতা হিসাবে মানবে তারা শেরক কোরবে।** আর শেরক ক্ষমা না করার জন্য আল্লাহ অঙ্গীকারাবদ্ধ (কোর'আন- সুরা নেসা ৪৮)। মহান আল্লাহ মো'মেনের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন আজ সারা পৃথিবীতে সেই সংজ্ঞা মোতাবেক মো'মেন আছে? নেই। আর মো'মেন নয় মানেই কাফের, মোশরেক।

৮. জাতীয় বৈশিষ্ট্যের কেবল অনুপস্থিতি নয় একেবারে বিপরীতমুখিতা

কোর'আনের বহু স্থানে আল্লাহ মো'মেনদের বৈশিষ্ট্য বা চিহ্ন উল্লেখ কোরেছেন যা দিয়ে মো'মেনদেরকে চেনা যায়। যেমন তিনি মো'মেনদের সম্পর্কে বোলছেন, "তারা কাফেরদের প্রতি কঠিন, কঠোর এবং নিজেদের পরস্পরের প্রতি কোমলহৃদয়, দয়ার্দ্র (সুরা ফাতাহ ২৯)। এই আয়াতের আলোকে আমরা এই জনসংখ্যাটির দিকে তাকালে আল্লাহর বর্ণনার বিপরীত চিত্রই দেখতে পাই। আমরা দেখি **এই জনসংখ্যাটি কাফেরদের প্রতি নিখাদ ভালোবাসায় আপ্লুত, হীনমন্যতায়, ভয়ে, ত্রাসে তাদের পায়ে মাথা নত কোরে আছে, কাফেরদের প্রতি এতই অনুরক্ত যে তাদের ডাকে নিজ জাতির বিরুদ্ধেই যুদ্ধে লিপ্ত হোচ্ছে, সর্ববিষয়ে শত্রুপক্ষের আনুগত্য কোরছে, অতি সামান্য ব্যাপার নিয়ে, সেটি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এমন কি ধর্মীয় যা-ই হোক না কেন, নিজেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হোচ্ছে।** উদাহরণ: শিয়া সুন্নি, বিভিন্ন মাজহাব ও মারেফতী তরিকার অনুসারীদের মধ্যে বিবাদ, মারামারি এবং জাতিগতভাবে বিভিন্ন ভৌগোলিক রাষ্ট্রে বিভক্ত হোয়ে গত কয়েক শতাব্দী ধোরে রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ বিগ্রহ, গণহত্যা। **পাশ্চাত্য ইহুদি খ্রিস্টান 'সভ্যতার' প্রতি তারা এতটাই অনুগত ও গদগদচিত্ত যে তাদের মনরক্ষার জন্য নিজের দেশের মোসলেম নামধারী লক্ষ লক্ষ মানুষ গুলি কোরে, ট্যাংকের তলায় পিষে মারতেও তাদের আত্মা এতটুকুও কাঁপে না।** সুতরাং আল্লাহ যে বোললেন, মো'মেনরা কাফেরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের

পরস্পরের প্রতি বিগলিত হৃদয় (রুহামা), বাস্তবে এর কোনো নজির আমরা দেখি না। যেটা দেখি সেটা এর ঠিক বিপরীত, কারণ এ জনসংখ্যাও মো'মেনের ঠিক বিপরীত অর্থাৎ কাফের।

মোসলেম বিশ্বের নেতৃবৃন্দরা তাদের পাশ্চাত্য প্রভুদের দর্শন পেলেই ভক্তিতে গদগদচিত্ত হোয়ে যায়। সেই প্রভুদের মন যোগাতে স্বজাতি মোসলেমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, অর্থ-সম্পদ, ভূখণ্ড, আকাশ, সমুদ্র ব্যবহারের যাবতীয় সুযোগ সুবিধা প্রদান করে। এই প্রভুদের ইশারায় নিজ দেশের মোসলেমদের উপরও অত্যাচার, যুলুম-নির্যাতন চালাতে এতটুকুও হাত কাঁপে না এই শাসকদের।

৯. ভুল উদ্দেশ্যে ‘ধর্ম পালন’ করা হোচ্ছে

আল্লাহ যে উদ্দেশ্যে মানবজাতিকে এই দীন প্রদান কোরেছেন সেই উদ্দেশ্যই এখন বদলে গেছে। মানব সৃষ্টির প্রারম্ভের ঘটনাগুলির মধ্যে এসলামের প্রকৃত উদ্দেশ্য নিহিত রোয়েছে। আল্লাহ যখন পৃথিবীতে তাঁর খলিফা বা প্রতিনিধি হিসাবে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট একটি নতুন সৃষ্টি কোরতে চাইলেন, তখন সকল মালায়েক মানুষ সৃষ্টির বিরুদ্ধে যুক্তি উপস্থাপন কোরে বোলেছিল যে, ‘তোমার প্রশংসা ও গুণকীর্তণ করার জন্য আমরাই কি যথেষ্ট নই। তোমার এই সৃষ্টি পৃথিবীতে গিয়ে ফাসাদ (অন্যায়-অশান্তি) ও সাফাকুদ্দিমা (রক্তপাত, যুদ্ধ বিগ্রহ) কোরবে (সুরা বাকারা ৩০)। আল্লাহ তাদের এই মৃদু আপত্তি সত্ত্বেও আদম (আ:) কে সৃষ্টি কোরলেন। এরপর আল্লাহ তাঁর নিজের রুহ আদমের (আ:) ভিতরে ফুঁকে দিলেন এবং সকল মালায়েককে আদমের খেদমতে নিয়োজিত কোরলেন। প্রত্যেকেই তারা আদমকে (আ:) সেজদা করার মাধ্যমে আল্লাহর এই হুকুমের আনুগত্য কোরল এবং আদমের সেবায় নিয়োজিত হোল। কিন্তু এবলিস আল্লাহর এই হুকুমকে অন্যায্য ঘোষণা কোরে আদমকে সেজদা করা থেকে বিরত রোইল। ফলে আল্লাহ এবলিসকে তার সম্মানজনক অবস্থান থেকে বিতাড়িত (রাজীম) কোরলেন এবং অভিশাপ দিলেন। এবলিসও তখন আল্লাহর কাছে অবকাশ চেয়ে নিল এবং আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ দিলো যে সে বিভিন্ন প্রকার প্ররোচনা দিয়ে অধিকাংশ মানুষকেই আল্লাহর হেদায়াত (দিক নির্দেশনা), সরল পথ থেকে বিচ্যুত কোরে ফেলবে এবং প্রমাণ কোরবে যে মানুষ তার চাইতে নিকৃষ্ট সৃষ্টি। আল্লাহ জানিয়ে দিলেন যে, **তিনি প্রতি যুগে প্রতি জনপদে তাঁর নবী রসুল পাঠিয়ে হেদায়াহ ও দীন প্রেরণ কোরবেন। সেটাকে অনুসরণ কোরলেই তারা দুনিয়াতে একটি শান্তিময় ও প্রগতিশীল সমাজে বসবাস কোরতে পারবে। সেখানে থাকবে না কোনো ফাসাদ ও সাফাকুদ্দিমা অর্থাৎ অন্যায়, অশান্তি, যুলুম, রক্তপাত, যুদ্ধ, ক্রন্দন, হতাশা অর্থাৎ সৃষ্টির আদিতে মালায়েকরা মানবজাতিকে নিয়ে যে আশঙ্কা প্রকাশ কোরেছিল সেগুলি থাকবে না।** পাশাপাশি এবলিসের সঙ্গে করা চ্যালেঞ্জে আল্লাহ বিজয়ী হবেন। এজন্যই এসলাম শব্দের আক্ষরিক অর্থ হোচ্ছে শান্তি, এই নামকরণ আল্লাহ কোরেছেন এই জন্য যে, এই দীন, জীবন যাপন পদ্ধতি পৃথিবীর যে অংশে প্রতিষ্ঠিত হবে সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে, সেখানে অশান্তির লেশও থাকবে না। তাহোলে দেখা যাচ্ছে এই দীনের আকীদা বা উদ্দেশ্য হোল, সমস্ত জীবন ব্যবস্থার উপর একে

সংগ্রামের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা কোরে মানবজীবনের সর্ব অঙ্গন থেকে অন্যায়, অবিচার, যুদ্ধ, রক্তপাত অর্থাৎ ফাসাদ ও সাফাকুদ্দিমা দূর কোরে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। এই কাজ করাই হোচ্ছে আল্লাহর খেলাফত করা, আর খেলাফত করাই হোল প্রকৃত এবাদত। এখন মোসলেম দাবিদার জাতির সামনে থেকে দীনের এই উদ্দেশ্য হারিয়ে গেছে, তারা কেবল নামাজ, রোজা, হজ্ব করাকেই এবাদত হিসাবে ধোরে নিয়ে ভালো মানুষ হওয়ার জন্য জোর প্রচেষ্টা কোরছে। **পৃথিবীতে সেই এবাদত কোনো শান্তি আনতে পারছে কি পারছে না, তা ভেবেও দেখছে না, যেন সমাজের শান্তি-অশান্তির সঙ্গে এসলামের কোনো সম্পর্ক নেই, এবাদতেরও কোনো সম্পর্ক নেই।** অথচ আজ দীনের উদ্দেশ্য করা হোয়েছে আখেরাতের পুঁজি হিসাবে সওয়াব অর্জন করা যেন মিজানের পরিমাপে পুণ্যের পাল্লা ভারি হয় আর পদ্ধতি করা হোয়েছে উপাসনা। উদ্দেশ্য ভুল হোলে আর কোনো কিছুরই কোনো মানে থাকে না।

অথচ আল্লাহর দেওয়া এসলামের উদ্দেশ্য হোচ্ছে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা, এই দীন অনুসরণের অনিবার্য পরিণতি হোচ্ছে শান্তি এবং অনুসরণ না করার অনিবার্য পরিণতি হোচ্ছে অশান্তি। তাই যেখানে শান্তি নেই, আমরা বোলতে পারি সেখানে এসলাম নেই

১০. তোমরাই শ্রেষ্ঠজাতি (?)

আজকের মোসলেম নামক জাতিটির করুণ অবস্থা দেখে হয়তো অনেকেই ধারণা কোরতে পারবেন না যে এই জাতি এক সময় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি ছিল। পৃথিবীর অন্যান্য সব জাতি সভয় সম্ভ্রমসহ তাদের পানে তাকিয়ে থাকত। এই পৃথিবীর অর্ধেকেরও বেশী জায়গায় শাসন ক্ষমতা এই মোসলেম বোলে পরিচিত জাতির হাতে ছিল। তারা ঐ ক্ষমতাবলে ঐ বিশাল এলাকায় আল্লাহর দেয়া জীবন-বিধান প্রতিষ্ঠা কোরেছিল। তখন পৃথিবীতে সামরিক শক্তিতে, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, সভ্যতায়, নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে, Technology-তে, আর্থিক শক্তিতে এই জাতি সমস্ত পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ ছিল; তাদের সামনে দাঁড়াবার, তাদের প্রতিরোধ করার মতো কোনো শক্তি পৃথিবীতে ছিল না। হ্যাঁ, এটাই হোচ্ছে শ্রেষ্ঠ নবীর উম্মাহর জন্য দুনিয়াতে আল্লাহর প্রতিশ্রুত অবস্থান। আল্লাহ বোলছেন, এই জাতিকে লক্ষ্য কোরে বোলছেন, “তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি (উম্মাহ) কারণ মানব জাতির মধ্যে থেকে তোমাদিগকে উত্থিত করা হোয়েছে এই জন্য যে (তোমরা

মানুষকে) সৎকার্য করার আদেশ দান এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত কোরবে, আল্লাহকে বিশ্বাস কোরবে (কোর'আন- সুরা আলে-ইমরান ১১০)।" অর্থাৎ এই উম্মাহকে মানব জাতির মধ্য থেকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যসহ উত্থিত করা হোয়েছে মানুষকে অসৎ কাজ (আল্লাহর বিধানের বিরোধী কাজই হোল অসৎ কাজ) থেকে নিবৃত্ত করা ও সৎ কাজ (আল্লাহর বিধান অনুযায়ী কাজই হোচ্ছে শুধু সৎকাজ) করার আদেশ করার জন্য এবং এই কাজ করার জন্যই সে জাতি শ্রেষ্ঠ জাতি। আজ এই জাতির অতি পরহেজগার ও বুজুর্গ ব্যক্তিরা এবাদতের নাম কোরে আল্লাহর যেকরের নাম কোরে বা যে কোনো ছুতোয় বিরোধিতার ভয়ে, পার্থিব ক্ষতির ভয়ে, যে জন্য তাদের মানব জতির মধ্য থেকে উত্থিত করা সেই কাজ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন, সুতরাং তারা আর সেই শ্রেষ্ঠ জাতির মধ্যেই নেই এবং তাদের সব রকম এবাদত অর্থহীন। কারণ আল্লাহর রসুল সরাসরি বোলেছেন, 'মানুষ যখন সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করার দায়িত্বপালন ত্যাগ করে তখন তার কোনো আমল আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না (হাদীস তিরবানী)'।

আল্লাহ ওয়াদাবদ্ধ যে তিনি মো'মেনদেরকে দুনিয়ার কর্তৃত্ব দান কোরবেন। অথচ আজ মো'মেন দাবিদার এই জনগোষ্ঠী অন্য সকল জাতির ঘৃণা ও করুণার পাত্র। কর্তৃত্ব দূরে থাক হাজার হাজার মোসলেম দাবিদার ইহুদি-খ্রিস্টানদের মার খেয়ে ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ হোয়ে বিভিন্ন দেশের সীমানায়, নো-ম্যানস ল্যান্ডে শরণার্থী শিবিরে বসবাস করে, এক টুকরো রুটির জন্য প্রতিনিয়তই তারা আর্ত চিৎকার করে। (ছবি: জর্ডান সীমান্ত)

এইখানে আরও একটি কথা বুঝে নেয়া প্রয়োজন। কোর'আনের এই আয়াতে আল্লাহ সৎকাজের জন্য যে শব্দটি ব্যবহার কোরেছেন সেটা হোল আদেশ, আরবীতে 'আমর'। আদেশ তখনই করা যায় যখন যে আদেশকে কাজে পরিণত করা যায়, অর্থাৎ কাজে পরিণত করার শক্তি থাকে, নইলে খুব জোর অনুরোধ করা যায়। অসৎ কাজ থেকে মানুষকে বিরত করার ব্যাপারেও তাই। মানুষকে অর্থাৎ সমাজকে সৎকাজ করার আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখার শক্তি শুধু রাষ্ট্রের থাকে অন্য কারো নয়। অন্য যে কেউ কোরতে গেলে তাকে শুধু অনুরোধ বা কাকুতি-মিনতি কোরতে হবে। কিন্তু আল্লাহ অনুরোধ শব্দ ব্যবহার করেন নি, কোরেছেন 'আমর' আদেশ অর্থাৎ ঐ কাজ রাষ্ট্র-শক্তি হাতে নিয়ে কোরতে হবে। উপদেশ ও অনুরোধে যে ও কাজ হবে না তার প্রমাণ বর্তমান মানব সমাজ। এই সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ, অন্যায় কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখা যে আল্লাহ উপদেশ, অনুরোধের মাধ্যমে করা বোঝান নি তা পরিষ্কার হোয়ে যায় তার কোর'আনের আরেকটি আয়াতে। তিনি বোলেছেন- এরা (মো'মেন) তারা, যাদের আমি তাদের পৃথিবীতে (বা পৃথিবীর যে কোনো অংশে) ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করলে সালাত (নামাজ) কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং ন্যায়, সৎ কাজের আদেশ দেয়, এবং অন্যায়, অসৎ কাজ থেকে বিরত করে (কোর'আন- সুরা আল-হজ্ব ৪১)। এখানে লক্ষ্য কোরুন-মানুষকে ন্যায় কাজের আদেশ এবং অন্যায় থেকে বিরত রাখার জন্য আল্লাহ কী পূর্বশর্ত দিচ্ছেন। তিনি বোলছেন আমি তাদের পৃথিবীতে (বা পৃথিবীর যে কোনো অংশে) ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করার পর, কারণ তিনি ভালো কোরেই জানেন যে, ন্যায় কাজের আদেশ ও মানুষকে অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখা এ দু'টোর কোনটাই সম্ভব নয় রাষ্ট্রশক্তি ছাড়া। এই আয়াতের একটি আয়াত আগে তিনি সশস্ত্র সংগ্রামের (কেতাল) অনুমতি দিচ্ছেন। অর্থাৎ সর্বাত্মক সংগ্রাম কোরে জয়ী হোয়ে, ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হোয়ে তবে ঐ ন্যায় কাজের আদেশ ও অন্যায় থেকে বিরত রাখা। যারা অনুরোধ উপদেশ কাকুতি-মিনতি কোরে ঐ কাজ কোরতে চেষ্টা কোরছেন, তারা পণ্ডশ্রম কোরছেন।

যাদের এই শ্রেষ্ঠ জাতি হওয়ার কথা সেই জাতির বর্তমান হীনতা ও লাঞ্ছনার বিবরণ পুনরাবৃত্তি এড়ানোর জন্য আর লিখছি না। শুধু এটুকু বোলি, শ্রেষ্ঠত্ব দূরে থাক, এই জাতি এখন অন্য সকলের ঘৃণার বস্তু। বিশ্বের বহু দেশে অবস্থানকারী মোসলেমরা তাদের পরিচয় গোপন কোরে চলেন, কারণ পরিচয় জানলেই নির্দ্বিধায় মুখের উপরে থু থু দিয়ে দেয়, লাথি দিতেও পরোয়া করে না।

সুতরাং তারা যে ১৪০০ বছর আগেই সেই শ্রেষ্ঠ জাতির সদস্য নয় তা বুঝতে সাধারণ জ্ঞানই যথেষ্ট।

১১. ঐক্যহীনতা 'কুফর'

জাতির ঐক্য এতটাই প্রয়োজনীয় (Vital) বিষয় যে একটি জাতি একটি সংগঠন যত শক্তিশালীই হোক যত প্রচণ্ড শক্তিশালী অস্ত্র-শস্ত্র, ধন-সম্পদের অধিকারীই হোক, যদি তাদের মধ্যে ঐক্য না থাকে তবে তারা কখনই জয়ী হোতে পারবে না। অতি দুর্বল শত্রুর কাছেও তারা পরাজিত হবে। তাই আল্লাহ কোর'আনে বহুবার এই ঐক্য অটুট রাখার জন্য তাগিদ দিয়েছেন। এই ঐক্য যাতে না ভাঙ্গে সে জন্য তার রসুল (দ:) সদা শংকিত ও জাগ্রত থেকেছেন এবং এমন কোনো কাজ যখন কাউকে কোরতে দেখেছেন, যাতে ঐক্য নষ্ট হবার সম্ভাবনা আছে তখন রেগে গেছেন। একদিন দুপুরে আব্দাল্লাহ বিন আমর (রা:) রসুলাল্লাহর গৃহে যেয়ে দেখেন তার মুখ মোবারক ক্রোধে লাল হোয়ে আছে। কারণ তিনি দু'জন আসহাবকে কোর'আনের একটি আয়াত নিয়ে মতবিরোধ কোরতে দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি (দ:) বোললেন- কোর'আনের আয়াতের অর্থ নিয়ে যে কোনো রকম মতভেদ কুফর। নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহ তাদের কিতাবগুলির (আয়াতের) অর্থ নিয়ে মতো বিরোধের জন্য ধ্বংস হোয়ে গেছে। তারপর তিনি আরও বোললেন (কোর'আনের) যে অংশ (পরিষ্কার) বোঝা যায় এবং ঐক্যমত আছে তা বল, যে গুলো বোঝা মুশকিল সেগুলোর অর্থ আল্লাহর কাছে ছেড়ে দাও (মতবিরোধ কোরোনা) (হাদীস-আব্দাল্লাহ বিন আমর (রা:) থেকে- মোসলেম, মেশকাত)। বিশ্বনবী (দ:) রেগে লাল হোয়েছিলেন কেন? কারণ যদিও তিনি পরিষ্কার বোলেই দিলেন অর্থাৎ আয়াতের অর্থ নিয়ে মতবিরোধ হোয়ে জাতির ঐক্য নষ্ট ও পরিণামে যে জন্য জাতির সৃষ্টি সেই সংগ্রামে শত্রুর কাছে পরাজয় ও পৃথিবীতে এই দীনকে প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থতা। তবুও ইতিহাস এই যে, যে কাজকে রসুলাল্লাহ (দ:) কুফর বোলে আখ্যায়িত কোরেছেন সেই কাজকে মহা সওয়াবের কাজ মনে কোরে করা হোয়েছে এবং হোচ্ছে অতি উৎসাহের সাথে এবং ফলে বিভিন্ন মযহাব ও ফেরকা সৃষ্টি হোয়ে জাতির ঐক্য নষ্ট হোয়ে গেছে এবং জাতির শত্রুর কাছে শুধু পরাজিতই হয় নি তাদের ক্রীতদাসে পরিণত হোয়েছে।

বিদায় হজ্বে বিশ্বনবীর (দ:) ভাষণ মনযোগ দিয়ে পড়লে যে বিষয়টা সবচেয়ে লক্ষণীয় হোয়ে ওঠে সেটা তাঁর জাতির ঐক্য সম্বন্ধে তাঁর ভয় ও চিন্তা। স্বভাবতঃই কারণ জীবনের সবকিছু কোরবান কোরে অসহনীয় অত্যাচার সহ্য কোরে সারা জীবনের সাধনায় একটি জাতি সৃষ্টি কোরলে এবং সেই জাতির উপর তাঁর আরদ্ধ কাজের ভার ছেড়ে পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার সময় একটা মানুষের মনে ঐ ভয়, ঐ শংকাই সবচেয়ে বড় হোয়ে দাঁড়াবে। কারণ ঐক্য ভেঙ্গে গেলেই সবশেষ, জাতি আর তাঁর আরদ্ধ কাজ করতে পারবে না, শত্রুর কাছে পরাজিত হবে। তাই তাঁকে বিদায় হজ্বের ভাষণে বোলতে শুনি- হে মানুষ সকল! আজকের এই দিন (১০ই জিলহজ্ব), এই মাস (জিলহজ্ব) এই স্থান (মক্কা ও আরাফাত) যেমন পবিত্র, তোমাদের একের জন্য অন্যের প্রাণ, সম্পদ ও ইয্যত তেমনি পবিত্র (হারাম)। শুধু তাই নয় এই দিন, এই মাস ও এই স্থানের পবিত্রতা একত্র কোরলে যতখানি পবিত্রতা হয়, তোমাদের একের জন্য অন্যের জান-মাল-ইযযত ততখানি পবিত্র (হারাম)। খবরদার! খবরদার! আমার (ওফাতের) পর তোমরা একে অন্যকে হত্যা কোরে কুফরী কোরো না। শেষ নবী (দ:) এই সাবধান বাণী একবার নয়- পুনঃপুনঃ উচ্চারণ কোরলেন এবং শেষে আসমানের দিকে মুখ তুলে বোললেন - হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক- আমি আমার দায়িত্ব পৌঁছে দিলাম। হে আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাক- আমি আমার দায়িত্ব পৌঁছে দিলাম। এখানে লক্ষ্য কোরুন নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটিকে, অর্থাৎ জাতির ঐক্যকে নষ্ট বা ক্ষতি করাকে শেষ নবী (দ:) কোন্ শ্রেণীর গোনাহের পর্যায়ে ফেলছেন। একেবারে কুফরের পর্যায়ে। তাই আল্লাহর রসুল দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন, ‘যে ব্যক্তি এই উম্মতের ঐক্য ও সংহতির মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি কোরতে চায় তাদের ঐক্যের মধ্যে ফাটল ধরাতে চেষ্টা করে, তলোয়ার দ্বারা তোমরা তাকে শায়েস্তা করো, সে যেই হোক না কেন (হাদীস, আরফাজা (রা:) থেকে মোসলেম)।

আল্লাহ পবিত্র কোর’আনে দীন নিয়ে বাড়াবাড়ি কোরতে নিষেধ কোরেছেন এবং আল্লাহর রসুলও বিদায় হজ্বের ভাষণে দীন, জীবনব্যবস্থা নিয়ে বাড়াবাড়ি কোরতে নিষেধ কোরেছেন। বাড়াবাড়ি অর্থ হোচ্ছে অতি বিশ্লেষণ এবং যতটুকু বলা হোয়েছে তার চেয়ে বেশি বেশি করা, আধিক্য (তাশাদ্দুদ) করা। এমন কোনো কাজ দেখলে রসুলাল্লাহ রেগে লাল হোয়ে যেতেন এবং যারা তা কোরত তাদেরকে কঠিনভাবে তিরস্কার কোরতেন। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কোনো বিষয়ে মসলাহ জানতে চাইলে বিশ্বনবী (দ:) প্রথমে তা বোলে দিতেন। কিন্তু কেউ যদি আরও একটু খুঁটিয়ে জানতে

চাইতো তাহোলেই তিনি রেগে যেতেন। একদিন একজন পথে পড়ে থাকা জিনিসপত্র কি করা হবে এ ব্যাপারে রসুলাল্লাহর (দ:) কাছে মসলাহ জিজ্ঞাসা করায় তিনি তার জবাব দিয়ে দিলেন। ঐ লোকটি যেই জিজ্ঞাসা কোরলেন যে যদি হারানো উট পাওয়া যায় তবে তার কি মসলাহ? অমনি সেই জিতেন্দ্রিয় মহামানব এমন রেগে গেলেন যে তার পবিত্র মুখ লাল টকটকে হোয়ে গেলো (হাদীস-যায়েদ এবনে খালেদ জুহানী (রা:) থেকে বোখারী)। কিন্তু তাঁর অত ক্রোধেও অত নিষেধেও কোনো কাজ হয় নি। তাঁর জাতিটিও ঠিক পূর্ববর্তী নবীদের (আ:) জাতিগুলির মতো দীন নিয়ে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি কোরে অতি মোসলেম হোয়ে মসলা-মাসায়েলের তর্ক তুলে বিভেদ সৃষ্টি কোরে হতবল, শক্তিহীন হোয়ে শত্রুর কাছে পরাজিত হোয়ে তাদের গোলামে পরিণত হোয়েছে।

দীনের যে কোনো বিষয় নিয়ে তর্ক, মতভেদ করাকে তিনি বার বার কুফর বোলে আখ্যায়িত কোরেছেন, কারণ এতে জাতির ঐক্য বিনষ্ট হয়। জাতির অখণ্ডতা ও অবিভাজ্যতা সম্পর্কে আল্লাহ ও রসুলের এমন স্পষ্ট উদাহরণ ও নীতিমালা সত্ত্বেও বাস্তবে এক মোসলেম জাতি আজ শরীয়াহগতভাবে শিয়া সুন্নি, হানাফী, শাফেয়ী, হাম্বলী, আহলে হাদীস ইত্যাদি ভাগে, আধ্যাত্মিকভাবে, কাদেরিয়া, নকশবন্দিয়া, মোজাদ্দেদিয়া, আহলে বাইত ইত্যাদি হাজারো ভাগে, ভৌগোলিকভাবে ৫৫টিরও বেশি রাষ্ট্রে বিভক্ত এবং ইহুদি খ্রিস্টানের নকল কোরে হাজারো রাজনৈতিক দলে কেউ গণতন্ত্রী, কেউ সমাজতন্ত্রী, কেউ সাম্যবাদী, কেউ রাজতন্ত্রী, কেউ পুঁজিবাদী; গণতন্ত্রীদের মধ্যে কেউ সংসদীয় গণতন্ত্রী, কেউ পুঁজিবাদী গণতন্ত্রী, সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে কেউ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রী, কেউ চীনাপন্থী, মাওবাদী, কেউ মার্কসপন্থী, লেলিনবাদী ইত্যাদি মতাদর্শকে ভিত্তি কোরে হাজার হাজার দলে বিভক্ত। আল্লাহ বলেন, "সকল মো'মেন ভাই ভাই (সুরা হুজরাত ১০)"। রসুলাল্লাহ (দ:) বোলেছেন, 'সমগ্র উম্মতে মোহাম্মদী জাতি যেন একটা শরীর, তার একটা অঙ্গে ব্যথা পেলে সারা শরীরেই ব্যথা অনুভূত হয়' (আব্দাল্লাহ এবনে ওমর রা: থেকে বোখারী মোসলেম আবু দাউদ)। সেই উম্মতে মোহাম্মাদীর দাবিদার, এক মোসলেম জাতির দাবিদার হাজারো লক্ষ ভাগে বিভক্ত হোল, বিভক্ত হোয়ে নিজেরা নিজেরা মারামারি, যুদ্ধ, রক্তপাত, দাঙ্গা ইত্যাদি কোরল এতে জাতির যে সংজ্ঞা রসুল দিলেন অর্থাৎ 'এক দেহ' তা থাকলো কিনা?

ব্যক্তিগত তাকওয়া এবং সওয়াব কামাতে এই জাতি এতটাই ব্যস্ত যে, পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে যে অগণ্য বনী আদম যারা তাদের মতই মোসলেম দাবিদার, তাদের মতই এক আল্লাহ, এক রসুল ও

ইহুদি খ্রিস্টান সভ্যতা 'দাজ্জালের' অবরোধের শিকার আফ্রিকার 'মোসলেমদের' করুণ অবস্থা।

অথচ পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে এখন অনেক মোসলেম দেশেও কুকুরের পেছনে যে খরচ করা হয় তা দিয়ে অভাবগ্রস্ত অনেক পরিবার চোলতে পারবে।

এক কোর'আনে বিশ্বাসী, তারা অন্যান্য জাতিগুলির দ্বারা পশুপাখির মতো গুলি খেয়ে মোরছে, মেয়েরা ধর্ষিত হোচ্ছে, অবর্ণনীয় নির্যাতনের শিকার হোচ্ছে, লাখে লাখে বাস্তুহারা হোচ্ছে তাদের প্রতি অন্যান্য মোসলেমরা কোনরূপ সহানুভূতির হাত বাড়ান না, খবরও রাখেন না। এই হতভাগ্য 'মোসলেম' জাতিরই একটা অংশ রোহিঙ্গা নামক জনগোষ্ঠীকে বৌদ্ধরা সাগরে নিয়ে ডুবিয়ে মারছে হাজারে হাজারে, আগুনে পুড়িয়ে মারছে নারী ও শিশুদের, যাদের অধিকাংশ নারীই জীবনে একাধিকবার ধর্ষিতা হোয়েছেন, যাদের জীবনটাই মৃত্যুর মতো ভয়ঙ্কর, সেই রোহিঙ্গাদের খোঁজ

নেওয়ার কোনো সময় এই অতি মুসল্লীদের, তাদের এস্তেঞ্জার পর ঢিলা কুলুখ নেওয়ার অধিকার থাকলেই হোল, চেক রুমাল কাঁধে চাপিয়ে দিনে পাঁচবার মসজিদে যেতে পারলেই হোল, এভাবেই তারা যিকিরে ফিকিরে জীবন কাটিয়ে দিতে চান। ফিলিস্তিনের আজন্ম নির্যাতিত মোসলেমদের জন্য তাদের প্রাণ কাঁদে না, আফ্রিকায়, সোমালিয়ায় না খেয়ে খেয়ে জীবন্ত কঙ্কাল হোয়ে ঘুরে বেড়ানো হাজার হাজার মোসলেমের ক্ষুধা অনুভব করার মতো আত্মা তাদের নেই। কারণ তারা আর এক উম্মাহ নেই, একটি দেহের মতো তাই এক অঙ্গে আঘাত পেলে সর্বাঙ্গে যন্ত্রণা অনুভব করারও প্রশ্ন ওঠে না।

এ তো গেল বহিঃশত্রুর দ্বারা নিষ্পেষিত হওয়ার বৃত্তান্ত, তথাকথিত মোসলেমরা নিজেরাই ভিন্ন মাজহাব ফেরকার অনুসারী মোসলেমদের নির্যাতন ও নিপীড়ন কোরতে কম পটু নন। বিগত কয়েক শতাব্দীতে শুধু মাত্র শিয়া সুন্নি সংঘর্ষ এবং নিজেদের দুঃখজনক ভৌগোলিক রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘর্ষ সংঘাত যুদ্ধ কোরে যে পরিমাণে নিহত ও আহত হোয়েছে তা বহিঃশত্রুর হামলার চাইতেও কয়েক গুণ; অথচ রসুলাল্লাহ বোলেছেন, ভ্রাতৃঘাতি সংঘাতে নিহতদের উভয়পক্ষই জাহান্নামী। শিয়া-সুন্নি, সরকারী-কাওমী, ওয়াহাবি-খারেজী-কাদিয়ানী ইত্যাদিরা এসলাম থেকে কে কতটুকু দূরে গেছে সেটা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়, সোজা কথা এরা মো'মেন নয়, মোসলেম নয়, উম্মতে মোহাম্মদী নয়। তারা প্রত্যেকেই এসব কোরে জাতির ঐক্য নষ্ট কোরে রসুলের কথা মোতাবেক কুফর কোরেছে, ফলে কার্যতঃ কাফের হোয়ে গেছে। আর এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যারা কাফের তাদের নামাজ, রোজা, হজ্ব কোনো কিছুই কবুল হবে না এবং তারা জাহান্নামী। সুতরাং ঐক্য নষ্ট কোরে এই জাতি আল্লাহ ও রসুলের এসলাম থেকে বর্হিগত হোয়ে গেছে বহু আগেই। এখন আবার সকল ভেদাভেদ ভুলে আল্লাহর তওহীদের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়া ছাড়া আর পথ নাই। আর এ আহ্বানই কোরছে হেযবুত তওহীদ।

১২. কেন্দ্রীয় নেতৃত্বহীনতা অসম্ভব

একটি সহজ সরল সত্য সকলের জানা জরুরি। আদম (আ:) থেকে শুরু কোরে আল্লাহর শেষ নবী মোহাম্মদ (দ:) পর্যন্ত সকল নবী ও রসুল যদিও একই তওহীদ নিয়ে এসেছেন কিন্তু তওহীদের উপর ভিত্তি করা দীনুল হক বা জীবনব্যবস্থার বিধানগুলি সকল সময়ে, সকল স্থানে একইরকম থাকে

নি। কারণ আগের দীনগুলি (জীবনব্যবস্থা) ছিলো সীমিত পরিসরের জন্য। সেগুলি কোনো বিশেষ জাতি, বিশেষ জনগোষ্ঠী, বিশেষ গোত্র, এমন কি একটা বিশেষ পরিবারের জন্যও নির্দিষ্ট করা ছিলো। এই জন্যই যাদের মাধ্যমে আল্লাহ এসলামকে পাঠিয়েছেন, অর্থাৎ নবী-রসুলরা (আ:), তাদের সংখ্যা- এক লাখ চব্বিশ হাজার, মতান্তরে দু'লাখ চব্বিশ হাজার- বিরাট সংখ্যা। এই সমস্ত দীনের মূলনীতি, ভিত্তি সব সময়ই একই থেকেছে, সেই দীনুল কাইয়্যেমা এবং সেরাতুল মোস্তাকীম, তওহীদ অর্থাৎ এক আল্লাহ ছাড়া কারো আদেশ, আইন, বিধান না মানা, সালাত প্রতিষ্ঠা করা ও যাকাত দেয়া, ব্যস, এই তিনটি মাত্র (সুরা বাইয়্যেনাহ ৫)। অন্যান্য সমস্ত আইন-কানুন, স্থান-কাল-পাত্র ভেদে বিভিন্ন রকমের এসেছে। যেমন শেষ এসলামে সালাতের যে প্রক্রিয়া, নিয়ম এসেছে, পূর্ববর্তী এসলামের এ প্রক্রিয়া ছিলো না- অন্য রকমের ছিলো, সালাতের উদ্দেশ্যে মানুষকে ডাকার জন্যও ঘন্টা বাজিয়ে, সিংগা ফুঁকে ইত্যাদি বিভিন্ন পদ্ধতি ছিলো। অন্যান্য বিধানও নানারূপ ছিলো। এভাবে চোলতে চোলতে বিবর্তনের পথ বেয়ে মানব জাতি যখন এমন একটা পর্যায়ে এসে পৌঁছলো যে, সেটা বোধশক্তি, বুদ্ধিমত্তা, বিভিন্ন স্থানের জনপদের সাথে যোগযোগ ব্যবস্থায় উন্নতিসহ সব দিকে দিয়েই উন্নতির একটা ছোঁয়া লাগলো, তখন আল্লাহ সিদ্ধান্ত নিলেন যে পৃথিবীর আয়ু যতদিন আছে ততদিন পর্যন্ত আল্লাহ আর নবী রসুল পাঠাবেন না। এই সময়টা এসেছে আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে। তিনি এমন একজন নবী পাঠাবেন যিনি হবেন বিশ্বনবী এবং শেষ নবী। পূর্ববর্তী এসলামের বিকৃত রূপগুলো নিষিদ্ধ কোরে দিয়ে পাঠালেন শেষ নবীকে (দ:) এসলামের শেষ সংস্করণ দিয়ে। দ্বিতীয়ত, তিনি হলেন সমস্ত দুনিয়ার সমস্ত জাতিসমূহের জন্য নবী। তাঁকে আল্লাহ যে দীনুল হক দান কোরলেন তার অপর নাম দীনুল ফেতরাহ বা প্রাকৃতিক দীন। **অর্থাৎ তিনি এমন একটা দীন দিয়েছেন যা সমস্ত দুনিয়ায় সমভাবে কার্যকর হবে, প্রয়োগযোগ্য হবে এবং প্রয়োগ হবে।** এর প্রযোজ্যতা পৃথিবীর বাকি আয়ুষ্কাল পর্যন্ত। এই দীনকে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আল্লাহ পাঠালেন তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি আখেরী নবীকে। রসুলাল্লাহ সমগ্র পৃথিবীতে সেই দীনকে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে সংগ্রাম আরম্ভ কোরলেন। আদম (আ:) থেকে নিয়ে হাজার হাজার বছর ধোরে- হোতে পারে লক্ষ লক্ষ বছরে ধোরে- পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিতে, বিভিন্ন স্থানে তার দীন, জীবন-বিধান পাঠাবার লক্ষ্য ছিলো শান্তি প্রতিষ্ঠা; এইবার শেষ জীবনব্যবস্থাটি পাঠাবার উদ্দেশ্য হোচ্ছে, সমস্ত মানব জাতির জন্য এক জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা কোরে মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ, রক্তপাত, অন্যায় অবিচারকে নির্মূল কোরে সমস্ত মানব জাতিকে এক জাতি কোরে

দেয়া। এক আদম-হাওয়া থেকে সৃষ্ট মানব জাতি স্রষ্টার চোখে এক জাতি (কোর'আন- সুরা আল বাকারা ২১৩, সুরা আন নিসা ১, সুরা আল ইউনুস ১৯)। সে পৃথিবীতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে নানা রকম চেহারা ধোরলেও আসলে মাত্র এক জোড়া মানুষের বংশধর, একই রক্ত। পৃথিবীময় ছড়িয়ে যাওয়া মানব জাতিকে আবার এক জাতিতে পরিণত করার মতো বিরাট,

যে জাতিকে সৃষ্টিই করা হোয়েছে সমস্ত মানবজাতিকে একটি মহাজাতিতে রূপান্তরিত করার জন্য, সেই জাতি কি কোরে নিজেরা হাজারো ফেরকা, মত, পথ, মাজহাব, তরিকা সৃষ্টি কোরে লক্ষ ভাগে বিভক্ত হোয়েও মো'মেন, মোসলেম উম্মতে মোহাম্মদী দাবি কোরতে পারে? তাদের এই দাবি যে সম্পূর্ণ অমূলক তা দুনিয়াময় তাদের অবস্থা দেখলেই প্রতীয়মান হয়। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বহীন জনসংখ্যা মো'মেন, মোসলেম বা উম্মতে মোহাম্মদী হোতে পারে

মহান লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে রসুলাল্লাহ তাঁর সংগ্রাম আরম্ভ করেন এবং উম্মতে মোহাম্মদী নামক একটি জাতি গঠন করেন। যখন আল্লাহ তাঁকে মদীনায় রাষ্ট্রক্ষমতা দিলেন তিনি তখন তাঁর উম্মাহকে সঙ্গে নিয়ে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু কোরলেন। তিনি আল্লাহ থেকে আদেশ প্রাপ্ত হোয়ে নিজের দায়িত্ব ঘোষণা কোরলেন, আমি আদিষ্ট হোয়েছি ততক্ষণ পর্যন্ত সশস্ত্র সংগ্রাম (কেতাল) চালিয়ে যেতে, যে পর্যন্ত না প্রত্যেকটি মানুষ আল্লাহকে তাদের একমাত্র এলাহ হিসাবে এবং আমাকে আল্লাহর রসুল হিসাবে মেনে না নেয় [আব্দুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) থেকে- বোখারী]। সুতরাং এটা সুস্পষ্ট হোল যে, রসুলাল্লাহর দায়িত্ব সমগ্র মানবজাতির উপরে, পুরো মানবজাতির জন্যই তিনি

রহমত, তাই তাঁর উপাধিও আল্লাহ দিলেন রাহমাতাল্লিল আলামীন। রসুলাল্লাহ তাঁর জীবদ্দশায় বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন, বংশ পরম্পরায় দাঙ্গা হাঙ্গামায় লিপ্ত আরব জাতিকে লৌহকঠিন ঐক্যবদ্ধ একটা জাতিতে রূপান্তরিত কোরলেন। সেই জাতি হোল অখণ্ড, তাদের জীবনব্যবস্থা ছিল আল্লাহর দেওয়া, তাই তারা ছিলেন মোসলেম জাতি। তারা নবীর উপর আল্লাহর দেওয়া দায়িত্ব অর্থাৎ সর্বাত্মক সংগ্রামের মাধ্যমে এই দীনকে সমগ্র পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করাকে নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন, তাই তারা ছিলেন উম্মতে মোহাম্মদী। সুতরাং আল্লাহ তওহীদের ভিত্তিতে লৌহকঠিন ঐক্যবদ্ধ এই জাতির সদস্যরা ছিলেন একাধারে মো'মেন, মোসলেম ও উম্মতে মোহাম্মদী এবং সেই জাতির এমাম হোলেন একজন, স্বয়ং আল্লাহর রসুল (দ:)। এইভাবে সমস্ত মানবজাতিকে একটি জাতিতে রূপান্তরিত কোরে একজন নেতার অধীনের নিয়ে আসার আকীদা নিয়ে জাতির সৃষ্টি হোল। **তাহোলে বোঝা গেল যে, রসুলাল্লাহর আগমনের পর থেকেই এসলামের আকীদা হোল এই- সমস্ত বনী আদম হবে একটা জাতি, তাদের জীবনব্যবস্থা হবে একটি, তাদের এমাম হবেন একজন।** এখানে কোনো সূত্রমতেই জাতির খণ্ড বা বিভক্ত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

মানবজাতিকে একটি জাতিতে রূপান্তরিত করার ঐ লক্ষ্য ও আকীদা নিয়েই রসুলাল্লাহর এন্তেকালের পরে জাতির নেতা অর্থাৎ এমাম হোলেন খলিফা আবু বকর (রা:)। তাঁর খেলাফতকালে জাতির মধ্যে শিয়া সুন্নি বা এরকম কোনো বিভক্তি বা মাজহাব ছিলো না। তাঁর নেতৃত্বে জাতি বর্ধিত হওয়া শুরু কোরল। তারপর ওমর (রা:) এর উপর খেলাফতের দায়িত্ব অর্পিত হোল, তিনিও তাঁর পূর্ব উত্তরসুরীর মতো একই ভাবে সংগ্রাম অব্যাহত রাখলেন। অর্ধ পৃথিবী তাঁর নেতৃত্বের অধীনে চোলে এলো। তখনও জাতি ছিলো একটা, জাতির কেন্দ্রীয় নেতা বা এমাম ছিলেন একজন। এরপর আসলেন ওসমান (রা:)। এই পর্যন্ত জাতির মধ্যে কোনরকম মত-পথ বা বিভেদ তৈরি হয় নি অর্থাৎ প্রায় অর্ধ পৃথিবী জুড়ে প্রতিষ্ঠিত ছিল একজন নেতার নেতৃত্বে একটি অখণ্ড মহাশক্তিশালী জাতি, তদানীন্তন বিশ্বের একক পরাশক্তি- উম্মতে মোহাম্মদী। এরপর থেকে জাতির মধ্যে শুরু হোল দুঃখজনক বিভাজন যে ইতিহাস সকলেরই জানা। কিন্তু এটা ঘটা উচিত হয় নি। রসুলাল্লাহর আদর্শ ও শিক্ষা মোতাবেক উচিত ছিল, তাঁর নিজের হাতে গড়া একটি জাতি উম্মতে মোহাম্মদী ঐক্যবদ্ধ হোয়ে সংগ্রামের (জেহাদ) মাধ্যমে সমস্ত পৃথিবীকে আল্লাহর সত্যদীনের অধীনে

নিয়ে আসা, তাহোলে রসুলের উপর আল্লাহর দেওয়া দায়িত্ব পূর্ণ হোত, উম্মতে মোহাম্মদী সৃষ্টির উদ্দেশ্য স্বার্থক হোত। এমনি কোরে আজ পর্যন্ত সমস্ত দুনিয়ায় মোসলেম জাতির একজন মাত্র নেতার অধীনে ঐক্যবদ্ধ থাকা উচিত ছিল। এই উম্মতে মোহাম্মদী জাতিকে আল্লাহর রসুল একটি দেহের সঙ্গে তুলনা কোরেছেন। একটি দেহের সকল কর্মকাণ্ড, সকল চিন্তা, সকল অনুভূতির নিয়ন্ত্রণ সাধন করে মস্তিষ্ক। মস্তিষ্ক বিকৃতি মানে দেহের সৌষ্ঠব, শক্তিমত্তা, ক্ষমতা যতই উৎকৃষ্ট হোক না কেন তার কোনোই মূল্য নেই। **একজন মানুষের যেমন একটিমাত্র মস্তিষ্ক থাকে তেমনি উম্মতে মোহাম্মদীর প্রধান ব্যক্তি অর্থাৎ এমাম বা নেতা মাত্র একজনই। রসুল যেমন দুইজন নন, এমামও কখনও দুইজন হোতে পারবেন না, সারা পৃথিবীতে যত লোক নিজেদেরকে মোসলেম দাবি কোরবেন, সর্বসময়ে তারা প্রত্যেকে একজন নেতার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ থাকবেন এবং তার আনুগত্যে অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকবেন।** যেই সে ঐক্যের বন্ধনী থেকে বহির্গত হবে সেই এসলামের রজ্জু স্বীয় গলদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন কোরে ফেলবে। এই কথা আল্লাহ ও তাঁর রসুল অসংখ্যবার বোলেছেন। এই ঐক্যের বন্ধনের বাইরে যেন একটিও মানুষ না থাকে সে জন্য বিশ্বনবী (দঃ) বোলেছেন- যে ব্যক্তি এমামের (নেতার) বায়াত (আনুগত্য) না নিয়ে মারা গেলো সে আইয়ামে জাহেলিয়াতের (অজ্ঞতার যুগের) মৃত্যুবরণ কোরলো (হাদীস- মুয়াবিয়া (রাঃ) থেকে - মসনদে আহমদ এবনে হাম্বল, চতুর্থ খন্ড, পৃষ্ঠা-৯৬)। একটি দেহ থেকে কোনো অঙ্গ কেটে পৃথক কোরে ফেলা হোলে সেটা যেমন সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ হারায় তেমনি একক জাতিসত্বার বাইরে কোনো এসলাম নেই; এটাই শেষ জীবনব্যবস্থার নীতি।

এই মহান জাতির অখণ্ড নেতৃত্ব তথা ঐক্য যেন কখনও বিঘ্নিত না হয়, সেজন্য আল্লাহর রসুলের কঠোর নির্দেশ, **"তোমাদের নেতৃত্ব এক ব্যক্তির উপর ন্যস্ত থাকা অবস্থায় যে ব্যক্তি তোমাদের দণ্ডকে বিভাগ কোরতে অথবা তোমাদের একতা বিনষ্ট কোরতে আসে তাকে তলোয়ার দ্বারা তার ফায়সালা কর** [হযরত উরফাজা (রাঃ) থেকে মোসলেম]। কারণ তারা আর এই দীনের অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং আল্লাহ ও রসুলের শত্রু। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয় যারা স্বীয় দীনকে খণ্ড-বিখণ্ড কোরেছে এবং অনেক দল হয়ে গেছে, তাদের সাথে আপনার কোনো সম্পর্ক নেই (সুরা আন'আম ১৫৯)। কোনো মো'মেনের কি নবীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়? কখনো না। বরং কাফের মোশরেকদের সাথেই সম্পর্ক ছিন্ন হয়। যারা মাজহাব, ফেরকা, তরিকা, রাজনীতি,

মতবাদ, ভৌগোলিক রাষ্ট্র, ভাষাভিত্তিক জাতীয়তা ইত্যাদি বহুভাবে এই দীনকে এবং এই মহাজাতিকে খণ্ড বিখণ্ড কোরেছে তারা মোসলেম না, আল্লাহর রসুল তাদের এমাম নন। অথচ আজ থেকে ১৩০০ বছর আগেই এই জাতির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব শিথিল হোতে আরম্ভ করে এবং ধীরে ধীরে তা একদম লুপ্ত হোয়ে যায়। **বর্তমানের এই বিকৃত এসলামে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কোনো ধারণাই বিদ্যমান নেই, এতে এমাম বোলতে শুধুমাত্র অর্থের বিনিময়ে মসজিদে যারা নামাজ পড়িয়ে থাকেন তাদেরকেই বোঝানো হয়।** যে জাতিকে সৃষ্টিই করা হোয়েছে সমস্ত মানবজাতিকে একটি মহাজাতিতে রূপান্তরিত করার জন্য, সেই জাতি কি কোরে নিজেরা হাজারো ফেরকা, মত, পথ, মাজহাব, তরিকা সৃষ্টি কোরে লক্ষ ভাগে বিভক্ত হোয়েও মো'মেন, মোসলেম উম্মতে মোহাম্মদী দাবি কোরতে পারে? তাদের এই দাবি যে সম্পূর্ণ অমূলক তা দুনিয়াময় তাদের অবস্থা দেখলেই প্রতীয়মান হয়।

১৩. বিশ্বনবী (দ:) কোনো দাসজাতির নেতা নন:

এই শতধাবিচ্ছিন্ন জনসংখ্যাকে যে আর উম্মতে মোহাম্মদী তো নয়ই এমনকি মোসলেম বা প্রকৃত মো'মেনও বলা যাবে না তার আরও একটি প্রধান কারণ আছে। প্রত্যেক জাতির নেতাও সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত। **সে হিসাবে বিশ্বনবী (দ:) এই জাতির অন্তর্ভুক্ত। তাহোলে বোলতে হয় আল্লাহ নবীদের নেতা, মানব জাতির শ্রেষ্ঠতম মানুষ, স্রষ্টার প্রিয় বন্ধু- তারপরই যাঁর স্থান, তিনি ইউরোপিয়ান খ্রিস্টানদের ঘৃণিত দাসজাতির নেতা? এ অসম্ভব।** পৃথিবীর যে কেউ বোলতে পারে বোলুক, আমরা অন্তত বোলি না। কেন বোলতে পারি না এর একমাত্র উত্তর হোচ্ছে তিনি ঐ দাস জাতির নেতা নন এবং ঐ দাস জাতি তাঁর জাতিও নয়। ভবিষ্যৎদ্রষ্টা নবী (দ:) বোলেও গেছেন। তিনি বোলেছেন- সে জাতি কেমন কোরে ধ্বংস হবে যার প্রথমে আমি মধ্যে মাহদী আর শেষে ঈসা। কিন্তু এদের ফাঁকে (অর্থাৎ মধ্যবর্তী) যারা তারা আমার নয় আমিও তাদের নই (হাদীস- জাফর (রা:) থেকে রাযিন মেশকাত)। যারা মহানবীর (দ:) নয় এবং মহানবী (দ:) যাদের নন তারা যে উম্মতে মোহাম্মদী তো নয়ই, মোসলেমও যে নয় তা তো আর ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। বিশ্বনবীর (দ:) সঙ্গী (আসহাব) অবস্থায় ও বিশ্বনবীর (দ:) পর সংখ্যায় সামান্য হোয়েও, সর্বদিক দিয়ে নগণ্য হোয়েও তাদের চেয়ে সংখ্যায়, অস্ত্রে, সামরিক শিক্ষায় শ্রেষ্ঠ বহু শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রতিবার জয়ী জাতিটি ছিলো তার (দ:) উম্মাহ। তারপর যখন জাতিটি আয়তনে

বিরাট হোল, সংখ্যায়, অস্ত্রশস্ত্রে, সম্পদে অতুলনীয় হওয়া সত্ত্বেও তাদের চেয়ে অনেক ছোট ছোট শত্রুর কাছে পরাজিত হোয়ে তাদের ক্রীতদাসে পরিণত হোল, তখন আর সেটা তার

বর্তমানের মোসলেম নামক এই জাতি সমস্ত পৃথিবীব্যাপি ইহুদি-খ্রিস্টান সভ্যতা তথা দাজ্জালের গোলাম, দাসে পরিণত হোয়ে তার সেজদায় অবনত, কিন্তু হতভাগ্য এ জাতির এই বোধটুকুও নেই যে, তারা বর্তমানে দাস জাতি সুতরাং তারা কোনোভাবেই উম্মতে মোহাম্মদী তো নয়ই মো'মেন, মোসলেমও নয়।

(দ:) উম্মাহও নেই মোসলেমও নেই। **তাই সেই ঘৃণিত দাস জাতির সঙ্গে একই সাথে চিহ্নিত না হওয়ার জন্য তিনি (দ:) বোলছেন তারা আমার নয়, আমিও তাদের নই।** কিন্তু তিনি (দ:) অস্বীকার কোরলে কি হবে, ঐ দাস জাতির অতি মুসল্লী ও ফকীহ, মোফাস্সের, মোহাদ্দেস, মুফতি, পীর, মাশায়েখ, ইউরোপিয়ান খ্রিস্টানদের গোলাম অবস্থায় থেকেই তাঁকে (দ:) তাদের নেতা বোলে পরিচয় দিয়ে তাঁকে (দ:) অসম্মান, অপমান কোরে আসছে কয়েক শতাব্দী ধোরে। আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবিবকে এইভাবে অপমানের প্রতিশোধ নিতে ছাড়েন নি। এই জাতি এই উম্মাহর জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসুল (দ:) যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণ কোরে দিয়েছিলেন সেই লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হওয়ার শাস্তি কী ভয়াবহ হোল। এই যুদ্ধগুলিতে ইউরোপিয়ান খ্রিস্টানরা লক্ষ লক্ষ পুরুষ-নারী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা শিশুকে গুলি কোরে, ট্যাংকের তলায় পিষে, আগুনে পুড়িয়ে এমনকি জীবন্ত কবর দিয়ে হত্যা কোরেছে, লাইন কোরে দাঁড় করিয়ে মেশিনগান কোরেছে, আল্লাহ কি এসব দেখেন নি?

নিশ্চয়ই দেখেছেন, কিন্তু একটি আঙ্গুল তুলেও সাহায্য করেন নি। কারণ তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ শুধু মো'মেনকে, উম্মাতে মোহাম্মদীকে সাহায্য করার। এই জাতিটি যে তখনও মোসলেম তিনি তাও পরোওয়া কোরলেন না। এই উম্মাহকে পরাজিত কোরে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করার পর ইউরোপিয়ান জাতিগুলি তাদের যার যার দখল করা এলাকায় তাদের নিজেদের তৈরি আইন ও শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন কোরল। সেই থেকে এই জাতি আর মোসলেমও রোইল না, কার্যতঃ কাফের ও মোশরেকে পরিণত হোল

১৪. জেহাদ ত্যাগ করার ফলে উম্মাহ থেকে বহিষ্কৃত

এই দীনের প্রবেশদ্বার (Entrance) হোচ্ছে তওহীদ- 'আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে হুকুমদাতা মানবো না' এই সাক্ষ্য দেওয়া। মোসলেম বোলে কথিত জাতিটি আজ এই তওহীদে নেই যা আগেই বোলে এসেছি। যারা এ তওহীদ থেকে বহির্গত হোয়ে গেছে তারা এসলাম থেকেই বহির্গত হোয়ে গেছে এতো স্বাভাবিক কথা। আল্লাহ আরও একটি কাজের কথা বোলেছেন যেটা ত্যাগ কোরলে জাতি এসলাম থেকে বহিষ্কৃত হোয়ে যায়, সেই কাজটি হোচ্ছে আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম (জেহাদ)। অর্থাৎ জেহাদ ত্যাগ হোচ্ছে এই দীন থেকে বহির্গত হোয়ে যাওয়ার পথ (Exit)। আল্লাহ কোর'আনে অন্ততঃ তিনবার বোলেছেন যে, তিনি (আল্লাহ) তাঁর রসুলকে (দঃ) সঠিক দিক নির্দেশনা ও সত্য দীন দিয়ে পাঠিয়েছেন এই জন্য যে তিনি এটাকে অন্যান্য সমস্ত দীনের ওপর বিজয়ী কোরবেন (সুরা ফাতাহ ২৮, সুরা তওবা ৩৩, সুরা সফ ৯)। এই নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে তার নবী ঘোষণা কোরলেন- "আমি আদিষ্ট হোয়েছি সমস্ত মানব জাতির বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যেতে যে পর্যন্ত না তারা একথা মেনে নেয় যে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো এলাহ নেই, এবং মোহাম্মদ (দঃ) তাঁর রসুল" [হাদীস- আব্দুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) থেকে বোখারী]। ইতিহাস সাক্ষী যতোদিন তিনি এই দুনিয়ায় ছিলেন ততোদিন তিনি ও তাঁর আসহাব একদেহ একপ্রাণ হোয়ে আল্লাহর দেয়া ঐ আদেশ ও দায়িত্ব পালন কোরে গেছেন এবং তা কোরতে যেয়ে মাত্র ১০ বছরের মধ্যে ১০৭টি ছোট বড় যুদ্ধ কোরেছেন। তারপর যখন আল্লাহর রসুল (দঃ) এই দুনিয়া থেকে চোলে গেলেন তখন ঐ দায়িত্ব স্বভাবতঃই এসে পোড়লো তাঁর গঠন করা জাতিটির ওপর অর্থাৎ উম্মতে মোহাম্মদীর ওপর, কারণ রসুলের ওপর আল্লাহর দেয়া দায়িত্ব তখনও পূর্ণ হয় নি। শুধু আরব দেশটাকে আল্লাহর আইনের শাসনের মধ্যে আনা হোয়েছে; বাকি পৃথিবী মানুষের তৈরি আইনের অধীনে চোলছে।

রসুলাল্লাহর (দঃ) নিজ হাতে গড়া জাতিটি অর্থাৎ উম্মতে মোহাম্মদী তার জান্নাতবাসী নেতার ওপর আল্লাহর দেয়া দায়িত্ব তাদের মাথায় এসে পড়া সম্বন্ধে এত সচেতন ছিলেন যে নেতার দুনিয়া থেকে চোলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি-ঘর, ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্ষেত-খামার পরিবার পরিজন, এক কথায় পার্থিব সব কিছু কোরবান কোরে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পূর্ণ কোরতে অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবীতে এই সত্য-ন্যায় জীবনব্যবস্থা কায়েম কোরতে অস্ত্র হাতে তাঁদের স্বদেশ আরব থেকে বের হয়ে পোড়েছিলেন। এই কাজকে তাঁদের নেতা বোলেছিলেন আমার সুন্নাহ, সুন্নাতি এবং বোলেছিলেন আমার এই সুন্নাহ যে বা যারা ত্যাগ কোরবে তারা আমার কেউ নয়, মান তারাকা সুন্নাতি ফালাইসা মিন্নি, অর্থাৎ তারা উম্মতে মোহাম্মদীই নয়। শুধু তাই নয়, তিনি বোলেছেন- মান রাগেবা আন সুন্নাতি ফালাইসা মিন্নি (বোখারী, মোসলেম) অর্থাৎ যে আমার সুন্নাহ থেকে শুধু মুখ ফিরিয়ে নেবে সেও আমার কেউ নয়। জেহাদ ছেড়ে দেবার পর নবীর সুন্নাহর বিকল্প হিসাবে নেয়া হোল তাঁর ব্যক্তিগত অভ্যাস-অনভ্যাস, পছন্দ-অপছন্দ ইত্যাদি যে গুলোর সাথে তাঁর জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, তাঁর উপর আল্লাহর দেয়া দায়িত্বের কোনো সম্বন্ধই নেই; যে গুলো নেহায়েৎ ব্যক্তিগত ব্যাপার। নিষ্ঠুর পরিহাস এই যে, জেহাদ ত্যাগকারীদের কাছে মানব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম বিপ্লবীর সুন্নাহ হোয়ে দাঁড়ালো, তার বিপ্লব নয়, তার মেসওয়াক করা, খাবার আগে জিহবায় একটু নিমক দেওয়া, খাবার পর একটু মিষ্টি খাওয়া, ডান পাশে শোয়ার মতো ছোট-খাট অসংখ্য তুচ্ছ ব্যাপার। মানুষের ইতিহাসে কোনো জাতি তার নেতার এমন অপমানকর অবমূল্যায়ন কোরেছে বোলে আমার জানা নেই। জেহাদ ত্যাগ কোরে ঐ জাতি মো'মেন ও উম্মতে মোহাম্মদীর সংজ্ঞা থেকে বহিষ্কৃত হোয়ে যাওয়া ছাড়াও আরও ভয়ংকর পরিণতি হোল। তা হোল এই যে আল্লাহ সুরা তওবায় ৩৮ এবং ৩৯ নং আয়াতে এই জাতিকে জেহাদ ছেড়ে দেবার পরিণতি সম্বন্ধে এই বোলে সাবধান কোরে দিয়েছেন- “হে মো'মেনরা তোমাদের কি হোয়েছে যে, যখন তোমাদের বলা হয় আল্লাহর পথে (সামরিক) অভিযানে বের হও, তখন যেন তোমরা ঝুঁকে পোড়ে মাটির সাথে মিশে যাও। (তাহলে কি) তোমরা পরকালের পরিবর্তে এই জীবনকেই প্রাধান্য দিয়েছো? এই জীবনের ভোগ তো পরকালের জীবনের তুলনায় অতি সামান্য। যদি তোমরা সামরিক অভিযানে বের না হও তবে তিনি তোমাদের কঠিন শাস্তি দেবেন এবং তোমাদের স্থলে অন্য কোনো জাতিকে প্রতিষ্ঠা কোরবেন (অর্থাৎ তোমাদের অন্য কোনো জাতির দাস, গোলাম বানিয়ে দেবেন) এবং তোমরা তার কোনোই ক্ষতি কোরতে পারবেনা, আল্লাহ সমস্ত কিছুর ওপর সর্বশক্তিমান।” এই কঠোর

সতর্কবাণী সত্ত্বেও আকীদা অর্থাৎ জাতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে সঠিক সম্যক ধারণার (Comprehensive Conception) বিকৃতিতে এই জাতি জেহাদ ছেড়ে দিয়ে নফসের সাথে নিরাপদ জেহাদ শুরু কোরল। আল্লাহও তার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কিছুদিন পরই ইউরোপের খ্রিস্টান জাতিগুলিকে দিয়ে ঐ জাতিকে সামরিক ভাবে পরাজিত ও পর্যুদস্ত কোরে শাসনভার ও কর্তৃত্ব

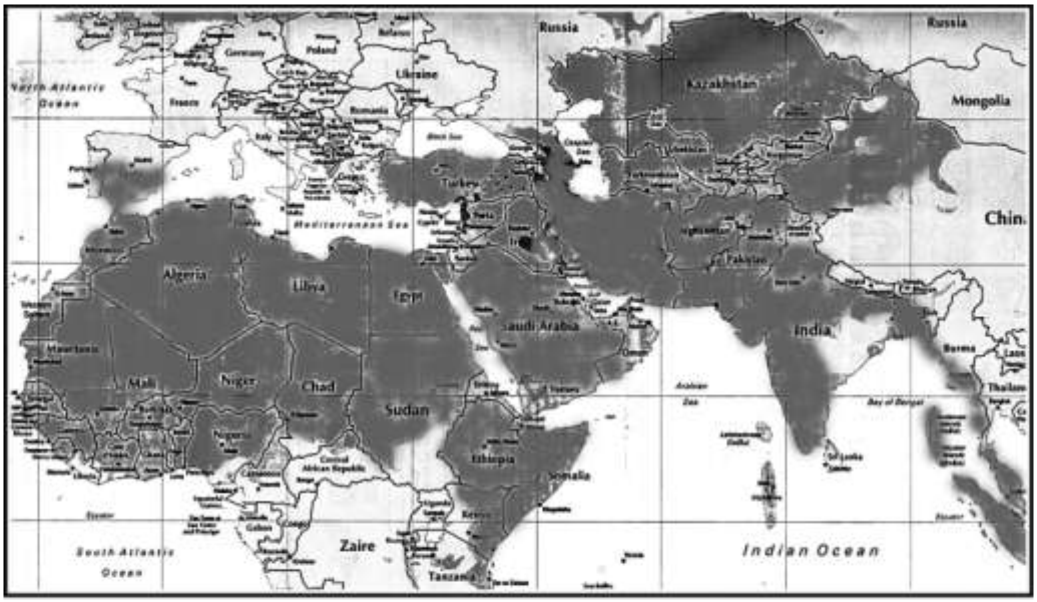

উম্মতে মোহাম্মদীর দায়িত্ব ছিল সারা পৃথিবীকে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ছায়াতলে নিয়ে আসা এবং শতধাবিভক্ত মানবজাতিকে একটি জাতিতে পরিণত করা। ১৪০০ বছর আগে এই জাতি তদানীন্তন অর্ধ পৃথিবীতে আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠা করার পর তাদের উদ্দেশ্যচ্যুতি ঘটে। ফলে আজ আবার তারা শতধাবিচ্ছিন্ন হোয়ে অন্য জাতির গোলামে পরিণত হোয়েছে।

তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে খ্রিস্টানদের হাতে তুলে দিলেন। এখানে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, আল্লাহ যাদেরকে কঠিন শাস্তি দিয়ে অন্য জাতির গোলাম বানিয়ে দেবেন তারা কি মো'মেন? কখনও নয়, যে মো'মেনদের জন্য আল্লাহ তাঁর অগণিত মালায়েকদের সঙ্গে নিয়ে সর্বক্ষণ ও সালাম প্রেরণ করেন, যে মো'মেনদের সম্মান আল্লাহর কাছে তাঁর ঘর ক্বাবারও ঊর্ধ্বে, সেই মো'মেনদেরকে আল্লাহ কখনওই শাস্তি দিতে পারেন না। আল্লাহর শাস্তি, গজব, লানত, পরাজয়, হীনতা এবং জাহান্নাম ইত্যাদি হোচ্ছে কাফের মোশরেকদের জন্য নির্ধারিত আর মো'মেনদের জন্য রোয়েছে আল্লাহর রহম, দয়া, স্নেহ, মমতা, সাহায্য, তাদের জন্য রোয়েছে উভয় জগতে বিজয়, উৎকর্ষ, সম্মান, শ্রেষ্ঠত্ব ও জান্নাতের অঙ্গীকার। সুতরাং আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রামে বহির্গত হওয়া

ত্যাগ কোরলেই এই জাতি আর মো'মেন থাকে না। আজ এই মোসলেম জাতি কেবল জেহাদ ত্যাগ কোরেছে তা-ই নয়, তারা জেহাদ বিরোধী, জেহাদের নাম শুনলেই ভয়ে তাদের হাত পা পেটের ভিতরে ঢুকে যায়। কোথাও জেহাদ শব্দটি শুনলেই হাজারটা প্রশ্ন তাদের মনে ঝাঁক বেঁধে আসে- এই বুঝি সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গিবাদ হানা দিলো। জেহাদ সম্পর্কে যে বিভ্রান্তিকর ধারণা দাজ্জাল অর্থাৎ ইহুদি খ্রিস্টান সভ্যতা মিডিয়া ও শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে কায়েম কোরে ফেলেছে তার দ্বারা প্রভাবিত হোয়ে অধিকাংশ মানুষই মনে কোরছেন যে, জেহাদ মানেই সন্ত্রাস। তাদের এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। প্রকৃতপক্ষে জেহাদ ও সন্ত্রাস সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী ধারণা। জেহাদ শব্দের অর্থ সংগ্রাম, সর্বাত্মক সংগ্রাম, প্রচেষ্টা। জেহাদ হোচ্ছে দীন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা মানুষকে মুখে বোলে, লিখে জানিয়ে, বক্তৃতা কোরে, যুক্তি উপস্থাপন কোরে, বুঝিয়ে ইত্যাদি ভাবে বলা। আর কেতাল একেবারে ভিন্ন শব্দ যার অর্থ সশস্ত্র যুদ্ধ। জেহাদ ব্যক্তি, দল, গোষ্ঠী ইত্যাদির পর্যায়ে এবং কেতাল রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে। ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা দলের কাজ হবে মানুষকে যুক্তি দিয়ে কোর'আন-হাদীস দেখিয়ে, বই লিখে, বক্তৃতা কোরে অর্থাৎ সর্বপ্রকারে মানুষকে এ কথা বোঝানো যে পৃথিবীতে অন্যায়, অবিচার, নির্যাতন, শোষণ, ক্রন্দন, রক্তপাত, যুদ্ধহীন একটি সমাজে নিরাপত্তা ও ন্যায় বিচারের মধ্যে অর্থাৎ নিরংকুশ শান্তিতে বাস কোরতে হোলে একমাত্র পথ যিনি আমাদের সৃষ্টি কোরেছেন তাঁর দেয়া জীবন বিধান মোতাবেক আমাদের জীবন পরিচালনা করা। যদি মানুষ এই কথা বোঝে, সাড়া দেয়, মানুষের সার্বভৌমত্বকে ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ভিত্তিক জীবন-ব্যবস্থাকে গ্রহণ করে তখন সৃষ্টি হবে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র, এই রাষ্ট্র গঠন হওয়ার পর প্রশ্ন আসবে যুদ্ধ বা কেতালের। কারণ কোনো রাষ্ট্র কোনোদিন ব্যক্তি বা দলের নীতিতে টিকে থাকতে পারে না। তখন তাঁর প্রয়োজন হয় অস্ত্রের, সৈনিকের, যুদ্ধের প্রশিক্ষণের। তওহীদ ভিত্তিক এই সত্যদীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তি গোষ্ঠী বা দলগতভাবে কোনও কেতাল অর্থাৎ সশস্ত্র যুদ্ধ নেই, আছে শুধু তওহীদের, আল্লাহর সার্বভৌমত্বের আহ্বান, বালাগ দেয়া, এটাই জেহাদ। ঠিক তেমনি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আছে সশস্ত্র যুদ্ধ। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অস্ত্র, যুদ্ধ ইত্যাদি সর্বযুগে, সর্বদেশেই আইনসম্মত। কোর'আন ও হাদীসে যে কেতালের কথা আছে তা রাষ্ট্রগত।

মূল কথায় ফিরে আসি। জেহাদ ত্যাগ করার কারণে এই জনসংখ্যা বহু আগেই মো'মেনের সংজ্ঞা থেকে বহিষ্কার (হুজরাত-১৫) হোয়ে গেছে এবং আল্লাহর রাস্তায় অভিযানে বহির্গত হওয়া বন্ধ

করার কারণে কয়েক শতাব্দী আগেই আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক (সুরা তওবা ৩৯) তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিয়ে অন্য জাতির গোলাম বানিয়ে দিয়েছেন। কাজেই এরা আর আল্লাহর চোখে মো'মেন না, উম্মতে মোহাম্মদীও না।

পরিশিষ্ট

মো'মেন মোসলেম দাবিদার ১৫০ কোটি এ জনসংখ্যা যে প্রকৃত পক্ষে মো'মেন নয়, আল্লাহ-রসুলে দৃঢ় বিশ্বাস ও বহু আমল সত্ত্বেও তারা আল্লাহর দৃষ্টিতে মোশরেক এবং কাফের কেন তা বোঝানোর জন্য মাত্র কয়েকটি যুক্তি উপস্থাপন কোরলাম। আমার উপস্থাপিত কথাগুলি আমার নয়, আমি শুধুমাত্র আল্লাহর কোর'আন, তাঁর রসুলের হাদীস এবং বর্তমান অবস্থা তুলে ধরেছি। আমার কথায় হয়তো কেউ কেউ আমার উপরে রেগে যাবেন, কিন্তু সত্য প্রকাশের খাতিরে আমি না বোলে পারি নি। কারও অনুভূতিতে আঘাত করা আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু মরক্কো থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত এই বিশাল জাতি যে কালঘুমে ঘুমিয়ে আছে তাকে জাগানোর জন্য কঠিন আঘাত দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। আমার এই আঘাতে তবুও তারা যেন জাগে, তারা যেন আবার ঐক্যবদ্ধ হয়, আল্লাহর রসুল যে দায়িত্ব তাদের দিয়েছেন সে দায়িত্ব তারা যেন কাঁধে তুলে নেয়। তবেই আল্লাহ তাদের উপর আরোপিত লানৎ উঠিয়ে নেবেন, তাদের ক্ষমা কোরবেন এবং হৃত গৌরব, বিজয়, সম্মান ফিরিয়ে দেবেন। আল্লাহর রসুলের বহু ভবিষ্যদ্বাণী থেকে আমরা নিঃসন্দেহ হোতে পারি যে ভবিষ্যতে বর্তমানের এই বিকৃত, শুধু বিকৃত নয়, একেবারে বিপরীতমুখী দীনটি আবার ভুল বুঝতে পেরে আল্লাহ তাঁর শেষ নবীর মাধ্যমে যে সত্যদীন দীনুল হক, দীনুল এসলাম পাঠিয়েছিলেন সেই দীনে ফিরে যাবে; বর্তমানের এই ফিস্ক (অবাধ্যতা), শেরক (অংশিদারিত্ব), কুফর (অবিশ্বাস), যুলম (অন্যায়), মোনাফেকী (কাপট্য) ও মালাউনী (অভিশপ্ত চরিত্র ও সত্তা) ত্যাগ কোরে প্রকৃত মো'মেন ও মোসলেম হবে। শুধু তাই নয়, তারা আল্লাহর রসুল যে কাজের ভার, দায়িত্ব তাঁর উম্মাহর ওপর দিয়ে তাঁর প্রভুর কাছে ফিরে গিয়েছিলেন, সেই কাজ পুনরায় শুরু কোরে আবার উম্মতে মোহাম্মদী হবে।

এ জাতির জন্য বিরাট আশার কথা ও সুসংবাদ এই যে, ১৩০০ বছর আগে হারিয়ে যাওয়া সেই প্রকৃত এসলাম আল্লাহ আবার দয়া কোরে এ যামানার এমাম, এমামুয্যামান, The Leader of the

Time জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি আবার এ জাতির উপর আল্লাহর রসুল যে কাজের দায়িত্ব অর্পণ কোরে গিয়েছিলেন সেই দায়িত্ব একজন উম্মতে মোহাম্মদী হিসাবে নিজ কাঁধে তুলে নিয়েছেন। তিনি হেযবুত তওহীদ আন্দোলনের প্রতিটি সদস্য-সদস্যাদেরকে আল্লাহর রসুলের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার চেষ্টা কোরেছেন। যামানার এমাম আল্লাহর কাছে চোলে গেছেন কিন্তু তাঁর প্রতিটি অনুসারী সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন এমন এক শান্তিময় বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য যেখানে থাকবে না কোনো মারামারি, ধর্ম-বর্ণের পার্থক্য, জাতিগত বিদ্বেষ! থাকবে না অন্যায়, অবিচার, যুদ্ধ, রক্তপাত, এক কথায় অশান্তি। সাদা-কালো, তামাটে সমস্ত বনি আদম হবে একটি জাতি, এক পরিবার। বাক স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতার অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত সৃষ্টি হবে পৃথিবীতে। আল্লাহ মো'জেজা ঘোটিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন যে তিনি হেযবুত তওহীদের মাধ্যমে পৃথিবীতে সেই নতুন সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত কোরবেন। এনশা'ল্লাহ সে সময় নিকটবর্তী।

জাতির মধ্যে বিভেদ

ঔপনিবেশিক শাসনের বিষফল

আল্লাহর রসুল অক্লান্ত পরিশ্রম, কঠোর অধ্যবসায় এবং দীর্ঘ সংগ্রামের মাধ্যমে উম্মতে মোহাম্মদী নামক এক লৌহ কঠিন ঐক্যবদ্ধ জাতি রেখে গিয়েছিলেন। সেই জাতির জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো স্ত্রী-পুত্র, ঘরবাড়ী, জমি-জমা, ব্যবসা- বাণিজ্য, সহায়-সম্পত্তি, সর্বশেষ নিজের জীবনটুকু পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে সংগ্রাম কোরে দুনিয়াময় আল্লাহর দেয়া সত্যদীন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানবজীবন থেকে সর্বরকম অন্যায়, অবিচার, অশান্তি দূর কোরে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। রসুলের এন্তেকালের পর জাতি তাই কোরতে গিয়ে দুনিয়ার বুকে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছিলো যে তাদের বেশিরভাগ লোকের কবর হয়েছে তাঁদের জন্মভূমির বাইরে। সেই সময় এ জাতির ভেতর না ছিলো শিয়া, না ছিলো সুন্নি। কোনো ধরনের মাযহাব, ফেরকা নিয়ে মতভেদ ছিলো না, পীর ছিলো না, দরবেশ ছিলো না, হুজরা ছিলো না, খানকা ছিলো না। তাদের জাতীয় জীবনে চোলত শুধু আল্লাহর হুকুম। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক সত্য হোচ্ছে এই যে, রসুলের এন্তেকালের ৬০/৭০ বছর পর থেকে জাতি তাদেরকে একটি জাতি হিসাবে সৃষ্টি করার প্রকৃত উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে দীন প্রতিষ্ঠার এই সংগ্রাম পরিত্যাগ কোরল। সংগ্রাম পরিত্যাগ করার শাস্তি হিসাবে তখন আল্লাহ তাঁর সাবধান ও সতর্কবাণী, “যদি বের না হও, তবে আল্লাহ তোমাদের মর্মন্তুদ আযাব দেবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমরা তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান- (তওবা-৩৯)” অনুযায়ী তাদেরকে দুনিয়ার বুকে অন্য জাতির গোলাম কোরে দিলেন। এখানে বলা আবশ্যক যে, উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে সংগ্রাম ত্যাগ করার সাথে সাথেই তারা অন্য জাতির গোলাম হয়ে যায় নি। দীর্ঘ সময় আল্লাহ তাদের সংশোধনের জন্য সময় দিয়েছেন। কিন্তু তারা তওবাহ কোরে না ফেরায় আল্লাহ তাদেরকে সামরিক দিক দিয়ে চূড়ান্তভাবে ইউরোপিয়ান খ্রিস্টান জাতি দ্বারা পরাজিত কোরে গোলাম কোরে দিলেন। এই দীর্ঘ গোলামীর সময়ে এই প্রভুদের চক্রান্তে জাতি প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ হয়ে যায়। ইউরোপের খ্রিস্টান জাতিগুলি সামরিক শক্তিবলে পৃথিবীর প্রায় সবক’টি মোসলেম অধ্যুষিত দেশ অধিকার করার পর এরা যাতে আর ভবিষ্যতে কোনোদিন তাদের ঐ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে না পারে সেজন্য তারা বিভিন্ন পদক্ষেপ নিলো। এই পদক্ষেপগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান পদক্ষেপ হোল শিক্ষাব্যবস্থায়

হস্তক্ষেপ করা, কারণ শিক্ষাব্যবস্থা এমন এক বিষয় যে এর মাধ্যমে মানুষকে যা ইচ্ছা তাই করা যায়; চরিত্রবান মানুষও তৈরি করা যায় আবার দুশ্চরিত্র মানুষেও পরিণত করা যায়; কী শিক্ষা দেয়া হোচ্ছে তার ওপর নির্ভর করে সে কেমন মানুষ হবে। তাই দখলকারী শক্তিগুলি তাদের অধিকৃত মোসলেম দেশগুলিতে মাদ্রাসা স্থাপন কোরল। উদ্দেশ্য- পদানত মোসলেম জাতিটাকে এমন একটা এসলাম শিক্ষা দেয়া যাতে তাদের চরিত্র প্রকৃত পক্ষেই একটা পরাধীন দাস জাতির চরিত্রে পরিণত হয়, তারা কোনোদিন তাদের প্রভুদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার চিন্তাও না করে। খ্রিস্টানদের মধ্যে Orientalist (প্রাচ্যবিদ) বোলে একটা শিক্ষিত শ্রেণী ছিলো ও আছে যারা এসলামসহ প্রাচ্যের বিভিন্ন ধর্ম, কৃষ্টি, ইতিহাস ইত্যাদির ওপর গবেষণা কোরে থাকেন। এদের সাহায্য নিয়ে খ্রিস্টানরা মাদ্রাসায় শিক্ষা দেবার জন্য তাদের মন মতো Syllabus (কি শিখানো হবে তার তালিকা) ও Curriculum (কি প্রক্রিয়ায় শেখানো হবে) তৈরি কোরে তা শিক্ষা দেবার জন্য তাদের অধিকৃত সমস্ত মোসলেম দেশগুলিতে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা কোরল। আমাদের কৃতকর্মের জন্য আল্লাহ কোরানে সুরা তওবার ৩৮-৩৯নং আয়াতে দেয়া প্রতিশ্রুতি মোতাবেক আমাদের ব্রিটিশদের গোলামে পরিণত কোরে দিয়েছিলেন। এই উপমহাদেশের ভাইসরয় (Viceroy) বা বড়লাট লর্ড ওয়ারেন হেসটিংকস ১৭৮০ সনে তদানীন্তন রাজধানী কোলকাতায় আলীয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা কোরে শেষ নবীর মাধ্যমে আল্লাহর দেওয়া দীনুল এসলাম নয়, তাদের প্রাচ্যবিদদের (Orientalist) দ্বারা তৈরি করা একটি বিকৃত এসলাম শিক্ষা দিতে আরম্ভ কোরলেন। খ্রিস্টান প্রাচ্যবিদদের দ্বারা তৈরি করা এই এসলামে প্রথমে কালেমার অর্থ বিকৃতি করা হোল; লা এলাহা এল্লাল্লাহ-র প্রকৃত অর্থ- 'আল্লাহ ছাড়া আদেশদাতা নেই' কিন্তু এটিকে বদলিয়ে করা হোল- আল্লাহ ছাড়া উপাস্য নেই, যেটাকে আরবীতে ভাষান্তর কোরলে হয়- লা মা'বুদ এল্লাল্লাহ। এটা করা হোল এই জন্য যে, আল্লাহকে একমাত্র আদেশদাতা হিসাবে নিলে এ জাতিতো ব্রিটিশদের আদেশ মানবে না, মোসলেম থাকতে হোলে আল্লাহর আদেশ মানতে হবে। আর কালেমার মধ্যে এলাহ শব্দের অর্থ বদলিয়ে যদি উপাস্য বা মা'বুদ শেখানো যায় তবে এ জাতির লোকজন ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহর উপাসনা, নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত, দান-খয়রাত ইত্যাদি নানা উপাসনা কোরতে থাকবে এবং জাতীয় জীবনে ব্রিটিশ প্রভুদের আদেশ পালন কোরতে থাকবে; তাদের অধিকার ও শাসন দৃঢ় ও স্থায়ী হবে। এই উদ্দেশ্যে ঐ বিকৃত এসলামে নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত, আত্মার পরিচ্ছন্নতার

জন্য নানারকম ঘষামাজা, আধ্যাত্মিক উন্নতির ওপর গুরুত্ব ও প্রাধান্য দেয়া হোল। কারণ এরা ঐ এবাদত, উপাসনা নিয়ে যত বেশি ব্যস্ত থাকবে ব্রিটিশরা তত নিরাপদ হবে।

(খ) ব্রিটিশ শাসকরা এই মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার (Syllabus) মধ্যে প্রধানতঃ বিতর্কিত বিষয়গুলির প্রাধান্য দিলো, যেগুলো আগে থেকেই বিদ্যমান ছিলো এমামদের এবং তাদের অনুসারীদের মধ্যে, কোরানের আয়াতের ব্যাখ্যা নিয়ে। এগুলোকে প্রাধান্য ও প্রয়োজনীয় শিক্ষণীয় বিষয় বোলে Syllabus এর অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্য হোল এই যে এই মাদ্রাসায় শিক্ষিতরা যেন ঐগুলি নিয়েই ব্যস্ত থাকে, তর্কাতর্কি, এমনকি মারামারি কোরতে থাকে, শাসকদের দিকে তাদের দৃষ্টি দেবার সময় না থাকে।

(গ) খ্রিস্টানদের প্রাচ্যবিদদের তৈরি ঐ এসলামে কোরানের গুরুত্ব একেবারে কমিয়ে দিয়ে সেখানে হাদীসের প্রবল প্রাধান্য দেয়া হোল। কারণ এই যে কোরান চৌদ্দশ' বছর আগে যা ছিলো আজও ঠিক তাই-ই আছে, এর একটা শব্দ নয় একটা অক্ষরও কেউ বদলাতে বা বাদ দিতে পারে নাই, কারণ এর রক্ষা ব্যবস্থা আল্লাহ তার নিজের হাতে রেখেছেন (কোরান- সুরা হেজর ৯), কিন্তু হাদীস তা নয়। বহু হাদীস মানুষ তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তৈরি কোরেছে, খেলাফতের পরে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর উমাইয়া, আব্বাসীয়া, ফাতেমী ইত্যাদি খেলাফতের নামে আসলে রাজতন্ত্রের রাজারা তাদের যার যার সিংহাসন রক্ষার জন্য অজস্র মিথ্যা হাদীস তৈরি কোরে আল্লাহর রসুলের নামে চালিয়েছে। সুন্নিরা তাদের মতবাদের পক্ষে, শিয়ারা তাদের মতবাদের পক্ষে মিথ্যা হাদীস তৈরি কোরে নিয়েছে যার যার মতবাদকে শক্তিশালী করার জন্য। আরও বিভিন্ন ভাবে হাদীস বিকৃত হোয়েছে। কোরানের গুরুত্ব কমিয়ে দিয়ে হাদীসের ওপর এত জোর এবং গুরুত্ব দেয়ার উদ্দেশ্য হোল বিতর্ক, বিভেদ শুধু জিইয়ে রাখা নয় ওটাকে শক্তিশালী করা।

(ঘ) তারপর তারা যে কাজটি কোরল তা সাংঘাতিক এবং যার ফল সুদূর প্রসারী। তারা তাদের প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসায় তাদের তৈরি করা বিকৃত এসলামের যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু কোরল তাতে মাদ্রাসার শিক্ষা শেষ কোরে বেরিয়ে এসে তাদের রুজি-রোজগার কোরে খেয়ে বেঁচে থাকার কোনো শিক্ষা দেয়া হোল না। অংক, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থ-বিজ্ঞান,

মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা, যার মাধ্যমে সৃষ্টি হয় দুনিয়া সম্পর্কে অজ্ঞ ধর্মব্যবসায়ী শ্রেণী, যাদের মাধ্যমে ব্রিটিশদের বিকৃত এসলামটি প্রসারিত হয়।

জীব-বিদ্যা ইত্যাদির কোনো কিছুই ঐ সব মাদ্রাসার সিলেবাসে (Syllabus) রাখা হোলনা। খ্রিস্টানরা এটা এই উদ্দেশ্যে কোরল যে, তাদের মাদ্রাসায় শিক্ষিত এই মানুষগুলো যেন ওখান থেকে বেরিয়ে যেয়ে তাদের শেখানো বিকৃত এসলামটাকে বিক্রি কোরে পয়সা উপার্জন করা ছাড়া আর কোনো পথে উপার্জন কোরতে না পারে; কারণ ঐ মানুষগুলির মধ্য থেকে ব্যতিক্রম হিসাবে যদি কেউ বুঝতে পারে যে তাদের শিক্ষা দেয়া ঐ এসলামটা প্রকৃতপক্ষে নবীর মাধ্যমে আল্লাহর দেয়া সত্য এসলাম নয়, ওটা বিকৃত, তাহোলেও যেন সে বাধ্য হয় ওটাকেই বিক্রি কোরে উপার্জন কোরতে, কারণ তাকে এমন আর কিছুই শিক্ষা দেয়া হয়নি যে কাজ কোরে সে টাকা পয়সা উপার্জন কোরে খেতে পারে। মূর্খ জনসাধারণ ধর্ম সম্বন্ধে জানার জন্য, ফতোওয়া নেবার জন্য স্বভাবতই এদের কাছেই যেতে বাধ্য এবং তারা অবশ্যই ব্রিটিশ-খ্রিস্টানদের তৈরি করা ঐ প্রাণহীন, আত্মাহীন, বিতর্ক-সর্বস্ব এসলামটাই তাদের শিক্ষা দেবে এবং এই ভাবেই ঐ বিকৃত এসলামই সর্বত্র গৃহীত হবে, চালু হবে। খ্রিস্টানরা তাদের অধিকৃত সমস্ত মোসলেম দেশগুলিতে এই নীতিই কার্যকরী কোরেছে এবং সর্বত্র তারা একশ' ভাগ (১০০%) সফল হোয়েছে। ১৭৮০ সনে কোলকাতায় আলীয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা কোরে খ্রিস্টান শাসকরা এর পরিচালনার ভার অর্পণ কোরলো এ দেশীয় একজন মোল্লার হাতে যিনি খ্রিস্টানদের বেধে দেওয়া শিক্ষাক্রম (Curriculum) অনুযায়ী মুসলমান ছাত্রদেরকে তাদেরই বেধে দেওয়া পাঠ্যসূচি (Syllabus) অর্থাৎ এসলাম শিক্ষা দিবেন। কিন্তু এ মাদ্রাসার নিয়ন্ত্রণ তারা সম্পূর্ণ ভাবে তাদের নিজেদের হাতে রাখলো। তারা অর্ধশতাব্দীর অধিক সময় এ পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রদান চালু রাখলো। অর্ধশতাব্দীর পর্যবেক্ষণের পর তারা যখন দেখলো যে এ থেকে তাদের আশানুরূপ ফল আসছে না, তখন মোসলেম বোলে পরিচিত এই জাতিটাকে নিজেদের তৈরি বিকৃত এসলামের মাধ্যমে চিরদিনের জন্য পঙ্গু, অথর্ব কোরে নিজেদের শাসন

দীর্ঘদিনের জন্য পাকাপোক্ত করার এই জঘন্য পরিকল্পনা যাতে বিঘিœত না হয় সেজন্য ১৮৫০ সালে ব্রিটিশ খ্রিস্টান শাসকরা তাদের প্রতিষ্ঠিত আলীয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ (Principal) পদটিও নিজেদের হাতে নিয়ে নিলো। প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হোলেন ডঃ স্প্রিঙ্গার (Springer)। তারপর একাধিক্রমে ২৭ জন খ্রিস্টান ৭৬ বৎসর (১৮৫০-১৯২৭) মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পদে আসীন থেকে এই মোসলেম জাতিকে এসলাম শিক্ষা দিলেন।

যে ২৬ জন খ্রিস্টান পণ্ডিত অধ্যক্ষ পদে থেকে কোলকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় ৭৬ বছর ধোরে মোসলেম দাবিদার ছাত্রদেরকে বিকৃত এসলাম শিখিয়েছেন তাদের তালিকা

১. এ.এইচ. স্প্রিঙ্গার এম.এ. (১৮৫০)

২. উইলিয়াম ন্যাসলীজ এল.এল.ডি (১৮৭০)

৩. জে. স্যাটক্লিফ এম.এ. (১৮৭৩)

৪. এইচ. এফ. ব্রকম্যান এম.এ. (১৮৭৩)

৫. এ. ই. গাফ এম.এ. (১৮৭৮)

৬. এ. এফ. আর হোর্নেল (C.I.P.H.D (১৮৮১)

৭. এইচ প্রথেরো এম.এ. (অস্থায়ী) (১৮৯০)

৮. এ. এফ. হোর্নেল (১৮৯১)

৯. এফ. জে. রো এম.এ. (১৮৯১)

১০. এ. এফ. হোর্নেল (১৮৯২)

১১. এফ. জে. রো এম.এ. (১৮৯৫)

১২. এ. এফ. হোর্নেল (১৮৯৭)

১৩. এফ. জে. রো (১৮৯৮)

১৪. এফ. সি. হল (বি.এ.টি.এস.সি) (১৮৯৯)

১৫. স্যার অর্যাল্পি স্টেইন পি.এইচ.ডি (১৮৯৯)

১৬. এইচ. এ. স্টার্ক বি.এ. (১৯০০)

১৭. লে. কর্ণেল জি.এস.এ. রেঙ্কিং (১৯০০)

১৮. এইচ. এ. স্টার্ক বি.এ. (১৯০১)

১৯. এডওয়ার্ড ডেনিসন রাস (১৯০৩)

২০. এইচ. ই. স্টেপেল্টন (১৯০৩)

২১. এডওয়ার্ড ডেনিসন রাস (১৯০৪)

২২. এম. চীফম্যান (১৯০৭)

২৩. এডওয়ার্ড ডেনিসন রাস (১৯০৮)

২৪. এ. এইচ. হারলি এম.এ. (১৯১১)

২৫. মি. জে. এম. ব্রটামলি বি.এ (১৯২৩)

২৬. এ. এইচ. হার্টি এম.এ. (১৯২৫)

খ্রিস্টানদের গোলাম, দাস হবার আগেই আল্লাহ-রসুলের প্রকৃত এসলাম বিকৃত হোয়ে গিয়েছিলো তা না হোলে তো আর গোলাম হোতে হোত না, কিন্তু ওটার যা কিছু প্রাণ অবশিষ্ট ছিলো খ্রিস্টানদের তৈরি এই এসলামে তা শেষ হোয়ে গেলো এবং এটার শুধু কংকাল ছাড়া আর কিছুই রোইল না। দীর্ঘ ১৪৬ বছর (১৭৮০ সালে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু কোরে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত ৭০ বছর মোসলেম নামধারী মোল্লাদেরকে অধ্যক্ষ পদে রেখে এবং ১৮৫০ থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত ৭৬ বছর খ্রিস্টান পণ্ডিতরা নিজেরা সরাসরি অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত থেকে) এ খ্রিস্টান এসলাম শিক্ষা দেবার পর ব্রিটিশরা যখন নিশ্চিত হোল যে, তাদের তৈরি করা বিকৃত এসলামটা তারা এ জাতির হাড়-মজ্জায় ঢুকিয়ে দিতে সক্ষম হোয়েছে এবং আর তারা কখনও এটা থেকে বের হোতে পারবে না তখন তারা ১৯২৭ সনে তাদের আলীয়া মাদ্রাসা থেকেই শিক্ষিত মাওলানা শামসুল ওলামা কামাল উদ্দিন আহমেদ (এম.এ.আই.আই.এস) এর কাছে অধ্যক্ষ পদটি ছেড়ে দিলো (আলীয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, মূল- আঃ সাত্তার, অনুবাদ- মোস্তফা হারুণ, এসলামী ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ, Reports on Islamic Education and Madrasah Education in Bengal” by Dr. Sekander Ali

Ibrahimy (Islami Faundation Bangladesh), মাদ্রাসা-ই-আলীয়ার ইতিহাস, মাওলানা মমতাজ উদ্দীন আহমদ, এসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ)। তাদের নিজেদের প্রতিষ্ঠিত আলীয়া মাদ্রাসার Syllabus ও Curriculum শুধু ঐ মাদ্রাসায় সীমিত না রেখে ব্রিটিশ শাসকরা তা বাধ্যতামূলকভাবে এই উপমহাদেশের সর্বত্র বেশির ভাগ মাদ্রাসায় চালু কোরল।

উপমহাদেশ ভাগ হোয়ে পাকিস্তান হবার পর ঐ আলীয়া মাদ্রাসা উভয় পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবার পরও খ্রিস্টানদের তৈরি বিকৃত এসলামের সেই পাঠ্যক্রমই চালু থাকে; শুধু ইদানীং এতে কিছু বিষয় যোগ করার চেষ্টা হোচ্ছে যাতে মাদ্রাসায় শিক্ষিত দাখেল, ফাযেল ও আলেমরা দীন বিক্রি কোরে খাওয়া ছাড়াও ইচ্ছা হোলে অন্য একটা কিছু কোরে খেতে পারে। অর্থাৎ মোসলেম বোলে পরিচিত পৃথিবীর জনসংখ্যাটি যাতে কোনোদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে সেজন্য খ্রিস্টানরা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা কোরে তাদের তৈরি যে প্রাণহীন, আত্মাহীন বিকৃত এসলামটা ১৪৬ বৎসর ধোরে শিক্ষা দিয়েছিলো সেই বিকৃত, আত্মাহীন এসলামটাকেই প্রকৃত এসলাম মনে কোরে আমরা প্রাণপণে তা আমাদের জীবনে কার্যকরী করার চেষ্টায় আছি।

এ গেলো একটা দিক, খ্রিস্টান ঔপনিবেশিক শাসনকর্তাদের দ্বারা তৈরি করা প্রাণহীন, আত্মাহীন, বিকৃত প্রচলিত এসলামের আলেম, মোল্লাদের দিক, যাদের সম্বন্ধে চৌদ্দশ' বছর আগে আল্লাহর রসুল বোলে গেছেন যে, আখেরী যামানায় আমার উম্মতের আলেমরা হবে আসমানের নিচে সর্বনিকৃষ্ট জীব (হাদীস, হযরত আলী (রাঃ) থেকে বায়হাকী); দ্বিতীয় দিকটা হোল- যারা মাদ্রাসায় শিক্ষিত হননি। আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক শাস্তি হিসাবে ইউরোপীয়ান খ্রিস্টান রাষ্ট্রগুলি দিয়ে এ জাতিকে গোলাম বানিয়ে দেবার পর খ্রিস্টানরা এ জাতির জন্য যে শিক্ষাব্যবস্থা কার্যকরী কোরল সেটাকে তারা দুই ভাগে ভাগ কোরল। একটা ভাগ মাদ্রাসার মাধ্যমে তাদের তৈরি বিকৃত এসলাম শিক্ষা দিল যেটা সম্বন্ধে এতক্ষণ বোলে আসলাম। আরেকটা ভাগ তারা কোরল স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা কোরে। দ্বিতীয় ভাগটা তারা কোরল এই জন্য যে, এই বিরাট উপমহাদেশ শাসন কোরতে যে জনশক্তি প্রয়োজন তা তাদের দেশ থেকে আনা প্রায় অসম্ভব; অসামরিক (Civil) ও সামরিক (Military) প্রশাসন চালু রাখতে এই উপমহাদেশের মানুষই তাদের প্রয়োজন হবে। এই শ্রেণীর শিক্ষিত মানুষ তৈরির জন্যই তারা স্কুল-কলেজ স্থাপন কোরে তাতে ইংরেজী ভাষা, অংক, বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক, ইতিহাস (প্রধানতঃ ইংল্যাণ্ডের রাজা-রানীদের ইতিহাস), ভূগোল, দর্শন অর্থাৎ পার্থিব জীবনে যা যা প্রয়োজন হয় তা শেখানোর বন্দোবস্ত রাখলো; কিন্তু সেখানে আল্লাহ,

রসুল, কোরান, হাদীস, দীন সম্বন্ধে প্রায় কিছুই রাখা হোল না। অন্য ভাগ মাদ্রাসার শিক্ষাব্যবস্থায় যেমন পার্থিব কিছুই শেখানোর ব্যবস্থা রাখা হোল না তেমনি এই ভাগে ধর্ম সম্বন্ধে (ধর্ম বোলতে ওরা যা বুঝে) কিছুই না শিখিয়ে প্রশাসন চালাতে যা যা দরকার তা শেখানোর ব্যবস্থা করা হোল। শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিষ্কার দু'টি ভাগে বিভক্ত হোয়ে গেলো। এক ভাগ শিখলো একটা বিকৃত মরা বিতর্ক-সর্বস্ব ধর্ম যেখানে পার্থিব কিছুই নেই কাজেই ঐ ধর্ম বিক্রি করা ছাড়া রোজগারের কোনো পথ নেই; অন্য ভাগে মানুষ যা শিখলো তার প্রায় সবটুকুই পার্থিব রোজগার কোরে চাকরি-বাকরি

তথাকথিত আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা, যার মাধ্যমে সৃষ্টি হয় ধর্মবিদ্বেষী অনুগত কেরানীকূল যারা পাশ্চাত্যের শাসকদের স্বার্থ রক্ষায় নিয়োজিত থাকে।

কোরে জীবন যাপন কোরতে পারে, কিন্তু ধর্ম, আত্মা, মোসলেম হিসাবে তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছুই শিখলো না। নিজেদের ইতিহাস সম্বন্ধে তারা রোইলো অজ্ঞ, নিজেদের গৌরবজ্জ্বল ইতিহাসের চেয়ে তারা বেশি জানলো ইউরোপের রাজা-রাজড়াদের সম্বন্ধে। এই দুই ব্যবস্থা পরস্পর বিপরীতমুখী। স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা কোরে যে ধর্মশিক্ষাহীন ব্যবস্থাটা খ্রিস্টানরা চালু কোরল তা থেকে যে শ্রেণীটি বের হোয়ে আসলো, সেটা থেকেই খ্রিস্টান শাসকরা তাদের অসামরিক (Civil) ও সামরিক (Military) প্রশাসন চালাবার লোক সংগ্রহ কোরল, সরকার ও প্রশাসন চালাতে যা প্রয়োজন সব স্থানেই তাদের নিযুক্ত কোরল এবং তাদের দিয়েই তাদের ঔপনিবেশিক শাসন ও আধিপত্য চালু রাখলো। এই সম্পূর্ণভাবে বিভক্ত এবং বিপরীতমুখী দুই শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষিত শ্রেণীর একটা বিধর্মী ও বিদেশী শাসকদের অতি অনুগত ও বিশ্বস্ত হোয়ে তাদের পক্ষ হোয়ে শাসন কোরতে লাগলো এবং অপর শিক্ষিত শ্রেণীটি খ্রিস্টান প্রভুদের কাছ থেকে যে বিকৃত দীন, ধর্মটাকে শিখেছে সেটা বিক্রি কোরে জীবন-যাপন কোরতে লাগলো। বাকি বৃহৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতা রোইলো অশিক্ষিত, মূর্খ।

এই অবস্থা চোলতে থাকাকালীন বিভিন্ন কারণে ঐ বিদেশী ইউরোপীয়ান শক্তিকে এই উপমহাদেশটাকে দুই ভাগে ভাগ কোরে দিয়ে চোলে যেতে হোল। যে সব কারণে ব্রিটিশকে এ উপমহাদেশটাকে স্বাধীনতা দিয়ে চোলে যেতে হোল সেগুলো অনেক এবং এখানে অপ্রাসঙ্গিক, তবে প্রধান কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। যা হোক খ্রিস্টান শাসকরা চোলে যাবার পরও তাদের সৃষ্ট শিক্ষাব্যবস্থা ঠিক তেমনই চালু রোইল। যে Syllabus এবং Curriculum দিয়ে এ মাদ্রাসা এবং স্কুল-কলেজ চোলত তা প্রায় ঠিক সেই ভাবেই চালু রাখা হোল। স্কুল-কলেজের পাঠ্য বিষয়বস্তুগুলি বিদেশী শাসকরা এমনভাবে সন্নিবেশিত কোরেছিলো যে ওগুলোয় শিক্ষিত হোলে মানুষ যেন তাদের খ্রিস্টান শাসক সম্বন্ধে হীনমন্যতায় আপ্লুত হয়। ঐ শিক্ষার মাধ্যমে শাসকরা সর্বদিক দিয়ে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও শাসিতদের নিকৃষ্টতা সম্বন্ধে বিশ্বাসী হয়। শিক্ষার মাধ্যমে খ্রিস্টান শাসকরা এ জাতির মন-মগজে, আল্লাহ, রসুল দীন সম্বন্ধে শুধু নিরাসক্ততাই নয় একটা বৈরিভাব (A hostile attitude) প্রবিষ্ট কোরিয়ে দিতে সক্ষম হয়। বিপরীতমুখী ঐ দুই ভাগে বিভক্ত শিক্ষাব্যবস্থা শাসকদের চোলে যাবার পরও চালু থাকার ফলে আজ আমাদের অবস্থা বর্তমানে এই :-

জাতি আজ প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত। বৃহত্তম ভাগ অশিক্ষিত, প্রায় নিরক্ষর, খেয়ে দেয়ে বেঁচে

নিরক্ষর সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ, যারা পূর্বোক্ত উভয় শ্রেণীর শিক্ষিত লোকদের দ্বারা শোষিত ও প্রতারিত।

থাকাই তাদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। নিজেদের বিচার-বুদ্ধি, জ্ঞানের অভাবের কারণে বাকি দুই ভাগের শিক্ষিতরা যা বলেন তাই বিশ্বাস করে, যে বেশি জোর গলায় বোলতে পারে তারটা বিশ্বাস করে। আরেক ভাগ পৃথিবীতে প্রচলিত সমস্ত শিক্ষা বিষয় থেকে বঞ্চিত একমাত্র মূলধন বিকৃত এসলামটাকে বিক্রি কোরে খেয়ে পরে বেঁচে আছে। শেষ ভাগটি হোল ঔপনিবেশিক শাসক প্রতিষ্ঠিত

স্কুল-কলেজের শিক্ষিত ধর্ম বর্জিত, জড়বাদী শিক্ষিত শ্রেণী যাদের কাছে পাশ্চাত্যের সব কিছু শুধু শ্রেষ্ঠ নয়, একমাত্র সত্য, পাশ্চাত্যের শেখানো রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা, আইন-কানুন, দণ্ডবিধি ইত্যাদি সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহর দেওয়া যে ব্যবস্থাটা তাদের আছে সেটার প্রতি তাদের অপরিসীম অবজ্ঞা, কারণ ওটা সম্বন্ধে তাদের অপরিসীম অজ্ঞতা- ওটা তাদের শিক্ষাব্যবস্থায় শেখানো হয়নি। শুধু যে শেখানো হয়নি তা নয়, ওটা সম্বন্ধে অবজ্ঞা বিদেশী শাসকরা তাদের মন-মগজে স্থায়ীভাবে প্রবিষ্ট কোরে দিয়েছে। যেহেতু তারা বিদেশীদের শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষিত হোয়ে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অবহিত, সেহেতু তারা ঐ সব জ্ঞান বিবর্জিত মাদ্রাসা শিক্ষিতদের প্রতি স্বভাবতই একটা অবজ্ঞার ভাব পোষণ করেন। কিন্তু ঐ অবজ্ঞা সত্ত্বেও ধর্মের ব্যাপারে তারা ঐ মাদ্রাসা শিক্ষিতদের ওপর নির্ভরশীল কারণ ওটার কিছুমাত্র তারা জানেন না এবং ধর্ম বিষয়ে ঐ মাদ্রাসা শিক্ষিতদের কাছ থেকে শিখেন খ্রিস্টানদের তৈরি করা বিকৃত এসলামটাই, ব্যক্তি জীবনে এরা জন্মগতভাবে আল্লাহ, রসুল, কোরান, এসলাম ইত্যাদিতে ভাসা-ভাসাভাবে বিশ্বাসী হোলেও সামষ্টিক জীবনে এরা পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুসারী। এরা চান জাতির ব্যক্তিজীবনে আল্লাহর আদেশ মোতাবেক মানুষ নামাজ, যাকাত, হজ্ব, রোজা অন্যান্য নিয়ম-কানুন পালন কোরুক আপত্তি নেই; কিন্তু জাতীয়, সামষ্টিক জীবনে আল্লাহর আদেশ অর্থাৎ সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার কোরে মানুষের সার্বভৌমত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত জীবন ব্যবস্থাকে গ্রহণ এবং কার্যকরী কোরুক। অর্থাৎ খ্রিস্টান শাসকরা যে উদ্দেশ্যে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা কোরে তাদের তৈরি করা তাদের পছন্দসই দীন (জীবন-ব্যবস্থা) শিক্ষা দিয়েছিলো, ঠিক সেইটা।

তাদের শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষিত হোলে দেশে তাদের অনুগত একটি শ্রেণী সৃষ্টি হবে এ উদ্দেশ্যও ছিলো। তবে ঐ শিক্ষাব্যবস্থায় একটা ব্যাপারে বিদেশী প্রভুরা সর্বত্র সতর্ক থেকেছে যে, তাদের নিজেদের দেশে শিক্ষাব্যবস্থায় যে নিজের জাতির প্রতি ভালবাসা, আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা গড়ে ওঠে এদের বেলায় যেন তা না হয় বরং তারা যেন নিজেদের পরিচয় না পায়। তাদের অতীত ও বর্তমান সম্বন্ধে যেন অবজ্ঞা ও ঘৃণা সৃষ্টি হয় এবং প্রভুদের সম্বন্ধে যেন তারা হীনমন্যতায় ডুবে থাকে। এই শিক্ষাব্যবস্থায় তারা পাঠ্যবস্তু পাঠ্যক্রম (Curriculum) এমনভাবে তৈরি কোরল যাতে এই জাতির ইতিহাসের বদলে ইউরোপের বিভিন্ন জাতিগুলির ইতিহাস স্থান পেলো। বিজ্ঞানের যে ভিত্তি মোসলেম জাতি স্থাপন কোরেছিলো, যে ভিত্তির উপর পরে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন জাতিগুলি যে উন্নতি কোরেছিলো তা লুপ্ত কোরে দিয়ে, মোসলেম আবিষ্কারকদের নাম বাদ দিয়ে নিজেদের নাম

বসিয়ে তারা শিক্ষার্থীদের মনে বিশ্বাস জন্মিয়ে দিলো যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রবর্তক, প্রচলক শুধু তারাই। প্রাচ্যের জাতিগুলির ধর্ম, বিশ্বাস, কুসংস্কার, মানুষগুলি পশু পর্যায়ের। সামরিক দিক দিয়ে তারা এই দাস জাতির ছাত্র-ছাত্রীদের শেখালো যে, হ্যানিবল, সিজার আর নেপোলিয়নের মতো বিজয়ী সেনাপতি ইতিহাসে আর হয় নি। ছাত্র-ছাত্রীরাও তাই শিখলো ও বিশ্বাস কোরল। তারা জানলো না যে পৃথিবীর ইতিহাসে চির অপরাজিত অর্থাৎ জীবনে কোনো যুদ্ধেই হারেন নি এমন সেনাপতি হোয়ে গেছেন মাত্র পাঁচ জন, এবং এই পাঁচজনই প্রাচ্যের। এই পাঁচ জন হোচ্ছেন শেষ নবী মোহাম্মদ (দ:) বিন আব্দাল্লাহ, আল্লাহর তলোয়ার খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা:), স্পেনের খলিফা আবদুর রহমান, সুলতান মাহমুদ এবং চেঙ্গিস খান। এবং এই পাঁচ জনের মধ্যে চারজনই মোসলেম। পাশ্চাত্যের কিছু কিছু ইতিহাসবিদ ওহোদের যুদ্ধে বিশ্বনবীকে (দ:) পরাজিত বোলে দেখাতে চেষ্টা কোরেছেন তাদের চিরাচরিত অভ্যাস মোতাবেক তাঁকে ছোট করার জন্য। কিন্তু ঐ যুদ্ধে তাঁর পরাজয় হয় নি। বিপর্যয় হোয়েছিলো, তিনি গুরুতর আহত হোয়েছিলেন, কিন্তু পরাজিত হন নি। প্রকৃতপক্ষে মোসলেমদের একটা শিক্ষা দেবার জন্যই আল্লাহ ঐ ঘটনা ঘোটিয়েছিলেন। সে শিক্ষা হোল এই যে, নেতার বা সেনাপতির আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন না কোরলে কি হয়। খুব বেশি বোললে ওহোদ যুদ্ধের ফলাফল কে সমান সমান অর্থাৎ অচলাবস্থা (Stalemate) বলা যায়। বদর, ওহোদ বা খন্দক; এর যে কোনো একটি যুদ্ধেই যদি মহানবী (দ:) পরাজিত হোতেন তবে ঐখানেই এসলামের সমাপ্তি ঘোটতো। স্বসৈন্যে আলপস পর্বত অতিক্রম কোরেছিলেন বোলে নেপোলিয়ানকে অসম্ভব সম্ভবকারী মানুষ বোলে শেখানো হোল এবং এই দুর্ভাগ্য জাতির ছেলেমেয়েরা তাই শিখলো এবং বিশ্বাস কোরল। তারা জানলোও না যে এর চেয়েও শতগুন অসম্ভব কাজ কোরেছিলেন তাদের জাতিরই একজন। ইস্তাম্বুল জয় করার যুদ্ধে সুলতান দ্বিতীয় মোহাম্মদ তার সম্পূর্ণ নৌবহরকে পাহাড়ের উপর দিয়ে টেনে অতিক্রম কোরেছিলেন।

এই শিক্ষাব্যবস্থায় এই দাস জাতির যুব সম্প্রদায়ের মন মানসিকতায় হীনমন্যতা ঢুকিয়ে দিতে আরেক ব্যবস্থা নেওয়া হোল। সেটা হোল শিক্ষার মাধ্যম করা হোল বিভিন্ন বিজয়ী প্রভুদের ভাষা। একদা অর্ধেক পৃথিবী বিজয়ী এই জাতিটাকে সামরিকভাবে পরাস্ত কোরে তাকে খণ্ড খণ্ড কোরে ভাগ কোরে নিয়ে ইউরোপীয়ান জাতিগুলি যার ভাগে যে ভাগ পড়েছিলো সে ভাগে নিজেদের ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন কোরল। হীনমন্যতায় আপ্লুত করা ছাড়াও আরেকটি উদ্দেশ্য

ছিলো আরবি ভাষা থেকে এদের বিচ্ছিন্ন করা, কারণ গোলামে পরিণত হবার আগে সর্বত্র এই জাতির শিক্ষার মাধ্যম ছিলো আরবী, যার ফলে বহু ভাগে বিভক্ত হোয়ে গেলেও সবারই একটা সাধারণ ভাষা (Lingua Franca) হিসাবে আরবি একটা ঐক্যসূত্র হিসাবে কাজ কোরছিলো। ঐ ঐক্যসূত্র কেটে দেওয়াও ছিলো শিক্ষার মাধ্যম পরিবর্তন করার উদ্দেশ্য। কিন্তু নিজেদের ইউরোপীয়ান ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা কোরলেও প্রভুরা পাঠ্যবস্তু এমনভাবে নির্ধারণ কোরল যাতে এরা পাশ্চাত্যের বিদ্যালয়গুলির শিক্ষার্থীদের মতো প্রকৃত শিক্ষা না পায়, কিন্তু শুধু প্রভুদের পক্ষ হোয়ে তাদের প্রশাসন চালাতে সাহায্য কোরতে পারে। এটুকু করার জন্য যতটুকু অংক, ভূগোল, বিজ্ঞান ও বিকৃত ইতিহাস শিক্ষা দরকার শুধু ততটুকুই করার ব্যবস্থা রইলো। এক কথায় ঐ শিক্ষায় সৃষ্টি হোল একটা কেরানীকুল, যারা মাঝারি ও নিু পর্যায়ের ঔপনিবেশিক প্রশাসন চালিয়ে যেতে পারে। এই শিক্ষার মাধ্যমে সৃষ্টি 'শিক্ষিত' শ্রেণীটাই ইউরোপীয়ান প্রভুদের পক্ষ হোয়ে অতি বিশ্বস্তভাবে প্রশাসন চালিয়েছে। এমন সতর্কতার সাথে এই শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা করা হোল যে, এক পুরুষেরও কম সময়ে বিভিন্ন অধিকৃত দেশে একটি শ্রেণী সৃষ্টি হোল যারা লেখাপড়া জানে কিন্তু হীনমন্যতায় এমন পর্যায়ে নেমে গেছে যে পাশ্চাত্য প্রভুরা লাথি মারলে নিজে কতখানি ব্যথা পেয়েছে সেটা বোধ করার আগে প্রভুর পায়ে আঘাত লাগলো কিনা সেই চিন্তা কোরেছে। এই শ্রেণীটি ইউরোপীয়ান প্রভুদের পক্ষ হোয়ে যার যার দেশে ঔপনেবেশিক শাসনের মধ্য ও নিু পর্যায়ের প্রশাসন চালিয়েছে, কোথাও প্রভুদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান হোলে তাকে দমন কোরেছে, প্রভুদের আদেশে নিজেদের জাতির লোকের বুকে গুলী চালিয়েছে, তাদের জন্য নিজের জাতির বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি কোরেছে। এই শিক্ষিত শ্রেণীটি চলাফেরায়, কথাবার্তায়, পোশাক পরিচ্ছদে আপ্রাণ চেষ্টা কোরেছে তাদের প্রভুদের অনুকরণের। ঐ শিক্ষাব্যবস্থার ফলে এই দাস জাতির মধ্যেই একটা অংশ বিজাতীয় হোয়ে গজালো যাদের মন মগজে দাসত্ব ছাড়া আর কিছুই ছিলো না।

কয়েক শতাব্দী ধোরে ইউরোপীয়ান শক্তিগুলি এই তথাকথিত মোসলেম জগতের খণ্ড খণ্ড অংশগুলি শাসন ও শোষণ করার পর সময় এলো এদের চলে যাবার। মোটামুটি এই শতাব্দীর মাঝামাঝি ঐ খণ্ড খণ্ড অংশগুলিকে "স্বাধীনতা" দিয়ে ইউরোপীয়ান শক্তিগুলি প্রাচ্য থেকে চলে গেলো। এই চলে যাবার কারণ প্রধানত এই নয় যে, এই দাস জাতি তার দৃষ্টি ফিরে পেয়েছে, সে

আবার নিজেকে চিনতে পেরেছে এবং নিজের হারানো স্থান ফিরে পেতে বিদ্রোহ কোরেছে। অবশ্য বিদ্রোহ দু এক জায়গায় যে হয় নি তা নয়, হোয়েছে কিন্তু তা ভৌগোলিক স্বাধীনতার জন্য। আসল কারণ হোল ইউরোপীয়ান রাষ্ট্রগুলি নিজেদের মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কোরে এমন ক্ষতিগ্রস্থ ও দুর্বল হোয়ে গিয়েছিলো যে, তাদের আর এশিয়া আফ্রিকাময় বিরাট উপনিবেশগুলিকে ধোরে রাখার মতো শক্তি ছিলো না। কিন্তু ইচ্ছা কোরলে তারা ঐ দুর্বল শক্তি নিয়েও আরও কিছুকাল তাদের অধিকৃত দেশগুলিকে অধীন রাখতে পারতো। কিন্তু তা কোরতে গেলে তাদের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন খুব ক্ষতিগ্রস্ত হতো। তাই তারা বুদ্ধিমানের মতো ভাল সম্পর্ক বজায় রেখে আলোচনার মাধ্যমে এই পরাধীন দাস জাতিগুলিকে আপাত স্বাধীনতা দিয়ে ইউরোপে ফিরে গেলো। উপনিবেশগুলিকে ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেবার পর ইউরোপীয়ান প্রভুরা চিন্তা কোরল ক্ষমতা কাদের হাতে ছেড়ে যাবে? অবশ্য সিদ্ধান্ত নিতে বেশি কষ্ট হয় নি, কারণ ভবিষ্যতে কোন্ শ্রেণী তাদের দ্বারা প্রভাবিত হবে, তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ কোরবে, এবং তাদের খুশী রাখতে চেষ্টা কোরবে তা অতি পরিষ্কার। কাজেই যাবার সময় তারা ক্ষমতা ছেড়ে গেলো ঐ শ্রেণীটির হাতে, যাদের তারা এতদিন তাদের ভাষার মাধ্যমে, তাদের তৈরি পাঠ্য বিষয়বস্তু শিক্ষা দিয়ে তাদের নিজ জাতির মন মানসিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন কোরে তাদের বিশ্বস্ত দাসে পরিণত কোরেছিলো। অবশ্য অন্য কোনো শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা দেয়াও যেতো না, কারণ ইউরোপীয়ান প্রভুদের সৃষ্ট 'ঐ শিক্ষিত' শ্রেণীটি বাইরে ছিলো আর দু'টি মাত্র শ্রেণী। সে দু'টির একটি হোল তাদেরই মাদ্রাসায় 'শিক্ষিত' পুরোহিত শ্রেণী, অন্যটি নিরক্ষর ও অশিক্ষিত জনসাধারণ। পুরোহিত শ্রেণীটি মসলা মাসায়েল ছাড়া আর কিছুই জানতো না, রাষ্ট্র পরিচালনা তাদের পক্ষে অসম্ভব ছিলো, আর নিরক্ষর অশিক্ষিতদের হাতে শাসনভার দেয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। কাজেই ক্ষমতা হাতে এলো কালো ফরাসী, বাদামী ইংরাজ, হলদে ওলন্দাজদের হাতে। আগেই বোলে এসেছি এরা প্রভুদের শিক্ষার গুণে চামড়ার রং বাদে আর সব দিক দিয়ে ইউরোপীয়ান। নিজেদের ইতিহাস, জীবন ব্যবস্থা (দীন) সভ্যতা কৃষ্টি সব কিছু থেকেই এরা ছিলো বিচ্ছিন্ন- শুধু বিচ্ছিন্ন নয় বিরোধী, বিগত প্রভুদের সম্বন্ধে গভীর হীনমন্যতায় আপ্লুত। ক্ষমতাপ্রাপ্ত এই শ্রেণীর আশা আকাঙ্খার সঙ্গে তাদের নিজ নিজ জাতির আশা আকাঙ্খার কোনো মিল ছিলো না, এমন কি বহু ক্ষেত্রে ও বিষয়ে ছিলো বিরোধী। আন্দোলন ও সংগ্রামের ফল হিসাবে যে সব দেশে

স্বাধীনতা এসেছে সেসব দেশে মুখ্যতঃ জনসাধারণের প্রচেষ্টার ফলেই এসেছে, কিন্তু ক্ষমতা এসেছে ঐ 'শিক্ষিত' শ্রেণীটির হাতে।

এই ক্ষমতার হাত পরিবর্তনের অবশ্যম্ভাবী ফল এই হোল যে, নতুন শাসকরা এতদিন পর স্বাধীন হোয়ে তাদের জীবন ব্যবস্থা - যেটাকে বিদেশী প্রভুরা বিসর্জন দিয়েছিলো, সেটাকে আবার জাতীয় জীবনে পুনর্বাসন কোরল না। তারা পূর্ব প্রভুদের চালু করা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক দণ্ডবিধি এমনকি শিক্ষাব্যবস্থা পর্যন্ত– ঠিক যা ছিলো তাই রাখলো এবং তাদের নিজ নিজ জাতির জীবনে চাপালো। এই নতুন শাসক শ্রেণীর কাছে ইউরোপীয়ানদের সৃষ্ট ব্যবস্থার চেয়ে ভাল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আইন কানুন সম্ভব ছিলো না। আল্লাহর দেয়া আইন-কানুন তাদের কাছে চৌদ্দশ' বছরের পুরানো সুতরাং পরিত্যাহ্য।

এই ভাগকে সাধারণ শিক্ষায় স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দেয়া হোল। এই ভাগে সততা, দেশপ্রেম, ওয়াদা রক্ষার মতো সাধারণ নৈতিক বিষয়গুলোও তাদের শিক্ষা দেয়া হয় নি। শুধু তাই নয়, এই আল্লাহ-হীন শিক্ষায় শিক্ষিতদের ভেতরে একটি অহংবোধ সৃষ্টি কোরে দেওয়া হয় যে, আমি অনেক কিছু জানি, আমি অনেকের থেকে বেশি জ্ঞানী। এই কেরানী তৈরির শিক্ষায় শিক্ষিত হোয়ে যারা বের হোল তাদের মন মগজ এসলামের প্রতি চরম অবজ্ঞা ও শত্রুভাবাপন্ন। কিন্তু দেশ চালায় এই শিক্ষিত শ্রেণীটিই- যারা উকিল, বিচারক, আইনজ্ঞ, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, মিডিয়া কর্মী, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য, সচিব, মন্ত্রী ইত্যাদি। আর জনসাধারণ বলে যে বৃহত্তর অংশটি আছে- এরা এই উভয় শিক্ষার বাইরে রয়ে গেলো। এরা না মাদ্রাসায় শিক্ষিত আর না সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত। শিক্ষার অভাবে এই শ্রেণীটি সীমাহীন অজ্ঞতায় ডুবে আছে। এদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হোচ্ছে পশুর মতো দু'বেলা আহার যোগানোর জন্য উদয়াস্ত পরিশ্রম কোরে দিনাতিপাত করা আর বংশবৃদ্ধি করা। এক বেলা খাওয়ার পর আরেক বেলা আহার যোগাড়ে উৎকন্ঠায় থাকা। পৃথিবীর আর কোনো কাজে মনোযোগ দেয়ার মতো সময় সুযোগ কোনটাই এদের নাই। তারা উপলব্ধি করতে পারে না যে এরা মানুষ, পশু নয়। এরা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব, আশরাফুল মাখলুকাত। এও উপলব্ধি করতে পারে না যে, তাদের মানবিক বোধ আছে, সৃষ্টিশীলতা আছে। এরাও স্রষ্টার অনন্যসাধারণ সৃষ্টি। বাকী দু'টি শ্রেণীর দ্বারা প্রতিনিয়ত শোষিত ও প্রতারিত হয়ে

তারা মানবিকতার সকল গুণ হারিয়ে ফেলে প্রায় পশু পর্যায়ের জীবন-যাপন করে। যেহেতু এরা পরকাল, হাশর, আল্লাহ, রসুল ইত্যাদিতে বিশ্বাস করে এবং পরকালের জবাবদিহিতার ভয় রাখে, কিন্তু ধর্মীয় কোনো কাজ সমাধা করার মতো জ্ঞান এদের নেই, তাই মাদ্রাসা শিক্ষিত ঐ মোল্লা শ্রেণীটির দ্বারস্থ হয়। এই সুযোগে ধর্মজীবীরা সাধারণ মানুষের বাচ্চার নাম রাখা থেকে শুরু কোরে জানাজা পড়ানো, মুর্দা দাফন, কুলখানি, মিলাদ মাহফিল, ওয়াজ মাহফিল, খাৎনা, বিয়ে-শাদী, কোরবানী, মসজিদে নামাজ পড়ানো, তারাবীহ পড়ানো ইত্যাদি সকল ধর্মীয় কাজ কোরে অন্যের ঘাড়ে সওয়ার হোয়ে জীবন কাটাচ্ছে।

অন্যদিকে জাগতিক নানা প্রয়োজন মেটাতে এই অশিক্ষিত শ্রেণীটিকে শিক্ষিত শ্রেণীর দ্বারস্থ হোতে হয়। বিচার-আচার, মামলা-মোকদ্দমা, অর্থনীতি, রাজনীতি, অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় যে কোনো বিষয়াদি সম্পর্কে যখন তারা শিক্ষিত শ্রেণীটির কাছে যায়, সেখানেও তারা চরম শোষণের ও বঞ্চনার শিকার হন। যেহেতু এই শিক্ষিত শ্রেণীটি প্রকৃতপক্ষে ‘কু-শিক্ষায় শিক্ষিত’ তাই এই নিরীহ সাধারণ মানুষকে ঠকিয়ে রোজগার কোরতে তাদের বিবেকে কোনো দংশন অনুভব করে না। এদের পারস্পরিক সম্পর্ক মূলতঃ খাদ্য ও খাদকের। তাদের শিক্ষাব্যবস্থায় আত্মার উন্নতির কোনো পথ দেখানো হয় নি, সেখানে নৈতিকতা শেখানো হয় নি, তাই দুর্বল হাড়-জিরজিরে গরিব চাষার গরু-বাছুর, ভিটেমাটি বিক্রি করা টাকা অন্যায়ভাবে আদায় কোরতে এরা কসুর করেন না। সমাজের এই নিম্নস্তরের মানুষগুলিকে উচ্চস্তরে নিয়ে আসার জন্য যে প্রক্রিয়াগুলি চালু করা হয় সেগুলিও মূলত প্রতারণামূলক। একটি উদাহরণ: কোনো কৃষক যদি তার সন্তানকে উচ্চশিক্ষিত কোরতে চান, প্রচলিত ভাষায় ‘মানুষ’ কোরতে চান, সেজন্য তাকে তার এত অর্থ ব্যয় কোরতে হয় যে তাকে প্রায় নিঃস্ব হোয়ে যেতে হয়। অতঃপর ঐ সন্তান ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রভাবে আত্মাহীন, বিবেক ও সর্বপ্রকার সদগুণ-বর্জিত একটি মানবেতর জীবে পরিণত হয় যে তার বাবাকে অশিক্ষিত কৃষক বোলে কথায় কথায় অবজ্ঞা করে, মাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, তাদের অবাধ্যতা করে। এ নৈতিক অবক্ষয় প্রমাণ করে যে এই শিক্ষাব্যবস্থা মানুষকে সার্টিফিকেট দেয় কিন্তু ‘প্রকৃত মানুষ’ করে না। সুতরাং দেখা যায় এই অশিক্ষিত শ্রেণীটির নিগ্রহ আরও বৃদ্ধি পায়। সরকারগুলো দেশের শিক্ষাহীন শ্রেণীটির উন্নয়নের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করে তা যেহেতু শিক্ষিত শ্রেণীর হাত দিয়েই বিতরণ করা হয়, তাই এর সিংহভাগই যায় দুর্নীতিগ্রস্থ কর্মকর্তা, আমলাদের

ভোগে। এই শিক্ষিত শ্রেণীর যে অংশটি রাজনীতি করাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ কোরেছে তারা কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হোয়ে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর পর সাধারণ মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘোরেন ভোটভিক্ষা কোরতে। যে রাজনীতিক যত জোর গলায় তার চমকপ্রদ মিথ্যাকথাগুলি বোলতে পারে, যত বেশি মিথ্যা ওয়াদা দিতে পারে সরল প্রকৃতির অশিক্ষিত মানুষগুলি তাদের প্রতিই বিশ্বাস স্থাপন করে। ক্ষমতার পালাবদলে শাসকের পরিবর্তন হয়, কিন্তু দিনমজুরের দিন বদলায় না। কেবল তাদের হতাশাই বৃদ্ধি পায়। একটি ভোট ছাড়া দেশের নীতি-নির্ধারণে তাদের কোনো ভূমিকা নেই। গোলামী যুগ থেকে আজ পর্যন্ত এভাবেই কাটছে তাদের ঘৃণিত জিল্লতির জীবন। এইভাবে তারা দুনিয়ার জীবনে অপর দুই শ্রেণীর দ্বারা প্রতারিত ও শোষিত হয়। ধর্মব্যবসায়ীদের প্রতারণায় পড়ে বিকৃত এসলাম পালনের জন্য পরকালীন তহবিলও শূন্য। দুনিয়ার জীবনে অন্যায়, অবিচার, অশান্তি আর পরকালীন জীবনের সর্বস্ব হারিয়ে এই শ্রেণীটির অবধারিত গন্তব্য দাঁড়িয়েছে পাইকারী হারে জাহান্নাম।

মাননীয় এমামুয্যামান

জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

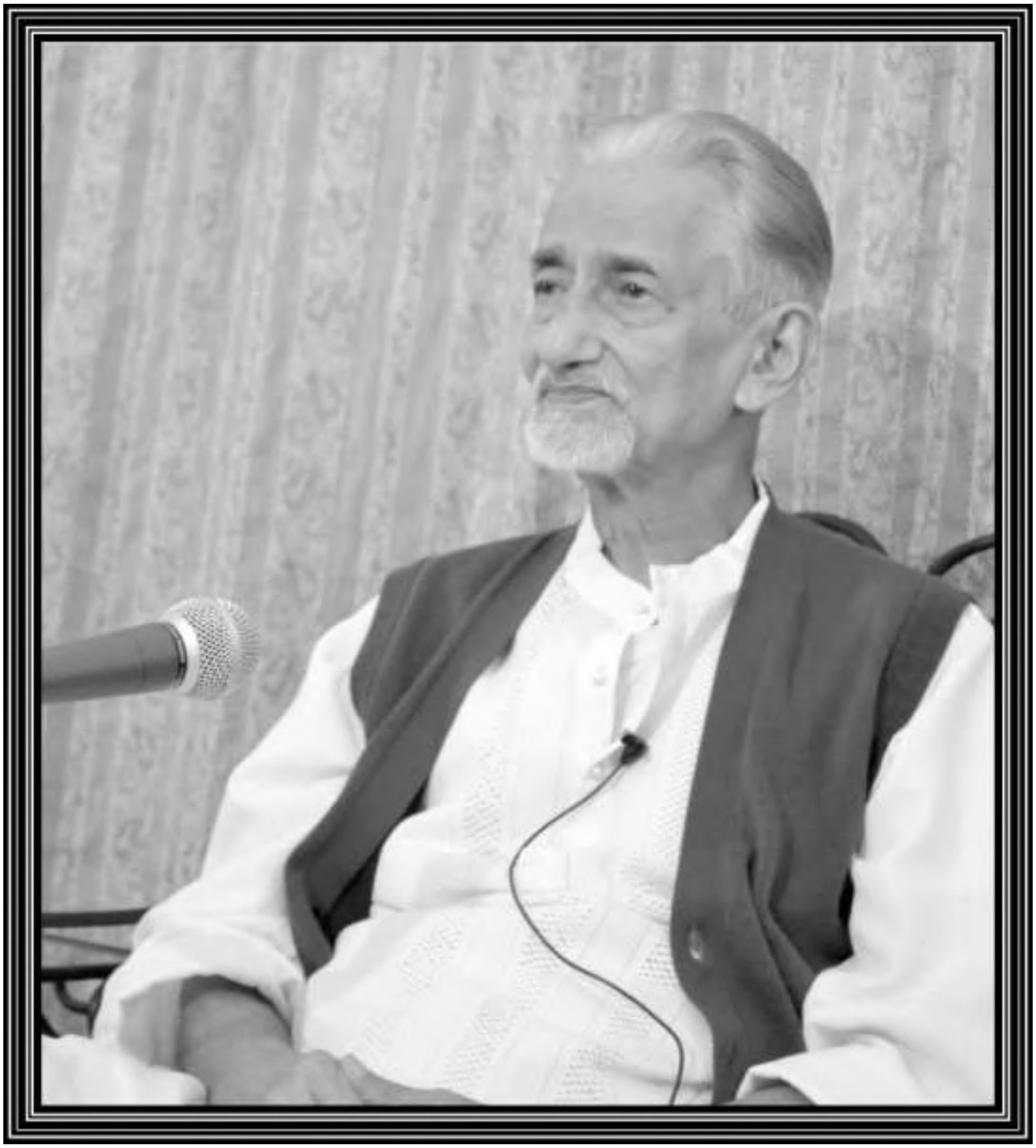

হেযবুত তওহীদের প্রতিষ্ঠাতা এ যুগের পরশপাথর এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী। সৎ, বিশ্বস্ত, আমানতদার, পরোপকারী এমন একজন মহামানব বর্তমান দুনিয়ায় অনুপস্থিত, যাঁর সারাটা জীবন কেটেছে সমগ্র মানবজাতির শান্তি ও মুক্তির সংগ্রাম কোরে। তিনি এমন একটি পরিবারের সন্তান যাদের এ উপমহাদেশে শিক্ষা, ধর্মবিস্তার, সংস্কৃতি, শাসন,

সমাজসেবায় বিপুল অবদান রোয়েছে, যাদের দ্বারা উপকৃত হোয়েছে জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষ। তাঁর ঘটনাবহুল ৮৬ বছরের জীবনে একবারের জন্যও আইনভঙ্গের কোনো রেকর্ড নেই, নৈতিক স্খলনের কোনো নজির নেই। আধ্যাত্মিক ও মানবিক চরিত্রে বলিয়ান এ মহামানব সারাজীবনে একটিও মিথ্যা শব্দ উচ্চারণ করেন নাই। হেযবুত তওহীদও স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মতই ন্যায়নিষ্ঠ এবং তাঁর আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। মাননীয় এমামুয্যামান করটিয়া, টাঙ্গাইলের ঐতিহ্যবাহী পন্নী পরিবারে ১৫ শাবান ১৩৪৩ হেজরী, মোতাবেক ১৯২৫ সনের ১১ মার্চ শেষ রাতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শৈশব কাটে করটিয়ার নিজ গ্রামে। এইচ. এন. ইনস্টিটিউশন থেকে ১৯৪২ সনে মেট্রিকুলেশন পাশ করেন। এরপর সা'দাত কলেজে এবং বগুড়ার আজিজুল হক কলেজে প্রথম বর্ষ শেষ কোরে দ্বিতীয় বর্ষে কোলকাতার এসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন। এখানে শিক্ষালাভের সময় তিনি ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে পুরোপুরি জড়িয়ে পরেন। সেই সুবাদে তিনি এই সংগ্রামের কিংবদন্তীতুল্য নেতৃবৃন্দের সাহচর্য লাভ করেন যাঁদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী, কায়েদে আযম মোহম্মদ আলী জিন্নাহ্, অরবিন্দু বোস, শহীদ হোসেন সোহরাওয়ার্দি অন্যতম। তিনি ছিলেন আল্লামা এনায়েত উল্লাহ খান আল মাশরেকীর 'তেহরীক এ খাকসার' আন্দোলনের একজন কমান্ডার। সময় পেলেই তিনি বেরিয়ে পড়তেন শিকারে, রায়ফেল হাতে হিংস্র পশুর খোঁজে ছুটে বেড়াতেন দেশের বিভিন্ন এলাকার বনে-জঙ্গলে। শিকারের লোমহর্ষক অভিজ্ঞতা নিয়ে পরে তিনি 'বাঘ-বন-বন্দুক' নামক একটি বই লেখেন। ১৯৬৩ সনে তিনি পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আইন পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ, মোসলেম লীগের প্রার্থীগণসহ বিপক্ষীয় মোট ছয়জন প্রার্থীকে বিপুল ব্যবধানে পরাজিত কোরে এম.পি. নির্বাচিত হন। প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য থাকা অবস্থায় তিনি 'কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি এ্যাসোসিয়েশন' এর সদস্যপদ লাভ করেন।

ছোটবেলায় যখন তিনি মোসলেম জাতির পূর্ব ইতিহাসগুলি পাঠ করেন তখন থেকেই তিনি মোসলেম জাতির অতীতের সাথে বর্তমান অবস্থার এই বিরাট পার্থক্য দেখে তিনি রীতিমত সংশয়ে পড়ে যান যে এরাই কি সেই জাতি যারা শিক্ষায়, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, সামরিক শক্তিতে, ধনবলে ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিমান, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি অঙ্গনে যারা ছিল সকলের অগ্রণী? কিসের পরশে এই জাতি ১৪০০ বছর পূর্বে একটি মহান উম্মাহয় পরিণত হোয়েছিল, আর কিসের অভাবে আজকে তাদের এই চরম দুর্দশা, তারা সকল জাতির দ্বারা পরাজিত, শোষিত, দাসত্বের শৃঙ্খলে

আবদ্ধ, দুনিয়ার সবচেয়ে হত-দরিদ্র ও অশিক্ষা-কুশিক্ষায় জর্জরিত, সব জাতির দ্বারা লাঞ্ছিত এবং অপমানিত?

মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে তিনি ধীরে ধীরে অনুধাবন কোরলেন কি সেই শুভঙ্করের ফাঁকি। ষাটের দশকে এসে তাঁর কাছে এই বিষয়টি দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হোয়ে ধরা দিল। ১৯৯৫ সনে তিনি হেযবুত তওহীদ আন্দোলনের সূচনা করেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মানুষকে প্রকৃত এসলামে ফিরে আসার জন্য আহ্বান জানাতে থাকেন। ১৬ জানুয়ারী ২০১২ ঈসায়ী এই মহামানব প্রত্যক্ষ দুনিয়া থেকে পর্দা করেন।

বিশেষ অর্জন (Achievements)

১. **ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন**: তিনি তেহরিক এ খাকসারের পূর্ববাংলা কমান্ডার ছিলেন এবং বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্য 'সালার এ খাস হিন্দ' পদবিযুক্ত বিশেষ কমান্ডার নির্বাচিত হন।

২. **চিকিৎসা**: বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপ্রধান, তৎকালীন ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রী, সাবেক প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় কবি কাজী নজরুল এসলামসহ অনেক বরেণ্য ব্যক্তি তাঁর রোগীদের অন্তর্ভুক্ত।

৩. **সাহিত্যকর্ম**: বেশ কিছু আলোড়ন সৃষ্টিকারী বইয়ের রচয়িতা যার একটি ২০০৮ এর সর্বাধিক বিক্রয়কৃত বই। তাঁর বাঘ-বন-বন্দুক বইটি পাকিস্তান লেখক সংঘের (পূর্বাঞ্চল শাখা) সম্পাদক শহীদ মুনির চৌধুরীর সুপারিশে শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্যসূচিতে দ্রুতপাঠ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এছাড়াও তিনি পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে চিকিৎসা, ধর্ম ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গে প্রবন্ধ লিখেছেন।

৪. **শিকার**: বহু হিংস্র প্রাণী শিকার কোরেছেন যার মধ্যে চিতাবাঘ, বন্য শুকর, অজগর সাপ, কুমির প্রভৃতি রোয়েছে।

৫. **রায়ফেল শুটিং**: ১৯৫৪ সনে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত বিশ্ব অলিম্পিক চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণের জন্য পাকিস্তান দলের অন্যতম রায়ফেল শুটার হিসাবে নির্বাচিত হন।

৬. রাজনীতি: পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য (এম.পি.) নির্বাচিত হন (১৯৬৩-৬৫) । প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য থাকা অবস্থায় তিনি 'কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি এ্যাসোসিয়েশন' এর সদস্যপদ লাভ করেন।

৭. সমাজসেবা: হায়দার আলী রেডক্রস ম্যাটার্নিটি এ্যান্ড চাইল্ড ওয়েলফেয়ার হসপিটাল ও সাদাত ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা।

৮. শিল্প সংস্কৃতি: নজরুল একাডেমির আজীবন সদস্য।

একটা প্রশ্নের উত্তর

“আপনাদের সাড়ে তিন হাত শরীরেই তো এসলাম নাই”

হেযবুত তওহীদের এমামের বক্তব্য অর্থাৎ প্রকৃত এসলাম সম্পর্কে লেখা বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় নিয়মিতভাবে যখন প্রকাশিত হোচ্ছিল তখন আমাদের এই লেখাগুলি পড়ে অনেক পাঠক টেলিফোনে যোগাযোগ কোরে তাদের মতামত জানান এবং বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করেন। আমরা পাঠকদের থেকে আগত এই সব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব ধীরে ধীরে পত্রিকার পাতায় প্রকাশ কোরি। এতে কোরে আরও অনেকেই হয়তো উপকৃত হবেন। যেহেতু আমাদের বিষয়বস্তু এসলাম, তাই এই প্রশ্নকর্তাদের মধ্যে একটি বিরাট অংশ আছেন যারা মাদ্রাসাশিক্ষিত। তাদের প্রশ্নগুলোর মধ্যে একটি অতি উচ্চারিত প্রশ্ন হোল, **“আপনারা এসলামের কথা বলেন, কিন্তু যারা হেযবুত তওহীদ আন্দোলন করে তাদের সাড়ে তিন হাত শরীরেই তো এসলাম নাই?”** এ প্রশ্নটি পরিষ্কার হওয়ার জন্য আমরা প্রশ্নকর্তাকে জিজ্ঞাসা কোরেছিলাম “শরীরে এসলাম নাই” বোলতে আপনি কী বুঝাতে চেয়েছেন? উত্তরে তিনি বোলেছিলেন, ‘হেযবুত তওহীদের অনেককেই আমি চিনি, তাদের অনেকের মুখে দাড়ি নাই, মাথায় টুপি নাই, পাগড়ী নাই, গায়ে জোব্বা নাই ইত্যাদি। আগে তো নিজেদের শরীরে এসলাম কায়েম কোরতে হবে, তারপরে দুনিয়াতে কায়েম করার প্রশ্ন’।

এ প্রশ্নের জবাবে প্রথমেই বোলব, এসলাম আসলে কী এবং কেন, তা আগে আমাদের বুঝতে হবে। যদি এই প্রশ্ন দু’টির উত্তর আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়, তাহলে আশা করি আমরা বুঝতে পারব আসলে দাড়ি, টুপি, পাগড়ীর সাথে এসলামের সম্পর্ক কতটুকু।

এসলাম একটি আরবী শব্দ। এসলাম শব্দটির উৎপত্তি সীন-লাম-মীম বা ‘সাল্ম’ ধাতু থেকে। এই একই ধাতু ‘সাল্ম’ থেকে এসেছে সালাম, তাসলীম, সেলিম ইত্যাদি শব্দাবলী। এসলাম শব্দের অর্থ আপত্তিহীনভাবে কর্তার আদেশ নিষেধের আনুগত্য করা (ইসলামিক ফাইন্ডেশন থেকে প্রকাশিত আরবী-বাংলা অভিধান: ১ম খণ্ড, পৃ:১৯৭)। একইভাবে সালাম শব্দের অর্থ হোচ্ছে: এসলাম, সন্ধি, শান্তি, যুদ্ধের বিপরীত, আত্মসমর্পণ, শান্তিপ্রিয় ইত্যাদি (ইসলামিক ফাইন্ডেশন থেকে প্রকাশিত

আরবী-বাংলা অভিধান: ২য় খণ্ড, পৃ:৭২)। সালাম শব্দের অর্থ শান্তি। এই সালাম শব্দ থেকেই এসেছে এসলাম। অর্থাৎ শান্তি ও এসলাম সমার্থক শব্দ। প্রকৃতপক্ষে এসলাম একটি জীবন-ব্যবস্থার নাম। এ নামটি দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ। সমস্ত রকম অন্যায়, অত্যাচার, জুলুম, মারামারি, রক্তপাত থেকে মানবজাতির মুক্তির জন্য, মানুষ যেন শান্তিতে থাকতে পারে সেজন্য তাঁর সর্বশেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (দ:)-এর মাধ্যমে পৃথিবীর সমস্ত মানবজাতির জন্য আল্লাহ যে জীবন-ব্যবস্থা পাঠালেন তার নাম তিনি নিজেই রেখেছেন এসলাম। এক কথায় এসলাম আল্লাহর দেওয়া একটি একটি জীবন-ব্যবস্থা। **আল্লাহর দেওয়া এই জীবন-ব্যবস্থা যদি মানুষ তার পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বিচার-ব্যবস্থায় অর্থাৎ তার সামগ্রিক জীবনে মেনে নেয় এবং এই জীবন-ব্যবস্থা দিয়ে তাদের সামগ্রিক জীবন পরিচালিত করে তাহোলে তাদের জীবন থেকে সমস্ত রকম অন্যায়, অবিচার, রক্তপাত দূর হয়ে যাবে, ফলশ্রুতিতে সমাজে, রাষ্ট্রে তথা সমস্ত পৃথিবীতে শান্তি আসবে।**

এসলাম বা শান্তি হোচ্ছে আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থা প্রয়োগের ফল। অর্থাৎ এই জীবনব্যবস্থা কার্যকরী করা হোলে মানবজীবন থেকে অন্যায় অবিচার বিলুপ্ত হোয়ে যে নিরাপত্তা, সুবিচার, ন্যায় ইত্যাদি অর্থাৎ এক কথায় শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে- এই শান্তিটাই হোচ্ছে এসলাম। এই দীনের প্রকৃত নাম দীনুল হক অর্থাৎ সত্য ও ন্যায় জীবনব্যবস্থা। ১৪০০ বছর আগে অর্ধেক পৃথিবীতে এই দীন প্রবর্তন করার ফলে ঐ সমস্ত এলাকায় মানবজীবনের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে সকল প্রকার শোষণ, অবিচার, অন্যায়, নিরাপত্তাহীনতা তিরোহিত হোয়ে প্রতিষ্ঠিত হোয়েছিল চূড়ান্ত শান্তি, নিরাপত্তা ও সুবিচার। এই জন্য এই দীনের নাম এসলাম।

এখন আকীদা বিকৃতির কারণে, **দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হওয়ার কারণে আমাদের ধর্মীয় ও অধর্মীয় (রাজনৈতিক) নেতারা এসলামের অর্থ বোলে থাকেন, 'এসলামের শত্রুরা মোসলেমদেরকে যতই নির্যাতন কোরুক, তাদের উপর যতই অবিচার অন্যায় করা হোক, সেগুলির পাল্টা প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে চুপচাপ সব সহ্য করে যাওয়াই এসলামের নীতি, কারণ এসলাম শান্তির ধর্ম, প্রতিহিংসা, প্রতিশোধ ইত্যাদি এসলাম বিরোধী কাজ।' এসলামের অর্থের এই ব্যাখ্যা ভুল এবং বিপরীত।**

এই হল এসলাম শব্দের শাব্দিক ও প্রায়োগিক অর্থ, এসলামের সঠিক আকিদা বা ধারণা। এই ধারণা মোতাবেক আসলে এসলামের সাথে দাড়ি, টুপি, পাগড়ী, জোব্বার সম্পর্ক কোথায়? এসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা অর্থাৎ রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, বিচারব্যবস্থা ইত্যাদি সব কিছুই এসলাম নামক জীবন-ব্যবস্থার এক একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ সুতরাং যারা আমাদের শরীরে এসলাম নাই এই প্রশ্ন করেন তাদের কাছে আমার প্রশ্ন জীবন-ব্যবস্থার এগুলোকে কিভাবে শরীরে রাখা যায়? তাছাড়াও একটি দেশের সব মানুষ যদি দাড়ি রাখে, টুপি পরে, জোব্বা গায়ে দেয় কিন্তু তাদের অর্থনীতি যদি সুদভিত্তিক হয়, বিচারব্যবস্থা এসলামের না হোয়ে ইহুদি খ্রিস্টানদের তৈরি আইন দ্বারা হয় তাহোলে কি সেই দেশে শান্তি এসে যাবে? সাধারণ জ্ঞান কি বলে?

অনেকের ধারণামতে যে দাড়ি ছাড়া এসলামই হয় না, সেই দাড়ি তো আল্লাহর রসুলের বিরোধীতাকারী, ঘৃণিত কাফের বোলে আমাদের নিকট পরিচিত আবু জেহেল, আবু লাহাব, ওতবা, শায়েবার মুখেও ছিল। তারাও জোব্বা পোরত, ঠিক রসুল যে জোব্বা পোরতেন ঠিক একই ধরনের জোব্বা। প্রকৃতপক্ষে দাড়ি, টুপি, পাগড়ী, জোব্বার সাথে এসলামের কোনো সম্পর্ক নাই, প্রকৃতির আবহাওয়া, ভৌগোলিক অবস্থার সাথে এগুলোর সম্পর্ক রয়েছে। টুপি তো ইহুদিরা, শিখরা বা অন্যান্য ধর্মের ধর্মগুরুরাও পরেন, তাদেরও দাড়ি আছে, তারাও জোব্বা পড়েন, তাদের অনেকেই পাগড়ী পরেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দাড়ি, টুপি, জোব্বা সবই ছিল। শুধু ধর্মীয় সাধু সন্ন্যাসী নয়, আল্লাহর অস্তিত্বে সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী হিসাবে পরিচিত অনেকেরই দাড়ি ছিল যেমন কার্ল মার্কস, চার্লস ডারউইন, আব্রাহাম লিঙ্কন প্রমুখ। হয়ত বোলতে পারেন তাদের টুপি, জোব্বা, পাগড়ী, দাড়ি আর মোসলেমের টুপি, জোব্বা, পাগড়ী, দাড়ি তো এক না। হ্যাঁ, তা হয়ত ঠিক, কিন্তু টুপির আকার-আকৃতি ও রং নিয়ে, জোব্বার আকার-আকৃতি নিয়ে, পাগড়ীর রং, দাড়ির পরিমাণ ইত্যাদি নিয়ে তো প্রচলিত এসলামের আলেম ওলামাদের মধ্যেও বিস্তর মতভেদ রোয়েছে। কার দাড়ি, কার টুপি, কার জোব্বা, কার পাগড়ী যে এসলামের আর কারটা এসলামের না- এ নিয়ে বিরোধ রীতিমত ব্যাপক আকার ধারণ কোরেছে। সুতরাং ছোটখাটো বিষয় নিয়ে মতবিরোধে গিয়ে মূল উদ্দেশ্য থেকে আমরা বিচ্যুত হোয়ে যাওয়া একপ্রকার মূর্খতা বোলে আমরা মনে কোরি। গত কয়েক শতাব্দী ধোরে এই জাতির দুর্ভাগ্যজনক পরাজয়ের কারণ এগুলিই। অথচ এটা ইতিহাস যে রসুলের একদল সর্বত্যাগী সাহাবী যাদেরকে আসহাবে সুফফা বলা হোত, তারা বাড়ী-ঘরে যেতেন না, মসজিদে নববীতে থাকতেন আর অপেক্ষা করতেন রসুল কখন কি হুকুম দেন এবং

সঙ্গে সঙ্গে সে হুকুম বাস্তবায়ন কোরতেন, **সেই সাহাবীদের অনেকেরই গায়ে জোব্বা তো দূরের কথা ঠিকমত লজ্জাস্থান ঢাকার মতো কাপড় সংস্থান কোরতেও কষ্ট হোত।**

আল্লাহ দিলেন সহজ সরল পথ, সেরাতুল মোস্তাকীম এসলাম। আদম (আ:) থেকে শুরু কোরে শেষ নবী মোহাম্মদ (দ:) পর্যন্ত এসলামের অর্থাৎ দীনুল কাইয়্যেমার মর্মবাণী তওহীদ- এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো তৈরি জীবন-বিধান মানি না, স্বীকার করি না। এই সেরাতুল মোস্তাকীম, সহজ-সরল পথ ছেড়ে মহাপণ্ডিতরা দীনের চুলচেরা বিশ্লেষণ কোরে এই কোরলেন যে, সহজ-সরল পথটি হোয়ে গেলো একটি অত্যন্ত দুর্বোধ্য জীবন-ব্যবস্থা, খুঁটিনাটি মসলা-মাসায়েলের জটিল জাল। **এই জটিল জালে আটকা পড়ে সমস্ত জাতিটাই মাকড়সার জালে আটকা পড়া মাছির মতো অসহায়, স্থবির হোয়ে গেলো। ঐ স্থবিরতার অবশ্যম্ভাবী ফল হোয়েছে শত্রুর ঘৃণিত গোলামী ও বর্তমান অবস্থা; যেখানে অজ্ঞানতায়, অশিক্ষায়, কুশিক্ষায় এসলামের আগের জাহেলিয়াতের অবস্থাকেও ছাড়িয়ে গেছে।** এই জাতির ধর্ম ব্যবসায়ী আলেম সমাজ আজ কুয়োর ব্যাঙ। দুনিয়ার খবর যারা রাখেন তাদের চোখে এরা অবজ্ঞার পাত্র, হাসির খোরাক। আসমানের মতো বিরাট উদাত্ত দীনকে এরা তাদের লম্বা কোর্তার পকেটে পুরে মিলাদ পড়ে, বাড়ী বাড়ী দাওয়াত খেয়ে আর সুর কোরে ওয়াজ কোরে বেড়ান। তবু যদি তাদের ওয়াজের মধ্যে অন্তত কিছু সার কথা থাকতো! তাও নেই, কারণ দীনের মর্মকথা, এর উদ্দেশ্য, প্রক্রিয়া এ সবের কিছুই তাদের জানা নেই। আসল দিক অর্থাৎ জাতীয় জীবনের দিকটাকে সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিয়ে ব্যাক্তি দিকটার সামান্য যে বাহ্যিক অংশকে এরা আঁকড়ে ধোরে আছেন তা পর্যন্ত ভুল। যে দাড়ি রাখাকে এরা দীনের অতি প্রয়োজনীয় কর্তব্য বোলে মনে করেন, প্রতি ওয়াজে প্রতি উপদেশে যারা দাড়ির প্রয়োজনীয়তার উপর অনেক সময় নষ্ট করেন সেই দাড়িকেই ধরুন। এদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোকই দাড়িকে তার নিজের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়েছেন, যেটা বাড়তে বাড়তে সারা বুক ছেয়ে যায়। এই দাড়ি এই দীনের দাড়ি নয়। এ দাড়ি ইহুদিদের দাড়ি এবং এ রকম দাড়ি রাখা যে মহনবীর (দ:) নিষেধ তা তারা জনেন না। তাঁর (দ:) নির্দেশিত দাড়ি নিচের ঠোঁটের নিচ থেকে, অর্থাৎ যেখান থেকে দাড়ি গজায় সেখান থেকে একমুষ্ঠি মাত্র, এর বেশী হোলেই তা ছেটে ফেলার নিয়ম। ফকীহদেরও অধিকাংশের মতো হোচ্ছে চার আঙ্গুল লম্বা দাড়ি হোচ্ছে শরিয়াহ অনুযায়ী। ইহুদিদের রাব্বাইরা লম্বা আলখেল্লা পড়েন ও মাথায় লম্বা টুপি লাগান, লম্বা দাড়ি তো প্রত্যেকেরই

আছে। কাজেই একদল রাব্বাইদের মধ্যে আমাদের একদল 'ধর্মীয়' নেতাদের দাঁড় করিয়ে দিলে তাদের আলাদা কোরে চেনা যাবে না। এই উড়ন্ত দাঁড়ির সঙ্গে তারা যোগ করেন ন্যাড়া মাথা। তারা বলেন, আল্লাহর রসুলকে (দ:) মাথা ন্যাড়া অবস্থায় দেখা গেছে বোলে হাদীসে আছে, কাজেই ন্যাড়া করাও সুন্নাহ। এ সিদ্ধান্তও ভুল। মহানবী (দ:) সব সময়ই লম্বা চুল অর্থাৎ আমরা যাকে বাবরী বলি তাই রাখতেন এবং তা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যে দেখেছেন স্বভাবতঃই। আম্মা আয়েশা (রা:) বর্ণনা কোরেছেন, "পবিত্র কানের নিচ থেকে কাঁধ পর্যন্ত" অর্থাৎ সময়ে লম্বা হোয়ে পবিত্র কাঁধ পর্যন্ত এসেছে এবং তখন ছেটে ফেললে আবার কানের নিচ পর্যন্ত ছোট হোয়েছে। যারা তাকে মাথা কামানো অবস্থায় দেখেছেন, তারা দেখেছেন হজ্বের সময়- যখন সবাইকে মাথার চুল কামিয়ে ফেলতে হয় হজ্বের আরকান হিসাবে। যেহেতু হজ্বের সময়ই একত্রে বহু সংখ্যক লোক তাকে মাথা কামানো অবস্থায় দেখেছেন এবং পরে বর্ণনা কোরেছেন যে, "আমি রসুলাল্লাহকে (দ:) মাথা কামানো অবস্থায় দেখেছি," তাই তার মাথা কামানো অবস্থার কথা হাদীসে এবং সীরাতে স্থান পেয়েছে। কিন্তু এটা তার স্বাভাবিক অবস্থায় সুন্নাহ নয়, হজ্বে তো সবাইকে মাথা কামাতে হবে। কিন্তু ঐ বর্ণনাগুলিকে ভিত্তি কোরে এরা একদিকে মাথা কামিয়ে, অন্যদিকে হাওয়ায় উড়ন্ত বিশাল ইহুদি দাড়ি রেখে এক ভয়াবহ চেহারা সৃষ্টি করেন।

এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট করা দরকার তাহোল দাড়ি, টুপি, পাগড়ী, জোব্বা ইত্যাদিকে আমরা অপ্রয়োজনীয় বিষয় বোলছি না বা কোনো রকম অসম্মানও কোরছি না। আমরা শুধু বোলছি এই দীনের প্রকৃত উদ্দেশ্য আজ যেমন উল্টো হোয়ে গিয়েছে তেমনি এর বাহ্যিক দিকটিও বিকৃত দীনের আলেমরা অপরিসীম অজ্ঞতায় উল্টে ফেলেছেন। দাড়ি রাখা, বাহ্যিক পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি এই দীনের বুনিয়াদী কোনো ব্যাপার নয় অর্থাৎ ফরদ নয়, সুন্নত। তাও রসুলের একেবারে ব্যক্তিগত সুন্নত যে ব্যাপারে রসুলাল্লাহ তাঁর একটি অন্তিম অসিয়তে বোলেছেন, 'O men! The fire is kindled and rebellions come like the darkness of the night. By God you cannot lay anything to my charge. I allow only what the Qur'an allows and forbid only what the Qur'an forbids. (সেরাতই রসুলাল্লাহ - এবনে এসহাক, অনুবাদ- The Life of Muhammad, by A. Guillaume, Pg: 682) সুতরাং এটা সুস্পষ্ট হোয়ে গেল যে, আল্লাহর রসুলের ব্যক্তিগত কোনো কিছু মেনে চলার জন্য তিনি আমাদেরকে বলেন নি, নিজে থেকে তিনি কোনো কিছু হালাল বা হারাম করেন নি। কোর'আনে যা আল্লাহ বৈধ কোরেছেন, তাই বৈধ,

কোর'আনে যা অবৈধ কোরেছেন তাই অবৈধ। আর দাড়ি-টুপি (লেবাস) যদি এই দীনের কোনো ফরদ বা বুনিয়াদী বিষয় হোত, তবে কোর'আনে একবার হোলেও এ বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হোত। কিন্তু সমগ্র কোর'আনে আল্লাহ কোথাও দাড়ি বা কাপড়-চোপড়ের গঠন আকৃতি নকশা ইত্যাদি সম্বন্ধে কোনো নির্দেশ দেন নি। আল্লাহর রসুল এটা সুস্পষ্ট কোরে জানিয়ে দিয়েছেন যে- আল্লাহ তোমাদের বাহ্যিক অবস্থা, পোশাক, চেহারা বা সম্পদ কোনো কিছুর দিকেই দৃষ্টিপাত করেন না, তিনি দেখেন তোমাদের হৃদয় এবং তোমাদের কাজ। [আবু হুরায়রা (রা:) থেকে মোসলেম]। আসলে এই শেষ দীনে কোনো নির্দিষ্ট পোষাক হোতে পারে না, কারণ এটা এসেছে সমস্ত পৃথিবীর মানুষের জন্য। পৃথিবীর মানুষ প্রচণ্ড গরমের দেশে, প্রচণ্ড শীতের দেশে, নাতিশীতোষ্ণ দেশে, অর্থাৎ সর্বরকম আবহাওয়ায় বাস করে, এদের সবার জন্য এক রকম পোষাক নির্দেশ করা অসম্ভব। তা কোরলে এ দীন সমস্ত মানব জাতির জন্য প্রযোজ্য হোতে পারতো না, সীমিত হোয়ে যেতো। তাই আল্লাহ ও তার রসুল (দ:) তা করেনও নি। এজন্য আল্লাহ এসলামে পোশাকের ব্যাপারে এমন বিশ্বজনীন একটি নীতি দিলেন যা পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তের মানুষের জন্যই অনুসরণযোগ্য, সেটা হোচ্ছে তিনি পুরুষদের জন্য সতর নির্ধারণ কোরেছেন নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত (অবশ্য এ নিয়েও বিস্তর মতভেদ আছে)। আল্লাহ বা রসুল কেউই বোলে দেন নি যে দেহের এই ন্যূনতম স্থান কি নকশার (Design) পোশাক দিয়ে আবৃত কোরতে হবে। বিশ্বনবী (দ:) আরবে এসেছেন তাই তিনি আরবীয় পোশাক পরেছেন। তাঁর সময়ে তাঁর নিজের এবং সাহাবাদের পোষাক-পরিচ্ছদ ও তখনকার আরবের মোশরেক ও কাফেরদের পরিচ্ছদ একই ছিলো। বর্তমানেও আরবে মোসলেম আরব, খ্রিস্টান আরব ও ইহুদি আরবদের একই পোষাক-পরিচ্ছদ। দেখলে বলা যাবে না কে মোসলেম, কে খ্রিস্টান আর কে ইহুদি।

কোন সন্দেহ নেই, দাড়ি যদি কেউ রাখেন তবে বিশ্বনবী (দ:) তার অনুসারীদের যে নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের দাড়ি রাখতে বোলেছেন, সেই মোতাবেক রাখতে হবে। তিনি দৈর্ঘ্য নির্দিষ্ট কোরে দিলেন কেন? এই জন্য যে, তিনি যে জাতিটি, উম্মাহ সৃষ্টি কোরলেন তা যেমন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি তেমনি বাইরে থেকে দেখতেও যেন এই উম্মাহর মানুষগুলি সুন্দর হয়। আদিকাল থেকে দাড়ি মানুষের পৌরুষ

একজন শিখ ধর্মগুরুর সঙ্গে বিকৃত এসলামের আলেমদের পোশাক, দাড়ি ও পাগড়ীর পার্থক্য কতটুকু?

ও সৌন্দর্যের প্রতীক হোয়ে আছে। সিংহের যেমন কেশর, ময়ূরের যেমন লেজ, হাতির যেমন দাঁত, হরিণের যেমন শিং, তেমনি দাড়ি মানুষের প্রাকৃতিক পৌরুষ সৌন্দর্য। এই সৌন্দর্য নষ্ট না করার উদ্দেশ্যেই দাড়ি রাখার নির্দেশ। নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যরে দাড়ি রাখতে বলার আরও একটা উদ্দেশ্য আছে। পূর্ববর্তী ধর্ম, দীন, জীবন-বিধানগুলি বিকৃত হোয়ে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার ফলে যখন

তিনি একজন আরব খ্রিস্টান। তার হাতের ক্রসটি সোরিয়ে ফেললে মনে হবে তিনি বুঝি এসলামের একজন আল্লামা। তার পরিহিত পোশাকটি আরবীয় ঐতিহ্যের পরিচায়ক, এর সঙ্গে এসলামের কোনো সম্পর্ক নেই।

সেগুলির মধ্যে একপেশে আধ্যাত্মবাদ, সন্ন্যাসবাদ ইত্যাদি প্রবল হোয়ে দাঁড়ালো তখন তারা মাথার চুল, দাড়ি মোছ ইত্যাদি কামিয়ে ফেলে কৌপীন পরে সংসার ত্যাগ কোরলো। অর্থাৎ দাড়ি-মোছ ইত্যাদি কামিয়ে ফেলা হোল বৈরাগ্যের চিহ্ন, সংসার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবার চিহ্ন। কিন্তু মহানবী (দ:) যে উম্মাহ সৃষ্টি কোরলেন তার উদ্দেশ্য হোল সংগ্রামের মাধ্যমে সমস্ত পৃথিবীকে এই দীনের মধ্যে এনে সুবিচার, ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠা। তাহলে স্বভাবতঃই এই উম্মাহর সমস্ত কর্মপ্রবাহ সংগ্রামী, প্রকাশ্য ও বহির্মুখী হোতে বাধ্য এ কথা সাধারণ জ্ঞানেই বোঝা যায়। সুতরাং এই উম্মাহর লোকজনের চেহারাতেও অবশ্যই সংসার বৈরাগী সন্ন্যাসীর ছাপ থাকবে না এবং ছাপ না রাখার জন্য সব সময় দাড়িকে একটি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যে কেটে ছেটে রেখে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরে এই পৃথিবীরই সংসারী লোকজনের মতো দেখাবার নির্দেশ। মহানবীর (দ:) সময়ে খ্রিস্টান সন্ন্যাসীরা (রাহেব) এক দল দাড়ি-মোচ চুলে কাচি লাগাতো না, ওগুলো ইচ্ছামত বাড়তো, আরেক দল সব কামিয়ে ফেলতো, এমন কি তাদের অনেকে বছরের পর বছর গোসলও কোরত না, ইহুদিরা বিরাট বিরাট দাড়ি রাখতো আর বৌদ্ধরা সব কামিয়ে ফেলতো। সবগুলোই ছিলো বৈরাগ্য, সংসার

ত্যাগের বাহ্যিক প্রকাশ রূপে। এই বৈরাগ্যের মানসিকতার বিরোধিতা কোরে বিশ্বনবী (দ:) তার নিজের জাতিকে নির্দেশ দিলেন- আমার এই দীনে সন্ন্যাস, বৈরাগ্য নেই (লা রোহবানীয়াতা ফিল এসলাম)। তোমরা ঐ সব সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসীদের বিপরীত কোরবে অর্থাৎ দাড়ি ও মোচ রাখবে এবং ইহুদিদের বিপরীত কোরবে অর্থাৎ দাড়ি ও মোচ ছেটে ছোট কোরে রাখবে। উদ্দেশ্য হোল ঐ কাজ কোরে তারা দেখাবে যে তারা সন্ন্যাসী নয়, সংসার বিমুখ নয় বরং ঘোর সংসারী, এই সংসারে এই পৃথিবীতে মানব জীবনে স্রষ্টার দেয়া রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক আইন, দণ্ডবিধি চালু কোরে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণ উৎসর্গকারী সংগ্রামী জাতি তারা। জাতিকে সুন্দর দেখানো শেখানোর জন্য মহানবী (দ:) নিজে পরিষ্কার সুন্দর কাপড় পোরতেন, দাড়ি-মোচ সুন্দর কোরে ছেঁটে রাখতেন। তিনি সফরে গেলেও তার সঙ্গে কাচি, চিরুনি ও আয়না থাকতো। একদিন মসজিদে একজন উষ্কো-খুষ্কো চুলওয়ালা লোককে দেখে তিনি তখনই তাকে নির্দেশ দিলেন মাথার চুল চিরুনি কোরে সুবিন্যস্ত করার জন্য (হাদীস- আতা বিন ইয়াসার (রা:) থেকে মালেক, মেশকাত)। বয়স হোলে মাথার চুল যখন পেকে যায় সেটাকে রং করা, অর্থাৎ কম বয়সের দেখানো চেষ্টা করা দুনিয়াদারীর মানসিকতা, না বৈরাগ্যের, ধার্মিকতার মানসিকতা? মক্কা জয়ের পর পরই আবু বকর (রা:) তার অতি বৃদ্ধ বাপকে- যিনি তখনও মোশরেক ছিলেন, সুতরাং মক্কাতেই ছিলেন- মহানবীর (দ:) কাছে নিয়ে এলেন। বাপ তখন এত বৃদ্ধ যে তিনি চোখেও দেখতে পাননা। আবু বকরের (রা:) বাপ বিশ্ব নবীর (দ:) হাতে এসলাম গ্রহণের পর রসুলাল্লাহ (দ:) তখনই হুকুম দিলেন তার শুভ্র চুল দাড়ি মেহেদী দিয়ে রং কোরে দিতে এবং তখনই তা কোরে দেওয়া হোল (সীরাত রসুলাল্লাহ (দ:) এবনে ইসহাক)। একটি অন্ধ, অতি বৃদ্ধের চুল দাড়ি রং করা এবং আজকের 'ধার্মিক' মোসলেমদের নানাভাবে বৈরাগ্য প্রকাশ করার মধ্যে রোয়েছে সত্যিকার ও পথভ্রষ্ট এসলামের আকীদার তফাৎ- দু'টি বিপরীতমুখী আকীদা। আজ বিকৃত আকীদার 'ধার্মিক'রা অনিয়ন্ত্রিত উলোঝুলো দাড়ি উড়িয়ে, মাথা ন্যাড়া কোরে বিশ্রী কাপড় পোরে দেখাতে চান যে তাদের মন দুনিয়া বিমুখ হোয়ে আল্লাহর দিকে গেছে- ঠিক যেমন কোরে ঐ খ্রিস্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা বোঝায়। অর্থাৎ মহানবী (দ:) যে উদ্দেশ্যে দাড়ি মোচ সুন্দর কোরে ছেটে রাখতে বোলেছেন, অর্থাৎ সুন্দর দেখাতে, তার ঠিক বিপরীত উদ্দেশ্যে।

'দাড়ি এসলামের চিহ্ন', 'দাড়ি না রাখলে এসলামের কথা বলা যাবে না' এই সকল ধারণা সঠিক নয়। সেজন্য হেযবুত তওহীদ আন্দোলনের ডাকে সাড়া দিয়ে কেউ তওহীদের

ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হোয়ে আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম কোরতে চাইলে তিনি যদি দাড়ি রাখেন তবে তাকে কেবল এটুকুই বোলি, রসুল যেভাবে দাড়ি রাখতে বোলেছেন সেভাবে রাখুন যেন সুন্দর, পরিপাটি (Smart) দেখায়। আবার কেউ যদি দাড়ি না রাখতে চান, আমরা সেক্ষেত্রে তার সঙ্গে জোরাজুরিও কোরি না। কারণ তিনি দাড়ি না রেখেই আল্লাহর তওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম কোরছেন। শুধু দাড়ি না থাকার জন্য তাকে এই সংগ্রাম থেকে বিরত রাখার কোনো অধিকার আমাদের নেই। রসুলাল্লাহ (দ:) বোলেছেন এসলাম একটি ঘর, সালাহ তার খুঁটি জেহাদ তার ছাদ [হাদীস- মুয়ায (রাঃ) থেকে আহমদ, তিরমিযি, এবনে মাজাহ, মেশকাত]। আর এ দীনের ভিত্তি হোচ্ছে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে এলাহ হিসাবে না মানা। আজ সারা পৃথিবীতে কোথাও আল্লাহকে এলাহ অর্থাৎ হুকুমদাতা হিসাবে মানা হোচ্ছে না। মোসলেম নামের এই জনসংখ্যাও ইহুদি খ্রিস্টান সভ্যতার তৈরি করা গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র ইত্যাদি বিবিধ মতবাদকে গ্রহণ কোরে জীবন পরিচালনা কোরছে, সুতরাং তারা আল্লাহর বদলে মানুষকে তাদের হুকুমদাতা, এলাহ সাব্যস্ত কোরছে। তারা তো এসলামেই নেই। প্রশ্ন হোল, যারা আল্লাহর বদলে মানুষকে এলাহ মানছে তাদের আগে কোনটি করণীয়? দাড়ি রাখা নাকি তওহীদে প্রবেশ কোরে আগে এসলামে প্রবেশ করা? এই দীনের ভিত্তি হোচ্ছে তওহীদ, আর আল্লাহর রসুল এসলামকে একটি বাড়ির সঙ্গে তুলনা কোরে সালাহকে এর খুঁটি এবং জেহাদকে এর ছাদস্বরূপ বোলেছেন। আজকে আমাদের এসলাম নামক ঘরের ভিত্তিই ধ্বংস হোয়ে গেছে। ছাদ নেই, শূন্যের মাঝে বাঁকা টেরা খুঁটি গাঁড়ার চেষ্টা কোরে যাচ্ছি। এমতাবস্থায় আগে ভিত্তি না দিয়ে, বাড়ি তৈরি না কোরে ফুলের বাগান তৈরি করা কি নির্বুদ্ধিতা নয়। আমাদের কথা, আগে আপনারা বাড়ি তৈরি কোরুন তারপরে যতখুশি এর সৌন্দর্য বৃদ্ধি কোরুন তাতে কোনো আপত্তি নেই।

আল্লাহর রসুল বোলেছেন, এমন সময় আসবে যখন মানুষ তাহাজ্জুদ পোড়বে কিন্তু ঘুম কামাই করা হবে, সওম রাখবে কিন্তু না খেয়ে থাকা হবে (হাদীস) । কি সাংঘাতিক ঘটনা! রসুলাল্লাহ বর্ণিত সেই সময়টি এখন। এখন মানুষ আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ত্যাগ কোরে দাজ্জাল অর্থাৎ ইহুদি খ্রিস্টান 'সভ্যতা'র সার্বভৌমত্ব, হুকুম আহকাম, সংস্কৃতি সবই অবনত মস্তকে, বিনম্র শ্রদ্ধায় বরণ কোরে নিয়েছে। এই অবস্থায় আল্লাহর যতটুকু উপাসনা করা হোচ্ছে তা যে বৃথা যাচ্ছে তার প্রমাণ বিশ্বময় এ জনসংখ্যার করুণ দুর্দশা। কাজেই আল্লাহর তওহীদ, সার্বভৌমত্ব যেখানে নেই, আল্লাহর রসুলের

বর্ণনা মোতাবেক যেখানে তাহাজ্জুদ, সওমের মতো একনিষ্ঠ আমলও বৃথা যাবে, সেখানে দাড়ি, টুপি, পাগড়ী, জোব্বার মতো আমল গৃহীত হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না।

বর্তমানে আমরা এক ভয়াবহ দুঃসময় অতিক্রম কোরছি। সামাজিক অন্যায়, নেতৃবৃন্দের অসততা, অঙ্গীকারভঙ্গ, রাজনৈতিক অস্থিরতা, দুর্নীতি, অর্থনৈতিক বৈষম্য, অবিশ্বাস ইত্যাদির মধ্যে মানবজাতি নিমজ্জিত হোয়ে আছে। আমরা মনে করি এই অবস্থাটি সৃষ্টির পেছনে কেবল কোন একক ব্যক্তি বা দল দায়ী নয়, দায়ী হোচ্ছে আমাদের সিস্টেম বা জীবনব্যবস্থা।

বর্তমানে আমরা যে সিস্টেমের মধ্যে বাস কোরছি, এই সিস্টেম একজন সৎ মানুষকে অসৎ হোতে বাধ্য করে। বর্তমানে যারা ব্যবসা কোরতে যান তারা কিন্তু এই নিয়তে যান না যে তিনি মাপে কম দিবেন, ভেজাল মেশাবেন; কিন্তু এক সময় তাকে বাজারে টিকে থাকার জন্য অন্যদের মতই সততা বিসর্জন দিয়ে খাদ্যে ভেজাল মেশাতে হয়। যারা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীতে চাকরি কোরতে যান তাদের অনেকেই এই নিয়তে যান না যে ইচ্ছা মতো ঘুষ খাবেন, বরং সৎ জীবনযাপনের ইচ্ছা নিয়েই যান চাকুরিতে। রাজনীতিতে যারা যান তারাও এই মানসিকতা নিয়ে যান না যে দুর্নীতি কোরবেন, সন্ত্রাস লালন কোরবেন, জনগণের সম্পদ লুট কোরবেন, বিদেশে টাকা পাচার কোরবেন, কিন্তু বাস্তবটা ভিন্ন। এর কারণ শত না চাইলেও আপনি ঐ কাজগুলিই কোরতে বাধ্য হবেন, সিস্টেম-এর যাঁতাকলে পড়ে আপনার চরিত্রের কোন অস্তিত্বই থাকবে না। তাই আসুন, এই সিস্টেমটা পাল্টাই। জাতীয়ভাবে আজ আমাদের এমন একটি সিস্টেম দরকার যেখানে শত চেষ্টা কোরেও কেউ ঘুষ খেতে পারবে না, অন্যায় কোরতে পারবে না, দাঙ্গ-হাঙ্গামা, অরাজকতা ইত্যাদি সৃষ্টি কোরে মানুষের অশান্তি ঘটাতে পারবে না, ওয়াদা খেলাফ কোরতে পারবে না, কেউ বিপুল সম্পদের মালিক হবে আর কেউ না খেয়ে রাস্তায় ঘুমাবে এমন অবিচার সৃষ্টি হওয়ার কোন সম্ভাবনাও যেখানে থাকবে না। এজন্য আমাদের এই সিস্টেমকে পাল্টাতে হবে। প্রশ্ন হোল, এমন সিস্টেম কোথায় পাওয়া যাবে? এর উত্তর হোল, স্রষ্টা আল্লাহর দেওয়া দীনুল হক, সত্য জীবনব্যবস্থাই হোচ্ছে সেই সিস্টেম যেটা আখেরী নবী মোহাম্মদ (দ:) এর উপর অবতীর্ণ হোয়েছিল। মানুষ নামক এই প্রাণী সৃষ্টি কোরেছেন আল্লাহ, কাজেই কোন রাস্তায় বা সিস্টেম-এ সে সুখে থাকবে সেটা ভালো জানেন মহান আল্লাহ। কিন্তু দীর্ঘ শত শত বছরের কাল পরিক্রমায় সেই এসলাম তার প্রকৃত রূপ হারিয়ে বিকৃত ও বিপরীতমুখী হোয়ে গেছে। বর্তমানে সারা পৃথিবীতে এসলাম নামে যে জীবনব্যবস্থাটি আমরা দেখছি সেটা আল্লাহর দেওয়া প্রকৃত এসলাম নয়।

আল্লাহ তাঁর অসীম দয়ায় সেই প্রকৃত, অবিকৃত এসলাম আবার এ যামানার এমাম, এমামুয্যামান, The Leader of the Time জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি প্রকৃত এসলামের যে রূপরেখা অঙ্কন কোরে গেছেন, আমরা যদি সে মোতাবেক আমাদের জীবন পরিচালিত কোরি, আমরা ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সমষ্টিগত জীবনে পরিপূর্ণ শান্তিতে, প্রগতিতে বাস কোরতে পারবো।

তওহীদ প্রকাশন

প্রকাশনায়
তওহীদ প্রকাশন
৩১-৩২, পি.কে. রায় রোড, পুস্তক ভবন, বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাইল # ০১৬৭০ ১৭ ৪৬ ৪৩, ০১৬৭০ ১৭ ৪৬ ৫১
ওয়েবসাইট: www.hezbuttawheed.com